প্রে মে ন্দ্র মি ত্র

মামাবাবু সমগ্র

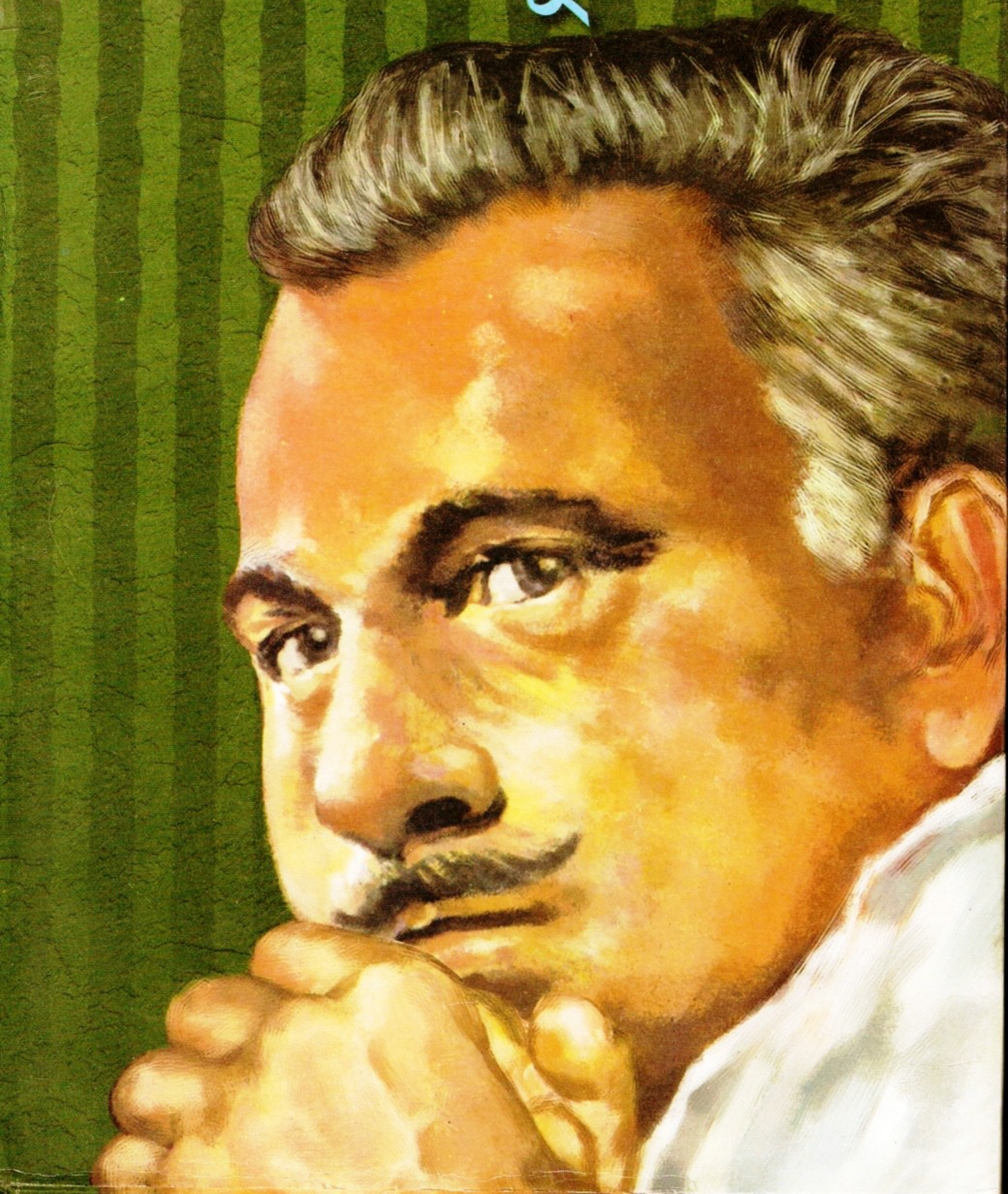

scanned

and

Prepared by

papairoy

PATHAGAR.NET

PATHAGAR.NET

বইটি পরে যদি ভালো লাগে তাহলে **pathagar.net** এর chat box য়ে এসে

ধন্যবাদ দিতে ভুলবেন না।

মামাবাবু সমগ্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সম্পাদনা
সুরজিৎ দাশগুপ্ত

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

pathagar.net

অবতারণা

প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলায় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পথিকৃৎ। এই ধারায় তাঁর প্রথম রচনা 'পিঁপড়ে পুরাণ'। তারপরে দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চ আর বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা মিশিয়ে যে রচনা দিয়ে বাংলা ভাষায় এক নতুন জাতের সাহিত্যকৃতির প্রথম পর্যায় শুরু করেন তার নাম 'কুহকের দেশে'। বিগত শতকের তিরিশের দশকের প্রথম দিকে মাসিক 'মৌচাক' পত্রিকায় এই উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, কিন্তু তখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

১৯৪৮ সালে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রচ্ছদে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় মামাবাবুর দ্বিতীয় কাহিনি 'ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস' তথা 'ড্র্যাগনের নিশ্বাস'। যাঁকে কেন্দ্র করে গ্রন্থকার, প্রকাশক ও প্রচ্ছদশিল্পীর অমন সম্মিলন সেই মামাবাবুর সম্বন্ধে স্বভাবতই একটা বিশেষ কৌতূহল জাগে বাঙালি পাঠক সমাজে। কিন্তু গ্রন্থকার নিজে তখন সাহিত্য ও চলচ্চিত্র, কলকাতা ও বোম্বাই করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর সেই অস্থিরতার সান্ধ্যপর্বে শ্রীপ্রকাশ ভবন থেকে ১৯৬৩ সালে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় 'কুহকের দেশে'।

তখন মামাবাবুকে নিয়ে একটা নতুন উৎসাহের সঞ্চার হল যেমন কিশোর তেমনই বয়স্ক পাঠক মহলে। তা ছাড়া ততদিনে বিশ্বজুড়ে জেগে উঠেছে কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য একটা প্রবল চাহিদা। পাঠক সমাজের দাবিতে ষাটের দশকে প্রেমেন্দ্র মিত্র আবার লিখলেন তিনটে ছোট কাহিনি—'মামাবাবুর প্রতিদান', 'আবার সেই মেয়েটি' ও 'অতলের গুপ্তধন'—এবং এই তিনটেকে একত্র করে 'মামাবাবু ফিরেছেন' গ্রন্থটি ১৯৬৮ সালে প্রকাশ করেন আলফা-বিটা নামে এক নতুন প্রকাশক, কিন্তু তার কোনও গল্পেরই শিরোনাম ছিল না।

এ যাবৎ প্রেমেন্দ্র মিত্র যে-পাঁচটা মামাবাবুর কাহিনি লিখেছেন সবগুলোই অধীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে লিখেছেন। অতঃপর তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র মৃন্ময়ের কর্মস্থল ওড়িশার সুন্দরগড় জেলার টেনসা শিল্প-নগরে কিছুকাল বাস করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে লিখলেন মামাবাবুর ষষ্ঠ কাহিনি যা ১৯৭২ সালে শৈব্যা পুস্তকালয় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন 'খুনে পাহাড়' নামে।

অবশেষে ১৯৮৩ সালে বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড থেকে মামাবাবুকে নিয়ে উল্লিখিত চারটি গ্রন্থকে একত্রে সংকলন করে প্রকাশিত হল 'মামাবাবুর কাহিনী সমগ্র'। ওই সংকলনটিতে রচনাগুলির সূচি ছিল এইরকম—'কুহকের দেশে', 'ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস', 'পাহাড়ের নাম করালী', 'অতলের গুপ্তধন', 'মামাবাবুর প্রতিদান' ও 'আবার সেই

pathagar.net

মেয়েটি'। বলে রাখা ভালো যে ওই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'পাহাড়ের নাম করালী'ই ১৯৭২ সালে 'খুনে পাহাড়' নামে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু ১৯৮৩-র 'কাহিনী সমগ্র' থেকে বোঝা যায় না যে ১৯৬৮-র 'মামাবাবু ফিরেছেন' গ্রন্থটির শিরোনামহীন গল্প তিনটেই ১৯৮৩-র 'কাহিনী সমগ্র'-তে নাম পেয়েছে এইভাবে—'মামাবাবুর প্রতিদান', 'আবার সেই মেয়েটি' ও 'অতলের গুপ্তধন'। কিন্তু তাতে 'মামাবাবু ফিরেছেন'-এর পরম্পরা রক্ষিত হয়নি। এই ২০০৭-এর সংকলনে যেমন —১৯৬৮-র কাহিনী-পরম্পরা পুনরুদ্ধার করা হল তেমনই রক্ষা করা হল ১৯৮৩-তে দেওয়া শিরোনামগুলিও।

'মামাবাবু ফিরেছেন'-এ কাহিনি তিনটে শুরু করার আগে ছিল একটি অস্বাক্ষরিত ভণিতা। সেটিকে মূল সংকলনের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া গেল না বলে নিচে উদ্ধৃত করলাম—

মামাবাবু ফিরেছেন

> মামাবাবু কুহকের দেশে গিয়েছিলেন অনেক কাল আগে। ড্র্যাগনের নিশ্বাসে যে দেশ ছারখার হয়ে যেতে বসেছিল সে দেশে গিয়েও ভয়ঙ্কর এক রহস্য উদ্ঘাটিত করেছিলেন। তারপর বহুকাল তাঁর আর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নি। মামাবাবু তা বলে সত্যিই ঘুমিয়ে কাটাননি এতদিন। কি যে তিনি করেছেন এবার জানবার সময় হয়েছে। মামাবাবু ফিরেছেন। ফিরেছেন কথাটা তাঁর বেলায় অনেকভাবে খাটে। এত দিনের অজ্ঞাতবাস থেকে তিনি আবার গল্পের রাজ্যে ফিরেছেন। এক কালে বেশীর ভাগ ছোটরাই যাঁকে চিনত ভালবাসত তিনি এবার ফিরেছেন বড়দের জগতে। তিনি আরো অজানা দূর-দূরান্তর থেকে নতুন সব ভিন্ন ধরনের গল্প নিয়ে ফিরেছেন। মামাবাবু ফিরেছেন।

এখানে ভণিতাটির বানান, যতিচিহ্ন ইত্যাদি অপরিবর্তিতই রাখা হয়েছে।

এখানে মন্তব্য করতে চাই যে 'অতলের গুপ্তধন' গল্পটির সঙ্গে একই লেখকের 'সূর্য কাঁদলে সোনা' উপন্যাসটির একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে ঐতিহাসিকতায় এবং তা আবিষ্কারে এক দুর্লভ আনন্দ পাওয়া যাবে।

১৯৮৩-র 'কাহিনী সমগ্র'-তে ছিল না এমন একটি গল্পও ২০০৭-র এই সংকলনে যোগ করা হল—'পরচুলা সাহেব ও মামাবাবু'—এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়েছিল লেখকের মৃত্যুর পরে মুক্তপত্র পাবলিকেশনস কর্তৃক ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত 'ঘনাদা ও দুই দোসর মামাবাবু ও পরাশর'-এ।

এবার মামাবাবুর কাহিনির সূত্রে বানানের কথা। নিশ্চয়ই পাঠকের চোখে পড়বে যে এই 'অবতারণা'র বানানের সঙ্গে বক্ষ্যমান গ্রন্থের বানানের কোনও সামঞ্জস্য নেই। কারণ প্রেমেন্দ্র মিত্রর স্বত্বাধিকারীরা চেয়েছিলেন 'বাবার বানান' বজায় রাখতে। কিন্তু ১৯৮৩-র

pathagar.net

'কাহিনী সমগ্র'তেই রয়েছে বিচিত্র বানানের বিপুল সম্ভার—কর/করো, কোর/কোরো, কখনও/কখনো, করব/করবো, খুশি/খুশী, গেছলাম/গেছিলাম/গিয়েছিলাম, ত/তো, পুরন/পুরানো/পুরোনো, লুকন/লুকানো/লুকোনো, শৌখিন/শৌখীন/সৌখীন ইত্যাদি। তা হলে কোন বানান রাখা হবে? তখন আমায় বলা হল 'বাবা যে-বানান বেশি ব্যবহার করেছেন'। তবে ১৯৪৭-৪৮ থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রর হাতের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় এবং তাতে দেখেছি, বিভিন্ন পর্বে তিনি বিভিন্ন রকম বানান ব্যবহার করেছেন, সাধারণত তিনি ঈ-কার পছন্দ করতেন, বাড়তি ও-কার পছন্দ করতেন না, শখ-এর চেয়ে সখ-এর প্রতি তাঁর বেশি পক্ষপাত ছিল। অবশ্য তাঁর শেষ দিকের বহু গ্রন্থেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, এমন কী আনন্দবাজার পত্রিকার বানান বিধি পালনেরও দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তবে সেগুলি সম্পাদক/প্রকাশক কর্তৃক সংশোধিত হওয়াও সম্ভব। শেষ পর্যন্ত বানান ও যতিচিহ্নের ব্যাপারে অনুসরণ করেছি ১৯৮৩-র 'কাহিনী সমগ্র'র অন্তর্গত 'কুহকের দেশে'র বানান ও যতিচিহ্নকে। মামাবাবুর পূর্ববর্তী সংকলনে ভাগ্নে-লেখক মামাবাবুকে কখনও 'তুমি' কখনও 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছে, এই সংকলনে এই অসংগতি দূর করার চেষ্টা করেছি।

আরও একটা কথা আছে খোদ মামাবাবুর নাম নিয়ে। ১৯৮৩-র 'কাহিনী সমগ্র'-র অন্তর্গত 'কুহকের দেশে'-তে মামাবাবুকে উল্লেখ করা হয়েছে 'মিঃ রায়' বলে আর ভাগ্নেকে মানে লেখক নিজেকে 'মিঃ সেন' বলে। কিন্তু পরের কাহিনীগুলোতে মামাবাবুকে কখনও 'মিঃ রায়', কখনও 'মিঃ সেন' বলা হয়েছে। বক্ষ্যমান সংকলনে এই নাম-বিভ্রাট ঘোচাবার জন্য 'কুহকের দেশে'র আদর্শে সবখানেই 'মিঃ রায়' ব্যবহার করেছি মামাবাবুর জন্য আর ভাগ্নে বা লেখকের জন্য ব্যবহার করেছি 'মিঃ সেন'। অবশ্য 'মামাবাবু ফিরেছেন' বইটিতে 'মিঃ সেন' হয়ে গেছেন 'মিঃ হাজরা'। এই নাম বদলের ব্যাখ্যা আছে 'মামাবাবুর প্রতিদান' গল্পটিতে।

যদিও মোটামুটিভাবে ১৯৮৩-র 'কাহিনী সমগ্র' অনুসারেই এই ২০০৭-এর সংকলন প্রস্তুত করা হয়েছে, তবু দুটি গ্রন্থের বহুস্থলেই পাঠভেদ হুঁশিয়ার পাঠকের চোখে পড়বে, কারণ ১৯৮৩-র 'কাহিনী সমগ্র'-র পাঠেই ছিল বিস্তর ছাড়, এবং সেগুলিকে অন্য প্রকাশকের প্রকাশিত গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করে সংশোধনের চেষ্টা করেছি। এখানে নিজস্ব সংগ্রহ থেকে 'মামাবাবু ফিরেছেন'-এর ফোটোকপি করে দেওয়ার জন্য ড. রামরঞ্জন রায়কে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আশাকরি মামাবাবুর অনুরাগীরা ২০০৭-এর এই মামাবাবু সংকলনটিকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য সংস্করণ রূপে গ্রহণ করবেন।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত
২০০৭ ইং ১৪১৪ বাং

pathagar.net

এতে আছে

কুহকের দেশে
১৩
ড্রাগনের নিঃশ্বাস
৮৫
মামাবাবুর প্রতিদান
১১৯
আবার সেই মেয়েটি
১৩৩
অতলের গুপ্তধন
১৪৯
পাহাড়ের নাম করালী
১৭১
পরচুলা সাহেব ও মামাবাবু
২৪৭

pathagar.net

কুহকের দেশে

দু'বছর আগে হঠাৎ তিনটি বড় বড় রাজ্যের ওপর যুদ্ধের মেঘ কালো হয়ে জমে উঠেছিল। রাজ্যগুলি ছোটখাটো নয় এবং তাদের মধ্যে একটি আবার সাম্রাজ্য। যে কোনো মুহূর্তে তখন মনে হয়েছিল এই তিনটি রাজ্য পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযান করতে পারে।

এই সংগ্রামের কেন্দ্র হল একেবারে সুদূর প্রাচ্যে। কিন্তু এর সূত্রপাত কি থেকে, শুনলে বিশ্বাস করতে পারবে না। এর সূত্রপাত—সাধারণ একটি বাজারে—মধু রাখবার একটি বাঁশের চোঙায়।

মিচিনার বাজারে বাঁশের চোঙা করে এক জংলী কাচীন এসেছিল পাহাড়ী মধু বিক্রী করতে। সেই মধুর ভেতর ছিল একটি পোকা। সেই পোকা থেকেই তিনটি রাজ্যের ভেতর রেষারেষির সূত্রপাত।

এমন আজগুবি কথা কেউ সহজে বিশ্বাস করতে পারবে না জানি, সমস্ত গল্প না বললে এর রহস্য এক কথায় ব্যাখ্যা করাও যাবে না। সেইজন্যেই এই কাহিনীর অবতারণা।

মিচিনা যে ব্রহ্ম দেশের উত্তরে ইরাবতীর ধারে একটি শহর, একথা অনেকেরই বোধহয় জানা আছে। রেঙ্গুন থেকে সাতশ' মাইল রেলপথ পার হয়ে এখানে পৌঁছাতে হয়। রেলপথ এইখানেই শেষ। তারপর ঘন জঙ্গল আর পাহাড়ের দেশ। সে দেশের কথা সভ্য মানুষ খুব কমই জানে।

এত দেশ থাকতে এই মিচিনায় কেন যে আমার মামাবাবু চাকরী নিয়ে এসে বসেছিলেন তা তাঁর অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মতোই বোঝা কঠিন। মামাবাবু দেখতে নাদুস-নুদুস নিরীহ চেহারার লোক। কথায় বার্তায়, আচারে ব্যবহারে, কোথাও তাঁর এমন কোনো লক্ষণ নেই যার দ্বারা মনে হতে পারে যে, তিনি অসাধারণ কিছু করতে পারেন। চেহারা ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মনে হয় যে, সাধারণ কলেজের প্রফেসর বা অফিসের বড়বাবু হলেই বুঝি তাঁকে মানাত। ছেলেবেলায় তাঁর সম্বন্ধে সেই রকম আশাই সবাই করেছিল। পড়াশোনায় তিনি ভালো। সবাই ভেবেছিল বড় হয়ে একটা আরামের কাজই তিনি বেছে নেবেন। কিন্তু তার বদলে সবাইকে অবাক করে মামাবাবু গেলেন মাইনিং পড়তে। সসম্মানে মাইনিং পাস করে এসে দেশে চাকরী পাবার সুবিধে থাকতেও তিনি গেলে সুদূর বর্মার জঙ্গলে প্রসপেক্টর হয়ে। তাঁর চেহারা বিলেত ঘুরে এসেও তেমনি আয়েসী নাদুস-নুদুস ভদ্রলোকের মতো ছিল তখন। সবাই মানা করে বলেছিল যে, ও কাজের কষ্ট

pathagar.net

ও পরিশ্রম তাঁর সইবে না। সইল কি না বলা যায় না,কিন্তু মামাবাবু ত দেশে আব ফেরেন নি। মিচিনায় তাঁর হেড কোয়ার্টার; সেখান থেকেই তিনি কিছুদিন আগে আমায় বেড়াতে আসার জন্যে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন। কোনো কাজ সম্প্রতি ছিল না বলে আমিও রাজী হয়ে গেছলাম। রেঙ্গুনের জাহাজে যেদিন উঠেছিলাম সেদিন কে জানত আমার ভ্রমণ মিচিনাতেই সাঙ্গ হবে না;—ভাগ্য আমার জন্যে এমন রহস্যময় এমন ভয়ঙ্কর ভ্রমণকাহিনী নির্ধারিত করে রেখেছে, যা খুব কম লোকের জীবনেই ঘটে।

মিচিনায় মামাবাবুর বাড়ীতে এসে. প্রথমেই সেটা বাড়ী না যাদুঘর বুঝতে পারলাম না। মামাবাবু শুধু খনিজ বিদ্যাতেই তন্ময় নন, আরও অনেক কিছু নিয়ে তিনি মাথা ঘামান। উত্তর ব্রহ্মের—পাথরের মূর্তি, কাঠের কাজ থেকে সেখানকার নানা জন্তু-জানোয়ার কীট-পতঙ্গ সব কিছুরই নমুনা তিনি বাড়ীতে সংগ্রহ করে রেখেছেন। দিন-রাত সেই সব নিয়েই তিনি মেতে থাকেন।

মাথায় সামান্য একটু টাক পড়া ছাড়া মামাবাবুর চেহারার কিন্তু কিছুই পরিবর্তন হয়নি। প্রকৃতিরও নয়। তাঁকে দেখলে সবারই মনে বুঝি একটু আগলাবার প্রবৃত্তি হয়—অসহায় ছেলেমানুষকে যেমন করে আগলাতে হয় তেমনি। তাঁর সঙ্গে এত বছর কাটিয়ে ভালো করে পরিচয় পাওয়া-সত্ত্বেও এখনো আমার মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়।

মিচিনায় গিয়ে প্রথম কয়েকদিন বেশ শান্তভাবেই কাটল। মামাবাবুকে দেখে মনে হল, যৌবনে যাই থাকুন, বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বেশ শান্ত হয়ে গেছেন। পড়াশোনা নিয়েই মেতে থাকেন, অন্য দিকে বেশী নড়বার চড়বার আর উৎসাহ নেই। আর উৎসাহ থাকবেই বা কোথা থেকে। অভ্যেস অনেকগুলি তিনি খুব খারাপ করে ফেলেছেন—প্রায় নির্ম্মা বাঙালী জমিদারের মতই। দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে তোফা একটি ঘুম না দিলে তাঁর চলে না, রাত্রে রোজ আধঘণ্টা চাকরকে দিয়ে ভালো করে পা টেপানো তাঁর চাই। এ ছাড়া খাওয়া-দাওয়ার বাবুয়ানির ত কথাই নেই। এ রকম লোক কি আর নড়তে চড়তে পারে বেশী। বুঝলাম, ছেলেবেলায় তাঁকে যারা আয়েসী ভেবেছিল, তারা নেহাত ভুল করেনি। দিন কতক একটু জ্বলে উঠেই তিনি আবার নিভে গেছেন। তিনি যে বাংলা দেশে ফেরেন নি, তার কারণ বোধ হয় এই যে, এক জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যাওয়ার পরিশ্রম ও হাঙ্গামাটুকুও তিনি আর পোহাতে রাজী নন।

মামাবাবুর আশ্রয়ে দুবেলা রাজভোগ খেয়ে ও নতুন দেশে একটু-আধটু বেড়িয়ে বেশ দিন কাটছিল। ওজনে যেভাবে বাড়তে শুরু করেছিলাম তাতে নিজেরই ভয় হচ্ছিল। এমন সময়—

এমন সময় কিছুই নয়, মিচিনার বাজারে এক জংলী কাচীন এল মধু বেচতে। সেই মধু বাঁশের চোঙা সমেত কিনে আনলে আমাদের চাকর মঙপো। এবং সেই মধু বিকেলবেলা প্লেটে করে চাক্‌তে গিয়ে মামাবাবু হঠাৎ চমকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন।

আমি পাশেই বসে চা খাচ্ছিলাম, অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— "হল কি, মামাবাবু?"

"শীগগির আমার ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসটা আন দেখি।" বলে মামাবাবু প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

pathagar.net

ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস এনে মামাবাবুর হাতে দেবার সময় ব্যাপারটা কি বুঝতে পারলাম। প্লেটে মধুর ভেতর একটি পোকা, বোধ হয় মৌমাছিই হবে। সেইটে দেখেই মামাবাবুর এত উত্তেজনা।

মামাবাবু তখন কাঁচটা পোকাটির ওপর ধরে নিবিষ্ট মনে কি দেখতে আরম্ভ করেছেন। একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম— "নতুন রকম মৌমাছি নাকি?"

মামাবাবু মাথা তুলে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন— "নতুন? নতুন কি—একেবারে অদ্ভুত! এর হুল আলাদা, এর...." এইবার মামাবাবু গড়গড় করে নামতার মত এমন সব গোটাকতক বৈজ্ঞানিক নাম বলে গেলেন যার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। সামান্য একটা মৌমাছি নিয়ে এতটা উৎসাহও আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সামনের প্লেটে একটা সামান্য পোকার বদলে বুঝি সাত রাজার ধন মানিক পাওয়া গেছে। মামাবাবু তাঁর বক্তৃতা শেষ করেই ডাক দিলেন— "মঙপো!"

মঙপো আমাদের মগ চাকর, মামাবাবুর সঙ্গে বহুকাল বাস করার দরুন বাংলা কিন্তু সে বেশ বোঝে। মঙপো এসে দাঁড়াবামাত্র মামাবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মধু সে কার কাছে থেকে কিনেছে। মধু খারাপ ভেবে মঙপো তখন নিজের ওকালতী শুরু করে দিলে—মধু সে খুব ভালো জায়গা থেকেই কিনেছে। আসল পাহাড়ী মধু। সে আর মধু চেনে না.....ইত্যাদি।

মামাবাবু তাকে বক্তৃতার মাঝে থামিয়ে দিয়ে বললেন— "হ্যাঁ হ্যাঁ, মধু তুই খুব চিনিস। যার কাছে কিনেছিস তাকে নিয়ে আসতে পারিস এখানে?"

মধুওয়ালাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে শুনে মঙপো ত প্রথমটা অবাক। তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে সে বললে যে, মধুওয়ালা একজন পাহাড়ী কাচীন, সকালে এসেছিল বাজারে, তাকে কোথায় পাওয়া যাবে আর!

"খুব পাওয়া যাবে। তুই খোঁজ গিয়ে, দেখ।" বলে মামাবাবু তাকে ধমকে পাঠিয়ে দিলেন, তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—"পাহাড়ীরা অমন দু'শ' তিনশ' মাইল দূর থেকে জংলী জানোয়ারের ছাল, জংলী চাকের মধু প্রভৃতি নিয়ে শহরে আসে। শহরে তারা একদিন থেকেই কখনো চলে যেতে পারে না।"

আমি বললাম—"কিন্তু মধুওয়ালাকে খুঁজছেনই বা কেন?"

"বাঃ, খুঁজব না!" শান্তশিষ্ট মামাবাবুর হঠাৎ গলার স্বরও গেছে বদলে—"এ রকম মৌমাছির চাক কোথায় হয় জানতে হবে না?"

"তা হবে বটে!" বলে একটু হেসে আমি তখন বেরিয়ে গেলাম।

মধুর ও নতুন রকমের মৌমাছির কথা আমি একরকম ভুলেই গেছলাম। সমস্ত দিন মামাবাবুর সঙ্গে দেখাও হয়নি। রাতে এক সঙ্গে খেতে বসে হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম—"মধুওয়ালাকে পাওয়া গেল?"

মামাবাবু অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছিলেন। আমার কথায় সচেতন হয়ে একবার শুধু বললেন—"হুঁ।" তারপর আবার নিজের ভাবনায় যেন ডুবে গেলেন।

pathagar.net

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথাকার মৌমাছি জানা গেল?"

মামাবাবু কিন্তু সে কথার জবাব না দিয়ে নিজের মনেই অনেকটা বললেন— "জানা ত গেছে, কিন্তু সেখানে যেতে পারলে খুব ভালো হয়। কে জানে আরো কত নতুন স্পিসিজ, এমন কি জেনাস, সেখানে পাওয়া যেতে পারে। এদিকের পোকামাকড় সম্বন্ধে ভালো করে গবেষণা এখনো হয়নি। সত্যিকারের এনটোমোলজিক্যাল এক্সপিডিশন হয়নি একটাও।" বলতে বলতে মামাবাবু আবার উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।

বললাম— "তা হলে চলুন না যাই!"

"তাই ত ভাবছি!"

একটু কৌতুক করেই জিজ্ঞাসা করলাম— "জায়গাটা কোথায়? কত দূর হবে?" কিন্তু পরমুহূর্তে মামাবাবুর উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

মামাবাবু বললেন— "বর্মার সীমান্ত পার হয়ে যেতে হবে হিমালয়ের ধারে, পাহাড় আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শ' চারেক মাইল।"

একটু হেসে আমায় যেন খুশী করবার জন্যেই মামাবাবু আবার বললেন— "ফিরতে পারলে একটা কীর্তি থাকবে। এ অঞ্চল সত্যি মানুষের একেবারে অজানা। এখনো পর্যন্ত কেউ সে দেশে যায়নি, অন্তত গিয়ে ফেরেনি।"

তারপর ক'দিন ধরে মামাবাবুর কাছে সে অদ্ভুত দেশের কথা একটু একটু করে শুনলাম। চীন, বর্মা ও তিব্বতের সীমান্ত সেখানে এসে মিলেছে। সেটাকে বলা হয় 'অজানা ত্রিভুজ'। এই অজানা ত্রিভুজাকৃতি দেশ ইরাবতীর একটি প্রধান শাখার উৎপত্তিস্থল। সে উৎপত্তিস্থল এখনো কেউ দেখেনি। সে দেশের পাহাড়, জঙ্গল, জানোয়ার, মানুষ সম্বন্ধেও দু-একটা গুজব ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। সে দেশে যাবার পথকে দুর্গম বললে কিছুই বলা হয় না। যে কাচীন পাহাড়ীদের কাছে সেখানকার খবর পাওয়া যায় তারাও নিজেরা খুব কমই সেখানে যায়। সেখানে দারু বলে বামনাকৃতি একরকম জাত আছে, তাদেরই ছুটো-ছাটা দু-একটা শিকারী কাচীনদের কাছে কখনো কখনো এসে পাহাড়ী মধু, জানোয়ারের ছাল প্রভৃতি বিক্রী করে। আমাদের মধুওয়ালা এইভাবেই তার মধু পেয়েছিল।

এসব বিবরণ শুনে মনে মনে কিন্তু আমি একটু আশ্বস্তই হলাম। দুপুরবেলা যে লোকের ঘণ্টা দুই আরামে ঘুম না দিলে চলে না, সে লোক যে এসব দেশে অভিযান করবে না এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু অসম্ভবই একদিন ঘটে গেল। ক'দিন ধরে দেখছিলাম, আমাদের বাড়ীতে চীনে মজুররা যাতায়াত করছে। বাড়ীতেও ছোট ছোট ক্যাম্বিসের তাঁবু, প্যাকিং কেস প্রভৃতি নানা সরঞ্জাম জমা হচ্ছে। মামাবাবু রাতদিনই ব্যস্ত। কখনো একটা বাক্সে কাঠকয়লার গুঁড়ো ভরছেন, কখনো পোকা ধরার জাল সাজাচ্ছেন। হঠাৎ একদিন এরই ভেতর স্তম্ভিত হয়ে শুনলাম, পরের দিনই মামাবাবু সেই দূর দেশের জন্যে যাত্রা করবেন। আয়োজন সব সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

অবিশ্বাসের স্বরে বললাম— "বলছেন কি মামাবাবু, সত্যি যাচ্ছেন!"

pathagar.net

"হ্যাঁ, না গিয়ে কি করি!" এমনভাবে মামাবাবু কথাটা বললেন, যেন তাঁর পিতৃদায় উপস্থিত। না গেলেই নয়।

খানিক চুপ করে থেকে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললাম— "আমিও ত যাচ্ছি।"

মামাবাবু একটু মাথা চুলকে বললেন— "বড্ড কষ্ট, অনেক বিপদ-আপদ হতে পারে। ভাবছিলাম তুই না হয় থাক!"

আমি হেসে উঠলাম। মামাবাবু চল্লিশ বছর বয়সে ওই আয়েসী দেহ নিয়ে আমায় কষ্টের আর বিপদের ভয় দেখাচ্ছেন!

বললাম— "আমি যাবই।"

"তবে চ'! অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হবে।" বলে মামাবাবু রাজী হয়ে চলে গেলেন। আমি কিন্তু নতুন অভিজ্ঞতার জন্যে মোটেই ব্যাকুল ছিলাম না। মামাবাবুকে সামলাবার জন্যেই আমার যাওয়া।

পরের দিন আমাদের যাত্রার লটবহর দেখে আমি অবাক। কুড়িটি অশ্বতরের পিঠে বোঝা চাপিয়ে বিশজন চীনে সর্দার আমাদের সঙ্গে চলেছে। তাদের সে বোঝার ভেতর খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওষুধপত্র থেকে বন্দুক, ডিনামাইট প্রভৃতি সব জিনিস আছে। আমাদের চাকর মঙপো ছাড়া আমাদের অন্যান্য কাজ করবার জন্যে আরো দুজন কাচীন পাহাড়ী আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।

সমস্ত ব্যাপারটাকে সামান্য পোকা-শিকারের অভিযান ভাবতে আমার ভারী মজা লাগছিল; আগে লোকে দুর্গম বিপদসঙ্কুল দেশে যেত দামী ধনরত্নের খোঁজে। এখন সামান্য পোকা সংগ্রহ করবার জন্যে মানুষ তার চেয়েও বিপদসঙ্কুল দেশে প্রাণ হাতে নিয়ে যায়।

কিন্তু যাই হোক, এ মজা বেশীদিন রইল না। আমাদের এই অভিযান যে পোকা-শিকারের চেয়ে অনেক বেশী কিছু হবে, তার পরিচয় শীগগিরই পেয়ে গেলাম।

আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল ছিল হার্টজ্ কেল্লা। এই কেল্লা মিচিনা থেকে দু'শ কুড়ি মাইল। এই পথটুকু শীতকালটা একরকম সুগমই বলা যেতে পারে। ঘোড়ায় চেপেও যাওয়া যায়।

দু'ধারে বন জঙ্গল, তারই ভেতর দিয়ে মানুষের ও ঘোড়ার পায়ে মাড়ানো সঙ্কীর্ণ পথ। এই পথ দিয়ে তিনদিন গিয়েই আমরা ইরাবতীর দুই শাখার সঙ্গমস্থল পেলাম। তারপরই পাহাড় আরম্ভ। এখান থেকেই পথ একটু দুর্গম হতে আরম্ভ হয়েছে।

চারদিনের দিন আমাদের তাঁবু পড়ল ইরাবতীর পশ্চিম শাখার ধারে একটা ছোট পাহাড়ের উপত্যকায়। এই কাচীনদের দেশ। দূরে দূরে জঙ্গলের ভেতর থেকে কাচীনদের ছোট ছোট ঘরের চাল উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু গ্রামের সংখ্যা বেশী নয়। জঙ্গলই এখানে প্রধান। কাচীনরা বর্মার এই সীমান্ত প্রদেশের এক দুর্ধর্ষ জাত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এদের উপদ্রবে আশপাশের সকলকে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হ'ত। তখন এরা প্রায়ই আশপাশের দেশ আক্রমণ করে বন্দীদের ক্রীতদাস করে আনত। এখন এরা শুনলাম অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। কিন্তু একেবারে নয়।

pathagar.net

এ দেশে বাঘের উপদ্রব বেশী বলে আমাদের তাঁবু ও অশ্বতর বাহিনীকে সারারাত ভালো করে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হঠাৎ মাঝ রাতে ভয়ঙ্কর বাঘের গর্জন ও মানুষের চীৎকার শুনে সভয়ে জেগে উঠলাম। দেখলাম, মামাবাবু আমার আগেই বন্দুক হাতে তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি আমার বন্দুক নিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বাইরে বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। অন্ধকার এমন গাঢ় যে চোখ খুলে থাকা না থাকা সমান মনে হয়। তারই ভেতর আমরা কান খাড়া করে খানিক অপেক্ষা করলাম। কিন্তু আশ্চর্য, গোলমাল ও গর্জন একবার উঠেই একেবারে যেন থেমে গেছে! জঙ্গলের গাঢ় নিস্তব্ধতা চারিধারে।

আমাদের কিছু দূরের তাঁবুতেই মঙপো ও আমাদের আর দুজন চাকর শোয়। তাদেরও কোনো সাড়াশব্দ নেই। তারা কি এমন অঘোরে ঘুমোচ্ছে যে, এই ভয়ানক শব্দ শুনতে পায়নি! তাদের একজনের ত জেগে পাহারা দেবার কথা। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

অত্যন্ত বিপজ্জনক হলেও মামাবাবু এবার টর্চ জ্বেলে সামনে এগিয়ে গেলেন। বাধ্য হয়ে আমিও তাঁর সঙ্গে পেলাম। প্রথম গিয়ে আমরা ঢুকলাম মঙপোদের তাঁবুতে, তাদের জাগাবার জন্যে। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁবুর ভেতরে মঙপো ও আমাদের কাচীন দুজন চাকরের কেউ নেই। তাদের বিছানা পাতা রয়েছে, তাঁবুর জিনিসপত্রও কিছু অগোছাল নয়, শুধু তাদেরই পাত্তা নেই।

আমাদের চীনে অনুচররা পাহাড়ের একটু নীচে তাদের আস্তানা গেড়েছিল। তারা তাঁবুটাবু এসব বালাই-এর ধার ধারে না, অতি বড় শীতেও ঘোড়ার লোমের কম্বল মুড়ি দিয়ে অনায়াসে বাইরে শুয়ে রাত কাটায়। মামাবাবু এবার তাদের সর্দার লি-সিনের নাম ধরে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে সে চীৎকার চারিধারের পাহাড়ে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি তুললে। কিন্তু তবু কারু সাড়া পাওয়া গেল না। মামাবাবু ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করলেন।...

সামান্য একটা বন্দুকের আওয়াজ যে এমন শোনাতে পারে তা আগে কখনো জানতাম না। সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে চারিধারের পাহাড়ে অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে সে শব্দ যেন আমাদেরই চমকে দিলে। মনে হল একটা নয়, আমাদেরই বন্দুকের সঙ্গে যেন দূরে আরো অনেক বন্দুক গর্জন করে উঠেছে।

ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজের ফলও হল অদ্ভুত। প্রতিধ্বনিটা ধীরে ধীরে পাহাড়ে পাহড়ে ধাক্কা খেয়ে মিলিয়ে যেতে না যেতেই আমাদের চীনা অশ্বতর-চালকদের দলের গোলমাল শোনা গেল। আমরা টর্চ জ্বেলে তাদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, বন্দুকের শব্দে ভীত হয়ে তারাও কয়েকজন খোঁজ করতে আসছে। তাদের ভেতরে দলের সর্দার লি-সিনও আছে।

মাঝপথে দেখা হতেই মামাবাবু একটু কঠোর স্বরে লি-সিনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এত ডাকাডাকিতেও সে সাড়া দেয়নি কেন। লি-সিন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ল এবার।

pathagar.net

কুণ্ঠিতভাবে জানালে সারাদিনের পরিশ্রমের পর গভীরভাবে তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমাদের ডাক শুনতে পায়নি তাই।

মামাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— " সে কি, তোমরা বাঘের গর্জনও শুনতে পাওনি?"

লি-সিন আমাদের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বললে— "বাঘের গর্জন আবার কোথায়!"

বাঘের গর্জন কোথায়? এরা বলে কি! এবার মামাবাবু ও আমি হতভম্ব হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। লি-সিন কিন্তু অত্যন্ত জোর গলায় জানালে যে, কোনো রকম বাঘের গর্জন কোথাও হয়নি। হলে তারা হাজার ঘুমোলেও নিশ্চয়ই শুনতে পেত।

বাঘের গর্জনের ব্যাপারটা রহস্য হয়ে উঠলেও মঙপো ও কাচীন চাকর দুজনের অন্তর্ধানের কারণ জানতে পেরে না হেসে থাকতে পারলাম না। চীনেদের দেখাদেখি হতভাগাদের আজ সন্ধ্যার পর একটুখানি তাদের মতো নলের ভেতর দিয়ে ধোঁয়া খাবার লোভ হয়েছিল। সে লোভের শাস্তি তাদের হাতে হাতে মিলেছে। চীনেদের চণ্ডুর নলে কয়েক টান দিয়েই তারা এমন কাত হয়েছে যে, নিজেদের তাঁবুতে উঠে আসতেও তাদের ক্ষমতায় কুলোয়নি। চীনেদের সঙ্গেই তাদেরই কম্বল চাপা দিয়ে দুজনে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে।

তাঁবু ছেড়ে এভাবে চলে যাওয়াটা অত্যন্ত অন্যায় হলেও তখন আর তাদের ভর্ৎসনা করতে যাওয়া বৃথা। বিশেষ করে তাদের অবস্থার কথা ভেবেই হাসি পাচ্ছিল। লি-সিনের কাছে ব্যাপারটা শুনে মামাবাবু কোনও রকমে হাসি চেপে বললেন— "থাক, হতভাগাদের আর জাগিয়ে কাজ নেই। এই ঠাণ্ডায় সারারাত বাইরে শুয়ে কাল নিমোনিয়া ধরলে মজাটা আরো ভালো করে বুঝবে।"

লি-সিনের দলকে এবার বিদায় দিয়ে আমরা আবার তাঁবুর দিকে ফিরলাম। আমি একটু হেসে মামাবাবুকে বললাম— "মিছিমিছি কি ভয়টাই পেলাম বলুন ত।"

মামাবাবু গম্ভীরভাবে শুধু "হুঁ" ছাড়া আর কিছু বললেন না।

তাঁবুতে ঢুকতে গিয়েই কিন্তু দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। বেরুবার সময় আমরা যে তাঁবুর কাপড়ের দরজা আটকে রেখে এসেছিলাম এ কথা আমাদের স্পষ্ট মনে আছে। এখন কিন্তু তাঁবুর দরজা দেখা গেল খোলা। আমাদের এই সামান্য অনুপস্থিতির সুযোগে কেউ যে এসে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে সে? তার উদ্দেশ্যই বা কি?

উদ্দেশ্য বোঝা আরো কঠিন এই জন্যে যে, তাঁবুর ভেতরের সমস্ত জিনিস যথাস্থানেই আছে। কোনো কিছু চুরি গেছে বলে আমরা বুঝতে পারলাম না। আমার সোনার হাতঘড়িটা শোবার আগে বিছানার ধারেই রেখেছিলাম। সেটা সেইখানেই এখনো টিক টিক করছে। আমাদের দামী গরম কাপড়ের পোশাকগুলোর ওপরও কেউ নজর দেয়নি।

তাঁবুর দরজা আটকে দেওয়ার কথা স্পষ্ট মনে না থাকলেও এ ব্যাপারও বাঘের গর্জনের মত আমাদের মনের ভুল ভাবতে পারতাম। কিন্তু তার তো পথ নেই।

pathagar.net

ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে সমস্ত রাত দুর্ভাবনায় ভালো করে ঘুমোতেই পারলাম না। সকাল হতে না হতেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

চারিদিকে ঘন কুয়াশা, জঙ্গলের গাছগুলো থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মত টপ টপ করে শিশির পড়ছে। কুয়াশার অস্পষ্টতায় হঠাৎ মনে হতে পারে যে চারিদিকে কোমল দ্রুত পায়ে বনের পরীরাই চলা-ফেরা করছে। কিন্তু তখন অমন কল্পনা উপভোগ করবার মত মনের অবস্থা নয়। রাত্রের অদ্ভুত ব্যাপারটার কোনো অর্থ না পেয়ে মেজাজ তখনো বিগড়ে আছে।

মামাবাবু আমার মতই ঘুমোতে পারেননি সারারাত। সকাল হবার আগে থাকতে আলো জ্বেলে তিনি তাঁবুর ভেতর তাঁর বাক্স-টাক্স ঘেঁটে কি করছিলেন। দু-চারবার তাঁবুর সামনে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল নীচের দিকে। ভালো করে একটু লক্ষ করে দেখেই আমি উত্তেজিত স্বরে ডাকলাম— "মামাবাবু!"

আমার গলার স্বর বোধহয় একটু বেশী রকম অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। মামাবাবু ভীতভাবে বাইরে ছুটে এসে বললেন— "কেন, কি হয়েছে?"

আমি নীচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম— "দেখতে পাচ্ছেন, কিসের পায়ের দাগ?"

মামাবাবু কিন্তু আমার এ আবিষ্কারে মোটেই উৎসাহ দেখালেন না। নিতান্ত শান্তভাবে এবার বললেন—"দেখতে পাচ্ছি বাঘের পায়ের দাগ। এ দাগ তাঁবুর ভেতরেও আছে!"

"তাঁবুর ভেতরেও?" আমি একেবারে চমকে উঠলাম।

"হ্যাঁ, তাঁবুর ভেতরেও আছে। কালকেই আমি দেখেছি।"

আমি সবিস্ময়ে বললাম— "তা হলে কাল আমাদের তাঁবুতে বাঘই ঢুকেছিল।"

মামাবাবু খানিক চুপ করে থেকে একটু হেসে বললেন— "কিন্তু তাঁবুর দরজা খুলে ভেতর থেকে কম্পাস চুরি করে নিয়ে যায় এ রকম বাঘের কথা ত শুনিনি।"

আমি সত্যই বিমূঢ় হয়ে গেছলাম। মামাবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—"সত্যিই তাই। কাল আমাদের তাঁবুর এত জিনিস থাকতে শুধু কম্পাসটি চুরি হয়ে গেছে। অথচ কম্পাসটি ছিল আমার ব্যাগের একেবারে তলায়।"

"আর কোনো জিনিষ চুরি যায়নি? ভালো করে দেখেছেন ত?"

"এতক্ষণ ধরে ত তাই দেখলাম। আমার কাগজপত্রের বাক্সটা অবশ্য ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, কিন্তু সব কিছু ফেলে দিয়ে নিয়ে গেছে শুধু কম্পাসটি।"

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম— "তাহলে কি বলতে চাও, কাল রাত্রে ওই যেটুকু সময় আমরা তাঁবুতে ছিলাম না, তারই ভেতর বাঘ ও চোর দুই ঢুকেছিল তাঁবুতে?"

মামাবাবু বললেন— "তা ছাড়া কি বলব। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, বাঘের পায়ের দাগ যেখানে পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্ট, সেখানে মানুষের পায়ের কোনো চিহ্নও নেই।"

pathagar.net

যত ভাবছিলাম, গত রাত্রের রহস্য তত যেন আরো জটিল হয়ে উঠছিল। আমরা এই পাহাড়-জঙ্গলের দেশে নিরাপদে থাকব ভেবে অবশ্য আসিনি। বিপদ আছে সে কথা আমরা জানতাম, কিন্তু এ রকম দুর্বোধ্য রহস্যজাল আমাদের ঘিরবে এ কথা আমরা কল্পনাও করিনি। যেদিক দিয়েই ভাবতে যাই সমস্ত ব্যাপারটার কোনও মানেই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ যেন ভৌতিক ব্যাপার। আসলে আমাদের খুব বেশী কোনো ক্ষতি না হলেও আমরা কিছুতেই স্বস্তি বোধ করতে পারছিলাম না। কেন যেন মনে হচ্ছিল, কি গভীর একটা চক্রান্ত আমাদের চারিধারে জাল বিস্তার করে আছে। কালকের ব্যাপারে তার সামান্য একটু আভাস পেয়েছি মাত্র।

সেদিন ইচ্ছে করেই আমরা অনেক বেলা পর্যন্ত তাঁবু আর তুললাম না। বিপদের আভাস যখন পাওয়া গেছে তখন এর পর থেকে আমাদের আরো সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হবে। মামাবাবু তারই ব্যবস্থা করছিলেন। এর মধ্যে লি-সিন দুবার এসে কখন যাত্রা শুরু হবে তার খোঁজ করে গেছে। এর পর পথ নাকি অত্যন্ত গভীর বিপদসঙ্কুল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি রওনা না হলে আমরা সন্ধ্যার আগে সে জঙ্গল পার হতে পারব না, এই তার বক্তব্য।

লি-সিন দ্বিতীয়বার এসে চলে যাবার পর আমি একটু ইতস্ততঃ করে মামাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম— "লি-সিনকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয় মামাবাবু?"

মামাবাবু আমার প্রশ্নে যেন অবাক হয়ে বললেন—"কেন? খুব ভালো লোক ত!"

একটু চুপ করে থেকে বললাম—"কিন্তু আমার একটা কথা মনে হচ্ছে!"

মামাবাবু একটু হেসে বললেন— "কি?"

বললাম—"বিশেষ করে কালকে রাত্রেই মঙপো আর কাচীন চাকর দুটোর চণ্ডু খেতে গিয়ে অজ্ঞান হওয়া একটু সন্দেহজনক বলে মনে হয় না আপনার?"

মামাবাবু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—"হতে পারত, যদি লি-সিনকে আমি না জানতাম ভালো করে। এরকম বিশ্বাসী লোক খুব কম পাওয়া যায়। লি-সিন আমার সঙ্গে আগেও অনেক জায়গায় গিয়েছে।"

এর পর আর আমি কিছু বলতে পারলাম না। সত্যিই লি-সিনকে সন্দেহ করবার স্পষ্ট কোনো কারণ নেই। তাঁবুর ভেতর বাঘের পায়ের রহস্যজনক দাগ ও কম্পাস চুরির সঙ্গে তার সংস্রব কল্পনা করাও অসম্ভব। তবু মনের ভেতর একটা খোঁচা আমার থেকেই গেল। এই সন্দেহের মীমাংসা সেই সময়েই না করে নেওয়ার জন্যে একদিন আমাদের সর্বনাশ হবার উপক্রম হবে তখন যদি জানতাম।

সেদিন তাঁবু তুলে যাত্রা করার পূর্বে আর একটি সংবাদ পেয়ে আমরা বিচলিত হলাম একটু। আমরা রওনা হবার উপক্রম করছি, এমন সময় নিকটস্থ কাচীনদের গ্রামের মোড়ল এল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে কয়েকজন অনুচর। আমাদের তখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। তবু লৌকিকতা বজায় রাখবার জন্যে আলাপ করতে বসতেই হল। কাচীনদের রাজ্যে এসে তাদের অপমান করা ত আর যায় না।

pathagar.net

মোড়লের আলাপ করতে আসার উদ্দেশ্য জানতে অবশ্য দেরী হল না।

দু-এক কথার পর সে জানালে তার কাছে অত্যন্ত দামী দুষ্প্রাপ্য নানা রকম জানোয়ারের ছাল আছে। খুশী হয়ে সে আমাদের কিছু উপহার দিতে চায়। বিনিময়ে সে কিছুই চায় না। শুধু এই জঙ্গলের দেশে গুলি-বারুদের বড় অভাব। আমরা তাকে সামান্য কিছু গুলি-বারুদ দিয়ে নিশ্চয় সাহায্য করব, সে জানে।

মামাবাবু তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, আমাদের সঙ্গে গুলি-বারুদ খুব অল্পই আছে। আমাদের নিজেদের পক্ষেই তা যথেষ্ট নয়, সুতরাং তা থেকে আমাদের কিছু দেওয়া অসম্ভব। সেই জন্যেই আপাততঃ তার চামড়ার লোভ আমাদের সম্বরণ করতে হল।

কাচীন মোড়ল কিন্তু নাছোড়বান্দা।

এবার সে জানালে যে, সাধারণ চামড়া নয়, একটা আসল সাদা বাঘের ছাল সে আমাদের দিতে প্রস্তুত। গুলি, বারুদ না পারি, আমরা কিছু কেরোসিন তেলও তাকে দিতে পারি।

মামাবাবু এবার হেসে ফেলে বললেন যে, সাদা বাঘের চামড়া অত্যন্ত মূল্যবান হলেও আমাদের এখন মোট বাড়াবার উপায় নেই। ফেরবার পথে সম্ভব হলে তিনি সেটি নিয়ে যাবেন।

কাচীন মোড়ল মনে হল অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

তবু ওঠবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে সে বললে যে, দুদিন আগে আমাদের আগের দলের কাছে সে বিস্তর উপহার পেয়েও সাদা বাঘের চামড়া দেয়নি। সাদা বাঘের চামড়া দশ বছরে একটা মেলে কি না সন্দেহ। আমরা এ দুষ্প্রাপ্য জিনিস হেলায় ফেলে...

মামাবাবু এবার কিন্তু মোড়লকে তার বক্তৃতার মাঝেই থামিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন— "আমাদের আগের দল? আমাদের আগের দল কি বলছ?"

মোড়ল মাটিতে তার বল্লম ঠুকে জানালে—মিছে কথা সে কিছু বলছে না, আগের দলকে সে সত্যই দুদিন আগে অনেক জিনিসের বদলেও সাদা বাঘের চামড়া দেয়নি।

মামাবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন— "তা বেশ করেছ। কিন্তু আগের দল কারা?"

"সে কি, দুদিন আগেই ত আপনাদের মত আরেক দল এই পথে গেছে। আপনারা কি তা জানেন না?" এবার মোড়ল জিজ্ঞাসা করলে অবাক হয়ে।

মামাবাবু মনে হল অনেক কষ্টে নিজের উত্তেজনা শান্ত করে সহজ গলায় বলবার চেষ্টা করলেন— "ও, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, কি রকম দল বল দেখি?"

"দল আর কি রকম। আপনাদের চেয়ে কিছু বড় হবে, মোট-ঘাটও তাদের অনেক বেশী।"

মামাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"তাদের দলে কি সাহেব আছে?"

"সাহেব?" মোড়ল খানিকক্ষণ ভেবে বললে—"সাহেব আছে বলে ত মনে হচ্ছে না। একজন চীনাই দলের নেতা।"

মামাবাবু হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমাদের সাদা বাঘের ছাল উপহার দেবার কোন আশা আর নেই দেখে কাচীন সর্দার শেষে ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিলে, আমাদের তাঁবুও তারপর উঠল।

pathagar.net

আজকের পথ ঘন বিপদসঙ্কুল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। জঙ্গলটি আবার বেশ বড়। সন্ধ্যার আগেই সেটি পার হতে না পারলে বিশেষ ভয়ের কথা। লি-সিন ও তার দলের লোকেরা আমাদের অশ্বতর বাহিনীকে তাই একটু জোরেই হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। জঙ্গলে বিপদের আশঙ্কা আছে বলে আজকে মঙপোকে বন্দুক দেওয়া হয়েছে। সে চলেছে অশ্বতর বাহিনীর আগে লি-সিনের সঙ্গে। আমরা দুজনে সশস্ত্র হয়ে পেছনে চলেছি। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে অত্যন্ত সরু পথ গিয়েছে। পাশাপাশি দুটি ঘোড়া যাবার রাস্তাও সব জায়গা নেই। আমাদের অশ্বতরবাহিনীর দীর্ঘ সারি—প্রায় অধিকাংশই জঙ্গলের ভেতর আড়াল হয়ে আছে। কাচীন মোড়লের কাছে সেই সংবাদ শোনা অবধি মামাবাবু যেন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেছলেন। বহুক্ষণ পর্যন্ত পথে যেতে যেতেও তিনি কোন কথা বললেন না। অবশেষে আমিই একটু অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— "ব্যাপারটা কি বল ত?"

মামাবাবু খানিকক্ষণ আমার কথার উত্তর দিলেন না। তারপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন— "ব্যাপার অত্যন্ত অদ্ভুত।"

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম— "অদ্ভুত বলছেন কেন? আমাদের আগে আরেক দল এই পথে গেছে বলে?"

মামাবাবু বললেন—"হুঁ।"

"কিন্তু সেটা এমন কি আশ্চর্য ব্যাপার?"

মামাবাবু এবার উত্তেজিতভাবে বললেন—"আশ্চর্য ব্যাপার নয়? এই দুর্গম দেশে এ পর্যন্ত ব্রিটিশ সৈন্য ও রাজকর্মচারী ছাড়া কালেভদ্রেও সভ্য জগতের কেউ আসেনি; আমাদের অভিযানই এই পথে প্রথম। অথচ ঠিক আমাদের অভিযানের সঙ্গে সঙ্গেই শোনা যাচ্ছে আরেকটি দল এই পথে বেরিয়েছে, তাদের নেতা আবার চীনা, এটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়?"

আমি কিছু বলবার আগেই মামাবাবু আবার বললেন— "এটাকে নিছক ঘটনার মিল বলে উড়িয়ে দিতেও আমি পারতাম, যদি না মিচিনার কয়েকটা ব্যাপার এই সঙ্গে আমার মনে পড়ত।"

অবাক হয়ে বললাম— "মিচিনায় আবার কি হয়েছিল? কই, আমি ত জানিনা!"

মামাবাবু বললেন— "তোকে তখন সেকথা বলিনি। ব্যাপারটা তুচ্ছ মনে করে বলবার প্রয়োজনও বোধ করিনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়। মিচিনাতে আমাদের যাত্রা করবার দিন ছয়েক আগে একজন অচেনা চীনেম্যান আমায় অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে। সেদিন সার্ভে অফিস থেকে সন্ধ্যেবেলা কয়েকটা ম্যাপ নিয়ে বেরুচ্ছি, হঠাৎ গেটের কাছে লোকটা আমায় টুপি তুলে নমস্কার করলে। সাজ-পোশাক তার নিখুঁত সাহেবী, মুখ না দেখলে চীনেম্যান বলে চেনবার জো নেই। লোকটাকে কখনো দেখেছি বলে মনে হল না, তাই শুধু প্রতিনমস্কার করেই চলে আসছিলাম। হঠাৎ লোকটা আমার নাম ধরে ডেকে বললে— মিঃ রায়, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। আপনি ত বাড়ি যাচ্ছেন, এটুকু পথ আপনার সঙ্গে যেতে পারি কি?

pathagar.net

একটু অস্বস্তি হলেও আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলাম, কিন্তু লোকটার প্রথম কথায় একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। সে বললে, মিঃ রায়, আপনার অভিযানের সার্থকতা কামনা করি।

গোপনে মিচিনার কয়েকজন বড় সরকারী কর্মচারীকে ছাড়া আমার অভিযানের কথা কাউকে বলিনি। এ লোকটা সে কথা জানল কেমন করে বুঝতে না পেরে আমি তাকে উল্টে প্রশ্ন করলাম— আমি কোন অভিযানে সে যাচ্ছি একথা আপনাকে কে বললে?

চীনেম্যানের মুখ দেখেও মনের ভাব বোঝবার যো নেই। তবু মনে হল লোকটা যেন প্রথমটা একটু ভড়কে গেল। তারপরেই সামলে নিয়ে কথাটা ঘুরিয়ে বললে— আপনি কি কথাটা গোপন রাখবার জন্যে ব্যস্ত?

বললাম—না, তা নয়, তবে কথাটা কেউ জানে না।

চীনেম্যান বললে—ভালো খবর এমন ছড়িয়ে যায় একটু-আধটু। আপনার তাতে দুঃখিত হবারই বা কি আছে! এমন কিছু কাজ ত করছেন না, যা লুকিয়ে রাখা দরকার।

আমিই এবার একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম— না, না, তা নয়, আমি শুধু একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম প্রথমটা।

এইবার লোকটার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই করলাম। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। জোঁকের মত আমার সঙ্গে লেগে থেকে সে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। আমার এ অভিযানের লক্ষ্য কোন্ জায়গা। কেন আমি হঠাৎ এখন কীট-সন্ধানে চলেছি। খনিজ সম্বন্ধেই আমার উৎসাহ হবার কথা, পোকামাকড় নিয়ে আমি আবার মাথা ঘামাচ্ছি কেন? কতজন লোক আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে ইত্যাদি।

একজন চীনেম্যানের এ বিষয়ে এত কৌতূহল একটু অস্বাভাবিক ঠেকলেও তখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি। সত্যিই আমাদের অভিযানের গোপন করবার ত কিছু নেই। যদি কেউ সে সম্বন্ধে জানতে চায় ত জানুক না। লোকটা বাড়ীর কাছাকাছি এসে বিদায় নেবার পর আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কথা ভুলে গেছলাম। লোকটার সঙ্গে তারপর আর দেখাও হয়নি।

কিন্তু তারপর আর একটা ব্যাপার ঘটে যার সঙ্গে চীনেম্যানের সংস্রব তখন অনুমান করতে না পারলেও এখন পারছি। আমাদের যাত্রা শুরু করবার দুদিন আগে একটা উড়ো চিঠি আমার নামে আসে। চিঠিটা ইংরেজিতে টাইপ করা; কোনো নাম নেই, কোনো সম্ভাষণ নেই, শুধু একধারে নীল কালিতে একটা ছবি আঁকা। ছবিটা একটু অসাধারণ বলেই এখনো মনে আছে—একটা বাদুড়ের দেহে একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ বসান। চিঠিটাতে একরকম ভয় দেখিয়েই আমায় এ অভিযানে যেতে বারণ করা হয়েছিল। তাতে আরো লেখা ছিল যে, আমি যদি নেহাতই এ অভিযানে যেতে চাই তাহলে অন্তত আর এক বছর অপেক্ষা করে যেন যাই।

সত্যি কথা বলতে কি, এ চিঠিটা আমি আমার কোনো বন্ধুর পরিহাস বলেই তখন উড়িয়ে দিয়েছিলাম। দু-একজন বন্ধু আমার এরকম বিপদসঙ্কুল দেশে এ বয়সে যাওয়ার

pathagar.net

বিপক্ষে ছিলেন। ভেবেছিলাম তাঁরাই হয়ত এ চিঠি দিয়েছেন। মেয়ে-মুখো বাদুড়ের ছবিটাতে ত আমার মজাই লেগেছিল।"

আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে মামাবাবুর কথা শুনছিলাম। মামাবাবু এবার চুপ করতে জিজ্ঞাসা করলাম— "কিন্তু এসব ব্যাপারের অর্থ আপনার কি মনে হয়? এ রকম চিঠি দেওয়া, এ রকম প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য কি? কারা এসব করছে?"

"সেইটে বুঝতে পারছিনা বলেই ত আরো অদ্ভুত লাগছে। আমরা নিরীহ সাধারণ লোক, চলেছি সামান্য পোকা-মাকড়ের খোঁজে। খাঁটি বৈজ্ঞানিকদের ছাড়া আর কারু আমাদের ব্যাপারে নজর দেবার কথা নয়। আমাদের বিরুদ্ধে এ রকম ষড়যন্ত্র করে আমাদের বাধা দেওয়ায় কার কি স্বার্থ থাকতে পারে, কিছুই ত ভেবে পাচ্ছি না। তাছাড়া ঠিক আমরা যে সময়ে যে পথে বেরিয়েছি, সেই সময়ে সেই পথে আরেকটা চীনে দলের যাতায়াত অত্যন্ত রহস্যজনক!..."

মামাবাবু আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল।

পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যে আমরা এতক্ষণ খুব ধীরে ধীরে ঘোড়া চালাচ্ছিলাম।

ঘন জঙ্গলের সঙ্কীর্ণ পথে আমাদের অশ্বতরবাহিনী যে একেবারে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেছে তা এতক্ষণ লক্ষ করিনি। হঠাৎ সামনের দিকে জঙ্গলের ভেতর বাঘের গর্জন ও মানুষের আর্তনাদ শুনে শিউরে উঠলাম।

এখানে জঙ্গল এমন ঘন ও ওপরের দিকে লতায় পাতায় এমন আচ্ছন্ন যে দিনের বেলাই সব আবছা দেখায়। সেই অস্পষ্ট আলোয় সঙ্কীর্ণ পথে ঘোড়া যতদূর সম্ভব জোরে চালিয়েও আমাদের ঘটনার স্থানে পৌঁছাতে বেশ দেরী হয়ে গেল। লি-সিন দেখলাম আমাদের আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছে। অন্যান্য চীনারাও চারধারে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে।

আমরা যেতে ভীড় সরে গেল। এইবার দেখতে পেলাম সঙ্কীর্ণ পথের ধারে একটা ঝোপের পাশে নরম কাদা ও রক্তে মাখামাখি হয়ে আমাদের একজন চীনা চালকের দেহ পড়ে রয়েছে।

লোকটার মুখে কান থেকে নাক পর্যন্ত দগদগে একটা ক্ষত, তা থেকে প্রচুর রক্ত পড়ছে। তার গায়েও নানা জায়গায় আঁচড়ের দাগ। তখনও লোকটা একেবারে মারা যায়নি। লি-সিন তাকে একটু কাত করে তুলে ধরে তার মুখে জল দিচ্ছিল। আমরা নীচু হয়ে তার কাছে বসতেই আমাদের দিকে ব্যাকুলভাবে চেয়ে সে যেন কি একটা কথা বলবার চেষ্টা করল। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। কিন্তু জীবনীশক্তি তার তখন ফুরিয়ে গেছে। অস্পষ্টভাবে একটা শব্দ উচ্চারণ করেই সে একেবারে নেতিয়ে পড়ল।

মামাবাবুর প্রশ্নে এবার লি-সিন সমস্ত ব্যাপার খুলে বললে। আমাদের মত সেও বাঘের গর্জন আর মানুষের আর্তনাদ শুনে পেছনে ফিরে আসে। এসে এই ব্যাপার দেখতে পায়। এখানে পথ সঙ্কীর্ণ বলে অশ্বতর-চালকেরা একটু ছাড়াছাড়িভাবে যাচ্ছিল। যে লোকটি মারা গেছে সে একটু একলা পড়ে গেছল বোধ হয়। কারণ বাঘের গর্জন ও তার আর্তনাদ

pathagar.net

শুনলেও এই লোকটির পেছনের ও সামনের কোনও চালক বাঘ দেখতে পায়নি। চক্ষের নিমেষে সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেছে। কাছের লোকেরা এসে শুধু লোকটিকে এই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পায়।

মামাবাবু লি-সিনের কথা শুনতে শুনতে নীচের দিকে চেয়ে কি যেন দেখছিলেন। নীচের নরম মাটিতে বাঘের পায়ের দাগ আমি আগেই দেখতে পেয়েছিলাম। বললাম— "ও আমি আগেই দেখেছি! বাঘের পায়ের ত স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে।"

মামাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন— "স্পষ্টই ত দেখছি!" তারপর তিনি যা করে বসলেন তাতে ত আমরা সবাই অবাক। হঠাৎ দেখি মাটির ওপর নীচু হয়ে, পকেট থেকে একটা মাপবার ফিতে বার করে তিনি বাঘের দুটো পায়ের দাগের মধ্যের ব্যবধানটা মাপছেন।

দু-তিনটি দাগের তফাত মেপে দেখে মামাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে লি-সিনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাদের অশ্বতরগুলি সব ঠিক আছে কি না।

লি-সিন বললেন—"না, যেটিকে এই লোকটি চালাচ্ছিল, বাঘের ভয়েই বোধহয় সে বনের ভেতর পালিয়েছে। তার আর কোনো পাত্তা নেই।"

মামাবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—"আমিও তাই ভেবেছিলাম। যাই হোক, আমাদের দেরী করবার সময় নেই, এই লোকটির মৃতদেহ তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি এ জঙ্গল পার হবার ব্যবস্থা কর।"

লি-সিন এ কথায় যেন অবাক হয়ে গেল একটু। একটু ইতস্ততঃ করে সে জানালে যে, এই ঘন জঙ্গলে পলাতক অশ্বতরটি এখনো বেশীদূর যেতে পারেনি। এখনো একটু খোঁজ করলে তাকে পেতে পারি। যদি নেহাত সে বাঘের হাতেই পড়ে থাকে তাহলেও আমাদের দামী জিনিসপত্রগুলো উদ্ধার হবে।

লি-সিনের কথা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলেই আমার মনে হল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মামাবাবুর মত বদলাল না। তিনি শুধু বললেন— "না, সে হবার নয়, তোমরা এগিয়ে চল।"

আমি এবার বাধা না দিয়ে পারলাম না। বললাম—"আপনি করছেন কি মামাবাবু? সামান্য একটু খোঁজ করলে জিনিষগুলো যদি পাওয়া যায় তা হলে সে চেষ্টা আমাদের করা উচিত নয় কি? জঙ্গলের ভেতর বেশীদূর সে কখনো নিশ্চয়ই যায়নি।"

মামাবাবু অদ্ভুতভাবে এবার হেসে বললেন— "তা হয়ত যায়নি। কিন্তু জিনিষগুলো পাবার আশা আর নেই।"

"কেন নেই?"

মামাবাবু তাঁর পকেট থেকে একটা নোটবুক বার করে আমায় দেখিয়ে বললেন— "যে চীনে সর্দার মারা গেল তার জিম্মায় আমাদের কি ছিল দেখছিস—আমার সার্ভে করবার নানারকম যন্ত্রপাতির বাক্স। পোকা শিকারে বেরিয়েও কাজে লাগতে পারে ভেবে এগুলো সঙ্গে নিয়েছিলাম। এ যন্ত্রপাতি ফিরে পাবার নয়।"

একটু বিরক্ত হয়েই এবার বললাম— "আপনার হেঁয়ালি আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

মামাবাবু তাঁর ঘোড়ায় চেপে বললেন— "চ', যেতে যেতে সব কথা বলছি। এখন দেরী করবার সময় নেই।"

pathagar.net

ঘোড়ায় চেপে খানিকদূর এগিয়ে যাবার পর মামাবাবু বললেন—"আমাদের দলের মধ্যে বাঘের উপদ্রবটা একটু অদ্ভুত ধরনের নয় কি?"

"কেন?"

"একবার বাঘের উপদ্রবের সঙ্গে গেল কম্পাস চুরি, আর একবার বাঘ এসে এমন লোককে আক্রমণ করলে যার জিম্মায় দামী জরীপের যন্ত্রপাতি!"

আমি এবার বিমূঢ়ভাবে বললাম— "এর মানে আপনি কি বলতে চান?"

"এর খানিকটা মানে বাঘের পায়ের দাগ যেখানে পড়েছে সেখানটা ভালো করে লক্ষ করলে তুই নিজেই বুঝতে পারতিস। লক্ষ করেছিস কিছু?"

আমি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে এবার বললাম— "বাঃ, বাঘের পায়ের দাগ আমিই ত আগে দেখেছি!"

মামাবাবু আমায় যেন ধমক দিয়েই এবার বললেন—"কিচ্ছু দেখিসনি! দেখলে বুঝতে পারতিস, ও বাঘের পায়ের দাগ নয়। হতে পারে না।"

"বাঘের পায়ের দাগ নয়!"—আমি হতভম্ব হয়ে এবার উচ্চারণ করলাম।

"না, নয়। বাঘেরা নেহাত হালকা জানোয়ার নয়। অত বড় যে বাঘের থাবা, তার ওজন কম পক্ষেও কত হয় জানিস? অন্তত ছ'মণ। ছ'মণ বাঘের পায়ের দাগ নরম কাদাতে আরো ঢের গভীরভাবে পড়ত। তাছাড়া বাঘ কি কখনো দু-পায়ে হাঁটে?"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"দু-পায়ে হাঁটার খবর কোথায় পেলেন?"

"পেলাম মেপে। বাঘের মত চার পেয়ে জানোয়ারের আগুপিছু পায়ের দাগের মধ্যে ব্যবধান আর দু-পায়ে যে হাঁটে তার দাগের ব্যবধান আলাদা!"

"তবে কি—"

মামাবাবু গম্ভীরভাবে আমার কথার মাঝখানেই বললেন—"হ্যাঁ, আমাদের তাঁবুতে ঢুকে যে কম্পাস চুরি করেছে, ও আজ আমাদের চীনে সর্দারকে যে মেরেছে, সে, আর যে রকম প্রাণীই হোক, বাঘ নয়—তার পা মাত্র দুটি।"

মামাবাবুকে আরো একটু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় পেছনে পায়ের দ্রুত শব্দ পেলাম। ফিরে দেখি, লি-সিন দ্রুতবেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে আমরা ঘোড়া রুখলাম। লি-সিন হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের কাছে এসে পৌঁছাতেই মামাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি লি-সিন?"

লি-সিন ডান হাতটা এবার উঁচু করে ধরলে। হাতে তার খেলনার ছোরার মত একটি অস্ত্র, কিন্তু সে অস্ত্রের ধারাল ফলাটা জমাট রক্তে তখন লাল। সেই ছোরাটি তুলে ধরে উত্তেজিতভাবে লি-সিন যা বললে তার মর্ম এই যে, চীনে চালকদের মৃতদেহটা বয়ে আনবার জন্যে তোলার সময় তারা তার পিঠে এই অস্ত্রটি বিদ্ধ দেখতে পায়। বাঘের হাতে যে মরেছে তার পিঠে এরকম অস্ত্র বিদ্ধ থাকার কোনো মানে বুঝতে না পেরে ভয় পেয়ে লি-সিন মামাবাবুকে এটি দেখাতে এনেছে।

মামাবাবু সাবধানে লি-সিনের হাত থেকে ক্ষুদে ছোরাটি তুলে নিয়ে বললেন— "যাক, এবার চরম প্রমাণ পাওয়া গেল। দেখছিস!"

pathagar.net

কিন্তু তখন অন্য কোনও দিকে দেখবার আমার ক্ষমতা নেই। ছুরি সমেত ডান হাতটা উঁচু করে ধরার সঙ্গে সঙ্গে লি-সিনের জামার ঢোলা হাতটা নীচে খসে গেছল। তার সেই অনাবৃত হাতের দিকে চেয়ে আমি তখন আবিষ্টের মত চোখ আর ফেরাতে পারছি না।

আমার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে হঠাৎ চমকে লি-সিন তাড়াতাড়ি হাতটা নামিয়ে ফেললে, কিন্তু তখন আমার দেখতে কিছু বাকি নেই।

লি-সিনের ডান হাতের ওপরে নীল একটি অদ্ভুত উল্কি আঁকা—উল্কির ছবিটা মেয়ের মুখ বসান একটা বাদুড়ের।

লি-সিন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি দলের সকলের কাছে ফিরে গেল। আমি খানিকক্ষণ ধরে কি করা উচিত কিছুই বুঝতে পারলাম না। মামাবাবু তখন ছোরাটি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে বলছেন— "ছোরাটা সাধারণ বর্মি ছোরা নয়—এরকম বাঁটের কারুকাজ বর্মার কোথাও হয় না বলেই আমি জানি।"

আমার কিন্তু মামাবাবুর কথায় বিশেষ কান ছিল না। লি-সিনের হাতে যা দেখেছি তার কথা মামাবাবুকে বলব কি না তাই ঠিক করতেই আমি তখন পারছি না। শেষ পর্যন্ত আমার মনে হল, কথা আপাতত গোপন করে যাওয়াই ভালো। মামাবাবুর লি-সিনের ওপর অগাধ বিশ্বাস। লি-সিন সম্বন্ধে আমার সন্দেহ যে অমূলক নয় তার যথেষ্ট প্রমাণ যতদিন সংগ্রহ করতে না পারছি ততদিন কোনো কথা তাঁকে জানাব না। ইতিমধ্যে লি-সিনের ওপর নজর রেখে আমার নিজের অনুসন্ধান নিজেকেই চালাতে হবে।

মামাবাবু ছোরাটা আমার হাতে দিয়ে বললেন— "এ রকম জিনিষ কোথাও দেখেছিস?"

বললাম— "না, কিন্তু চরম প্রমাণ একে বলছেন কেন?"

তিনি একটু হাসলেন। তারপর ছোরাটা আবার আমার হাত থেকে নিয়ে বললেন—"এ কথাও বুঝিয়ে দিতে হবে?"

আমি একটু অভিমান করে বললাম—"আমার বুদ্ধি তেমন ধারাল নয় ত।"

মামাবাবু কৌতুকের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন,— "না রে, সেকথা বলছি না, কিন্তু এই ছোরা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের চীনে চালক বাঘের আক্রমণে মারা যায়নি, মারা গেছে ছোরার আঘাতে। আর ছোরা কোনো জানোয়ার চালায়!"

আমি বললাম—"কিছু মনে করবেন না, আমার বুদ্ধি কম বলেই অন্য নানা কথা আমার মনে হচ্ছে।"

"কি মনে হচ্ছে আবার?" মামাবাবু একটু সহিষ্ণুভাবেই বললেন।

"ছোরাটা যে একমাত্র মানুষই চালাতে পারে, সেটুকু বুঝতে পারছি, কিন্তু ছোরাটা যদি সত্যি ব্যবহার হয়ে থাকে, তা হলে কখন হয়েছে এবং কার দ্বারা হয়েছে তার কিছু হদিস্ কি পাওয়া যাচ্ছে এটা থেকে?"

মামাবাবু অবাক হয়ে বললেন— "তার মানে?"

বললাম—"তার মানে কি বুঝিয়ে দিতে হবে?" বলবার পর দুজনেই হেসে ফেললাম।

মামাবাবু এবার বললেন— "তা হলে তুই কি বলতে চাস?"

pathagar.net

"বেশী কিছু নয়, শুধু এই যে, ছোরাটা হয়ত প্রথম আক্রমণের পরেও ব্যবহার হতে পারে কিংবা আসল হত্যাকারীর এটা একটা চাল, আমাদের সন্দেহকে ঘুলিয়ে দিয়ে ভুল পথে চালাবার জন্যে।"

আমার দিকে খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থেকে মামাবাবু বললেন—"আমার তা মনে হয় না।"

কিন্তু আমার তাই মনে হয়। তবু আমার সন্দেহের সব কথা মামাবাবুর কাছে প্রকাশ করবার সময় হয়নি বলে আমি তখনকার মত চুপ করে গেলাম।

সেদিন সত্যই সন্ধ্যার আগে আমরা জঙ্গল পার হতে পারলাম না। অন্ধকার নেমে এল তার আগেই। ঘন জঙ্গলের ভেতর তাঁবু ফেলা অসম্ভব ব্যাপার। কোনো রকমে গাছ লতা পাতা কেটে আমাদের তাঁবুটুকু ফেলবার ব্যবস্থা হল। আর সকলকেই আগুন জ্বালিয়ে বাইরে রাত কাটাবার বন্দোবস্ত করতে হল। লি-সিন আর তার দল আজকে আমাদের তাঁবুর কাছাকাছিই রইল। এদের কষ্টসহিষ্ণুতা দেখে সত্যি অবাক হতে হয়। তাদের সঙ্গীর মৃতদেহের সৎকার করে জঙ্গলের ভ্যাপসা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে তারা কোনো রকম আগুন-টাগুন না জ্বালিয়েই শুধু কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। জঙ্গলের হিংস্র শ্বাপদ সম্বন্ধেও তাদের ভয়-ডর যেন নেই।

পথে বেরিয়ে এ ক'দিন কোনো বিশেষ অস্বস্তি ভোগ করিনি। কষ্ট বা অসুবিধাতে খুব কাতর হওয়া আমার স্বভাব নয়। কিন্তু আজ এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভেতর তাঁবুর মাঝেও কেমন যে অসোয়াস্তি অনুভব করছিলাম। এ ধরনের অরণ্য-বাসের অভিজ্ঞতা আমার নেই। অরণ্য সম্বন্ধে আমার সাধারণ যে কল্পনা ছিল তার সঙ্গে কিছুই এর মেলে না। বিছানা পাততে গিয়ে প্রথমেই ত গোটা দুই বড় বড় কাঁকড়া বিছে তাঁবুর ভেতর আবিষ্কার করে মনটা খিচড়ে গেল। আলো জ্বেলেও বেশীক্ষণ বসতে পারলাম না। জঙ্গলের অসংখ্য বিদঘুটে চেহারার পোকা সে আলোর নিমন্ত্রণে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান করলে। এমন আলো তাদের চতুর্দশ পুরুষের জীবনে তারা নিশ্চয় দেখেনি। সেই পোকামাকড়ের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আলো নিভিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন হিংস্র বন্যার মতো এসে চারদিক থেকে আমাদের চেপে ধরল। সে অন্ধকার নয়, যেন শক্ত কালো পাথরের দেওয়াল। আমাদের পিষে ফেলবার জন্যে উদগ্রীব। হাত দিলেই সে অন্ধকাব যেন ছোঁয়া যাবে মনে হয়। তারপর জঙ্গলের অদ্ভুত শব্দময় নিস্তব্ধতা। আগাগোড়া একটা হট্টগোলের ভেতর থাকা যায়, কিন্তু এই যে জঙ্গলের পরিপূর্ণ নিঃস্তব্ধতা থেকে থেকে অজানা কোনো জানোয়ারের আর্তনাদে বা কোনো নিশাচর শ্বাপদের আস্ফালনের শব্দে হঠাৎ যেন কাঁচের বড় আয়নার মত ঝন ঝন করে ভেঙে যাচ্ছে, মনের সঙ্গে সমস্ত দেহের স্নায়ুও এতে অবশ হয়ে যায়। এ জঙ্গল কল্পনার জিনিষ নয়, এ একেবারে মানুষের জীবন্ত শত্রু। বিশাল গাছগুলো যেন স্থাণু নয়, বিরাটকায় দৈত্যদের বাহিনীর মত তারা যেন মানুষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে; সারি সারি কাঁটার ঝোপে, অসংখ্য তার ফাঁদ পাতা, অগণন তার অস্ত্র আর উপকরণ।

pathagar.net

মামাবাবুর কিন্তু কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই। মিচিনার পাকা বাড়িতেই যেন শুয়েছেন এমনিভাবে তিনি বিছানায় পড়েই নাক ডাকাতে শুরু করলেন। আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। কেবলই মনে হতে লাগল, বিছানার ভেতর কোথায় যেন কাঁকড়া বিছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন বাইরে কোনো জানোয়ারের নিঃশব্দ সঞ্চরণ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল দূরে যেন কোনো মানুষই আর্তনাদ করে উঠল, তাঁবুর দরজার পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে মঙপো আর আমাদের কাচীন চাকর যেখানে আগুন জ্বালিয়ে শুয়েছিল সেখানে একবার চেয়ে দেখলাম। কোথাও কিছু গোলমাল নেই, গনগনে না হলেও তাদের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। তারা বেশ সুখে আছে বলে অবশ্য মনে হল না। আগুনের রক্তাভ আলোয় মনে হল তাদের কম্বল প্রায়ই নড়ছে।

এ আলো দেখে কিন্তু বিশেষ ভরসা পেলাম না! বিছানাটা অন্ধকারেই একবার ঝেড়ে নিয়ে আবার এসে অবশ্য শুয়ে পড়তে হল। খানিক বাদে অনেক কষ্টে একটু তন্দ্রাও এল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম বলতে পারি না। হঠাৎ আচমকা কি রকম একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্ন দেখছিলাম কি না বলতে পারি না, কিন্তু মনে হল কে যেন এইমাত্র তাঁবুর দরজার পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেল। স্পষ্ট যেন শুনলাম তাঁবুর পর্দা নড়ার আওয়াজ। তাড়াতাড়ি উঠে পর্দার কাছে গেলাম। সেটা তখনো নড়ছে। কিন্তু হাওয়ায় হওয়াও সম্ভব। বাইরে সত্যিই বেশ জোরে কনকনে হাওয়া দিয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে কি করব ভাবছি এমন সময় কাছেই পায়ের আওয়াজ শুনলাম। পর্দার ভেতর দিয়ে শুধু মুখটুকু বাড়িয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে রইলাম। মঙপোদের আগুন প্রায় নিভে এসেছে, তারা ঘুমে অচেতন। কে আর আগুনে মশলা জোগাবে। কিন্তু সেই নিভু-নিভু আলোতেই আমার কাজ হয়ে গেল। যার পায়ের শব্দ শুনেছিলাম সে সেই আগুনের পাশ দিয়েই কোথাও দ্রুত বেগে চলেছে দেখা গেল। আর সমস্ত অন্ধকার হলেও শুধু তার পায়ের বিশেষ ধরনের জুতো দেখেই আমি তাকে চিনলাম। লি-সিন ছাড়া এ ধরনের জুতো আমাদের দলের কারুর নেই।

এই নিশুতি রাত্রে এমন সময় লি-সিন চলেছে কোথায়?

তাঁবুতে আমরা সাজ-পোশাক সমেত যে শুয়েছিলাম একথা বলাই বাহুল্য। কোমরবন্ধে পিস্তলও ছিল, শুধু বিছানা থেকে টর্চ-টা তুলে নিয়ে আমি আর দ্বিধামাত্র না করে তাকে অনুসরণ করলাম।

অনুসরণ করা বেশ কঠিন। একে দারুণ অন্ধকার তায় জঙ্গলের পথ, প্রত্যেক পদে নানান লতা-পাতার বাধা। নীচের শুকনো পাতা মড় মড় করে উঠলেই মনে হয় বুঝি সব জানাজানি হয়ে গেল। কিন্তু সে ভয় যে অমূলক অল্পক্ষণেই তা বুঝতে পারলাম। যাকে অনুসরণ করছি তার কাছেও নিজের পায়ের শব্দে ও জঞ্জালের খসখসানিতেই অন্য শব্দ ঢাকা পড়ে যাবে। শুধু বেশী এগিয়ে বা পিছিয়ে পড়লে চলবে না। অন্ধকারে লোকটাকে হারিয়ে ফেলা অত্যন্ত সহজ।

এভাবে অনুসরণ করার বিপদ যে কতখানি তা যে না বুঝিনি তা নয়। সাপখোপ ও হিংস্র শ্বাপদের ভয় ত আছেই, তা ছাড়া শত্রুর কবলে পড়ার সম্ভাবনাও কম নয়। লি-সিন কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে কিছুই জানি না। সেখানে গিয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার করার

pathagar.net

বদলে হয়ত নিজেই আবিষ্কৃত হয়ে বিপন্ন হতে পারি, কিন্তু তবু এ অনুসরণ ত্যাগ করতে পারলাম না। মনে হল বিপদ যতই থাক, আমাদের চারধারে যে রহস্য ঘিরে রয়েছে তার মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাবার এমন সুযোগ আর মিলবে না।

কোথা দিয়ে কোন দিকে যে যাচ্ছিলাম কিছুই জানি না। যাকে অনুসরণ করছি সেই আমার একমাত্র পথ-প্রদর্শক। ফিরে আসব কি করে, যদি সে ভাগ্য হয়, তাও তখন খেয়াল নেই। শুধু এক লক্ষ্য নিয়ে চলেছিলাম।

কিন্তু তাতেও বাধা পড়ল। অনেকক্ষণ বনের ভেতর দিয়ে কাঁটা গাছের ডালের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতে যেতে সহসা এক জায়গায় আমাদের দুজনের মাঝখান দিয়ে কি একটা বিশাল জানোয়ার সশব্দে জঙ্গল ভেঙে ছুটে বেরিয়ে গেল। চমকে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। তারপরে এগুতে গিয়ে দেখি, লি-সিনকে হারিয়ে ফেলেছি। সে এর মধ্যে কোন দিকে গেছে কিছুই বুঝতে পারলাম না। একটুখানি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তার পায়ের শব্দ শোনবার চেষ্টা করলাম। মনে হল যেন দূরে পায়ের চাপে পাতা গুঁড়িয়ে যাবার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তাকে অনুসরণ করা শক্ত। নিজের পায়ের আওয়াজে সব শব্দ ঢেকে যায়।

এবার আমি সত্যি ভয় পেলাম। অনুসরণ ব্যর্থ ত হলই, তা ছাড়া আমার ফেরবার পথও যে বন্ধ। সকাল হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও আমি কি পথ খুঁজে ফিরে যেতে পারব? মামাবাবু তাঁর লোকজন নিয়েই কি আমায় খুঁজে পাবেন? জঙ্গলে এইভাবে পথ হারিয়ে কত লাক এমনিভাবে মারা পড়েছে, আমি শুনেছি। জঙ্গলের যাদু এমনি যে, সেখানে পথ হারিয়ে বেরুবার চেষ্টা করলে মানুষ কেবল ঘুরে ঘুরে যেখান থেকে যাত্রা করেছিল সেখানেই ফিরে আসে এবং শেষে একেবারে ক্লান্ত হয়ে মারা যায়।

কিন্তু না, এসব কথা ভাবলে চলবে না, আমায় যেমন করে হোক বেরুতেই হবে। আর একবার কান পেতে আমি পায়ের শব্দ শোনবার চেষ্টা করলাম এবং একটুখানি আভাস পাওয়ামাত্র আর ধরা পড়বার ভয় ভুলে প্রাণপণে সেদিকে দৌড়ে গেলাম খানিক। সেখান থেকেও অমনিভাবে একটু থেকে পায়ের আভাস পেয়ে আবার দৌড়োতে লাগলাম সেই দিকে। দৌড়োতে দৌড়োতে একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম। যে দিকেই এসে থাকি, জঙ্গল যেন অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল। পদে পদে সে রকম বাধা আর নেই। বড় বড় গাছও অনেক দূরে দূরে।

বেশীদূর এমন করে দৌড়োতে হল না। সমস্ত জঙ্গল আচমকা কেঁপে উঠল বাঘের গর্জনে। গর্জন খুব কাছে।

কিন্তু আমি টর্চের আলোটা জ্বালাবার আগেই অন্য এক দিক থেকে আরেকটা টর্চের আলো সেখানে এসে পড়ল অন্ধকার চিরে। সে আলোয় দেখা গেল দীর্ঘকায় এক চীনেম্যান হাতে একটা শিঙার মত জিনিষ নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

টর্চের আলো পড়ার পরও সেই শিঙা মুখে তুলে সে একবার ফুঁ দিলে। বেরিয়ে এল এক ভয়ঙ্কর বাঘের গর্জন।

pathagar.net

ওদিক থেকে যে টর্চ ফেলেছিল সে লোকটা এবার এগিয়ে এল। দুজনের ওপর আলো ফেলেই আমি চমকে উঠলাম। নতুন লোকটি আর কেউ নয়— মামাবাবু।

আমার টর্চের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মামাবাবু ও সেই চীনেম্যান দুজনেই চমকে ফিরে তাকিয়েছিল। আমি এগিয়ে তাদের কাছে যাবার পর মামাবাবু একবার শুধু বিস্মিতভাবে অস্ফুটস্বরে বললেন— "তুই?" তারপরে আমাকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়ে চীনেম্যানের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন ইংরেজীতে— "কে তুমি?"

মামাবাবুর এক হাতে ছিল টর্চ, কিন্তু আরেক হাতে যে জিনিসটি ছিল তাকে ভয় না হোক, সম্মান না করা কঠিন।

কিন্তু সেই রিভলভারের নিঃশব্দ হুমকি বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে অত্যন্ত সহজভাবে দীর্ঘকায় চীনেম্যান পরিষ্কার ইংরেজীতে উত্তর দিলে— "সেই প্রশ্ন আমিও আপনাদের করতে যাচ্ছিলাম।"

মামাবাবু কঠিন স্বরে বললেন— "তামাসা রাখো, এখানে তুমি কি করছ?"

চীনেম্যান একটু হেসে বললে—"স্থান কাল বিচার করে আপনি ঠিক কথা বলছেন বলে ত মনে হচ্ছে না।"

"মিছিমিছি কথা বাড়াবার আগ্রহ আমার নেই।" মামাবাবু রূঢ়ভাবে বললেন— "তোমার পরিচয় আর এখানে উপস্থিতির কারণ আমি জানতে চাই।"

"কৌতূহল জিনিষটা শুধু আপনার একচেটিয়া মনে করছেন কেন? তাছাড়া এক রকম আমারই ঘরে বসে আমাকেই চোখ রাঙানো কি ভালো!"

"তোমারই ঘরে বসে! তার মানে?"

এবার চীনেম্যান মুখে উত্তর না দিয়ে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার টর্চটা ধরে অপর দিকে ঘুরিয়ে দিলে। নতুন দিকে আলো পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চমকে উঠলাম। এতক্ষণ অন্ধকারে এ জিনিষটি আমরা দেখতেই পাইনি।

কাছেই বনের ভেতর একটা বড় তাঁবু ফেলা রয়েছে।

বিস্ময় সামলে ওঠবার আগেই দীর্ঘকায় চীনেম্যান বললে— "অসময়ে অস্থানে হলেও এ গরীবের তাঁবুতে দয়া করে পা দিলে অতিথি-সৎকারের একটু চেষ্টা করতে পারি।"

এবার আমি শুধু নয়, মামাবাবুও বোধহয় বেশ একটু ভড়কে গিয়েছিলেন। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন আজগুবি, তাছাড়া এমন জায়গায় কোনো অজানা তাঁবু যে থাকতে পারে তা আমরা কল্পনাও করিনি। মামাবাবু একটু যেন অপ্রস্তুতভাবেই চুপ করে গিয়েছিলেন।

চীনেম্যান আবার বললে— "পরস্পরের আলাপ পরিচয় ওখানে গিয়েই ভালো করে হতে পারে। আপনারা অনেক কিছু প্রশ্ন করেছেন, আমারও হয়ত কিছু জানবার আছে!"

মামাবাবু এতক্ষণে স্থির হয়ে বললেন— "কিন্তু এ সময়ে আপনার তাঁবুর বাইরে আসবার কারণ কি? এ অদ্ভুত শিঙা বাজাবারই বা কি অর্থ?"

চীনেম্যান আবার হেসে বললে— "সেটুকু আগে না জানলে অপরিচিত তাঁবুতে হঠাৎ ঢুকতে সাহস হচ্ছে না আপনাদের, কেমন?"

pathagar.net

"জঙ্গলে এই রাত্রে যারা এতদূর আসতে পেরেছে, তাদের আর যাই হোক সাহসের অভাব আছে এ কথা বোধহয় বলা চলে না।"— আমি বললাম।

চীনেম্যান বললে— "তা বটে। তাহলে কৈফিয়তটাই দিচ্ছি— শুনুন, কিন্তু এইমাত্র এই অদ্ভুত শিঙাটি আমি কুড়িয়ে পেয়েছি বললে কি বিশ্বাস করতে পারবেন?"

"কুড়িয়ে পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ, কুড়িয়ে পেয়েছি। আপনারা ভাবছেন নিশ্চয় যে, এই অন্ধকার রাত্রে তাঁবু ছেড়ে শিঙা কুড়োতে বেরোনোটা একটু অস্বাভাবিক। আমি সত্যি সেই জন্যেই অবশ্য তাঁবু থেকে এমন সময়ে বার হইনি। বার হয়েছিলাম চোর তাড়া করতে।"

একটু চুপ করে থেকে আমাদের বিস্ময়টাকে বেশ যেন মজা করে উপভোগ করে চীনেম্যান আবার বললে—"শুনলে অবাক হবেন যে, এই জঙ্গলের মাঝেও আমার তাঁবুতে খানিক আগে চোর ঢুকেছিল। আমি জেগে থাকায় সুবিধে করতে পারেনি অবশ্য। তাকে তাড়া করতে বেরিয়েই এটি পেয়েছি। লোকটা কোনো কিছু অস্ত্রের অভাবেই বোধহয় এটা দিয়ে মেরে আমার জখম করতে চেয়েছিল। যাই হোক, চোর ধরতে না পেরে তার জিনিষটার গুণ পরীক্ষা করছি, এমন সময় আপনারা দেখা দিলেন আশ্চর্যভাবে।"

মামাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—"আপনি এ রকম শিঙার আওয়াজ আগে কখনো শুনেছেন?"

চীনেম্যান একটু থেমে অবাক হয়ে বললে— "আশ্চর্যের বিষয়, আপনি জিজ্ঞাসা করাতেই এখন মনে পড়ছে যে শুনেছি শুধু নয়, এ রকম আওয়াজে এই ক'দিন ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু এটা যে সামান্য শিঙার আওয়াজ হতে পারে তা কখনো ভাবিনি। যাই হোক, অনেক কিছু রহস্য আমাদের মীমাংসা করবার আছে মনে হচ্ছে। অনুগ্রহ করে তাঁবুতে যদি আসেন তাহলে ভালো করে একটু আলাপ করতে পারি।"

মামাবাবু কি ভেবে এবার বললেন— "চলুন।"

তার তাঁবুতে গিয়ে খানিকক্ষণ পরস্পরের পরিচয় দেওয়া-নেওয়ার পর অনেক নতুন কথা জানতে পারলেও কোনো রহস্যই সরল হল না। এই চীনেম্যান সম্বন্ধে আমরা আগেই যা অনুমান করেছিলাম, তার অধিকাংশ সত্য বলে জানা গেল। কিছুদিন আগে সেই যে বিস্তর দলবল নিয়ে মিচিনা থেকে বেরিয়েছিল একথা সে নিজে থেকেই জানালে। এ পথে তার যাত্রা করবার কারণও পাওয়া গেল। সে চীনের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ ইউনানের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তার নাম লাওচেন। সেখানে সে নাকি বিশেষ বিখ্যাত। বৎসর খানেক আগে বিশেষ কোনো কারণে সেখানকার শাসনকর্তার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। এখন আবার গোপনে এই পথে সে দেশে ঢুকতে চেষ্টা করছে।

দুঃখের বিষয়, যে রহস্যের কিনারা আমরা করতে চাইছিলাম তার সঙ্গে এ সমস্ত খবরের কিন্তু কোনো সংস্রবই নেই। বরং না জেনে এই চীনাদের সঙ্গে আমাদের গত কয়েকদিনের ঘটনার যে যোগ আছে বলে আমরা কল্পনা করেছিলাম—এ সমস্ত খবর শুনে সে বিষয়ে সন্দেহই উপস্থিত হল। তার কথায় জানলাম, জঙ্গলের পথে তাদের দলের ওপরও বাঘের বহু উপদ্রব হয়েছে।

pathagar.net

লাওচেনের কাছে সবচেয়ে বিস্ময়ের খবর কিন্তু পাওয়া গেল শেষে। তার ওপর যেটুকু অবিশ্বাস ছিল এই খবরের পর সেটুকুও দূর হয়ে তার জন্যে রীতিমত দুঃখই হল। তার তাঁবুতে যখন ঢুকেছিলাম তখন অন্ধকারে বাইরের বেশী কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন বেরুলাম তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে।

লাওচেন আমাদের এগিয়ে দেবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। আমরা যে সামান্য পোকা-মাকড়ের খোঁজে এই বিপদসঙ্কুল দেশে এসেছি একথা তাকে তখনো ভালো করে বিশ্বাস করাতে পারা যায়নি। সে তখনো বিস্মিতভাবে সেই সম্বন্ধেই নানা কথা জিজ্ঞাসা করছিল।

হঠাৎ মামাবাবু বললেন— "আশ্চর্য! আর সব লোকজন আপনার কোথায়? আপনার ত মস্ত বড় দল। তাদের কাউকে ত দেখছি না।"

লাওচেন খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ কাতরভাবে বললে— "আপনাদের এ কথাটা জানাতে চাইনি। এবারে আমার দেশে যাওয়া আর হল না।"

"কেন বলুন ত?"

"আমার অধিকাংশ লোকজন এই গতকালই আমায় ছেড়ে চলে গেছে। কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর ছাড়া আর কেউ আমার সঙ্গে নেই। কাল রাত্রে আমার তাঁবুতে চোর আসতে সাহসও বোধহয় করেছিল তাই।"

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— "হঠাৎ এ রকম ছেড়ে যাওয়ার কারণ?"

"কারণ যে কি তা ঠিক আমিও বুঝতে পারছি না। তবে তারা যে বিশেষ কিছুর ভয় পেয়ে সরে গেছে এটা ঠিক। তাদের ইউনান পর্যন্ত যাবার কথা, কিন্তু এই পর্যন্ত এসে আর তারা কিছুতে এগুতে রাজী হল না। মাইনে বখ্‌শিশ সব কিছুর লোভ দেখিয়েও তাদের রাখতে পারলাম না। আপনারা সাবধান থাকবেন, শেষ পর্যন্ত আপনাদের দলে না এমনি কিছু হয়।"

"এখনো পর্যন্ত তা হয়নি। কিন্তু ভয়টা কিসের মনে করেন?"

লাওচেন বললে— "শুধু বাঘের উপদ্রব নয়। উত্তরের জঙ্গলে দারুরা ক্ষেপে গিয়ে বিষের তীর ছুঁড়ে সকলকে মেরে ফেলছে এমনি এক গুজবই নাকি রটেছে।" তার কথার ধরনে কিন্তু মনে হল যে, এই গুজবই সব নয়। এছাড়া বিশেষ কোনো একটা কথা সে চেপে গেল।

লাওচেনের কাছে বিদায় নিয়ে জঙ্গলের পথে নিজেদের তাঁবুর দিকে যেতে যেতে মামাবাবুর সঙ্গে প্রথম ভালো করে সব কথা আলোচনা করবার সময় পেলাম। প্রথমে মামবাবু প্রশ্নের উত্তরে কিজন্যে কিভাবে আমি এই অন্ধকার রাত্রে জঙ্গলের মাঝে বেরিয়ে পড়েছিলাম তার কাহিনী বলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম— "কিন্তু আপনি কি করে এলেন এখানে?"

pathagar.net

মামাবাবু বললেন— "আমাদের তাঁবু থেকে যে লোকটা রাত্রে বেরিয়ে যাওয়ায় তোর ঘুম ভেঙে গেছল, সে লোকটা কে বল দেখি?"

"বুঝতে পারছি না।"

মামাবাবু এবার হেসে বললেন—"সে আমিই।"

"আপনিই! আপনি কিজন্যে এত রাত্রে বেরিয়েছিলেন, লি-সিনের ওপর তা হলে আপনারও লক্ষ ছিল, বলুন।"

"না, লি-সিনকে আমি দেখি-ই নি। এখন তোর কথায় বুঝতে পারছি, আমি যার পিছু নিয়েছিলাম, লি-সিনের লক্ষ্যও ছিল সেই।"

"সে আবার কে? আমি ত দেখিনি কাউকে!"

"তুই কি করে দেখবি? তুই লি-সিনকেই অনুসরণ করেছিস। সে যার পিছু নিয়েছিল তাকে দেখতে পাবার তোর কথা নয়।"

আমি বিস্মিত হয়ে খানিক চুপ করেছিলাম। মামাবাবু আবার বললেন— "ব্যাপারটা অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। লি-সিন আর আমি দুজনেই একই লোককে অনুসরণ করেও পরস্পরকে দেখতে পাইনি, তুই আবার লি-সিনেরই পিছু নিয়েছিলি।"

"কিন্তু আপনারা যাকে অনুসরণ করেছিলেন সে কি আমাদেরই দলের কেউ?"

"তাই ত আমার বিশ্বাস।"

"সে কে হতে পারে?"

মামাবাবু বললেন— "তা এখন বলতে পারব না— কিন্তু এই ক'দিনের সমস্ত রহস্যের মূলে সে যে কতকটা আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে শিঙা থেকে বাঘের ডাক বেরোয় সেটা তারই কাছে ছিল।"

"তার মানে আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে সে লাওচেনের তাঁবুতেও চুরি করতে ঢুকেছিল?"

মামাবাবু একটু হেসে বললেন—"সেই রকমই ত দেখা যাচ্ছে!"

সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু অত রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে আপনি তার সাড়া পেলেন কি করে?"

আমায় একেবারে অবাক করে দিয়ে মামাবাবু বললেন—"আমি ঘুমোই নি। তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম শুয়ে শুয়ে।"

"তার মানে আপনি আগে থাকতেই জানতেন, সে যাবে! তাহলে তাকে ধরবার বন্দোবস্ত করেননি কেন?'

"তা হলে তার গন্তব্য স্থান জানতে পারতাম না।"

"কিন্তু জানতে ত আমরা কিছুই পারলাম না! সে ত লাওচেনের তাঁবু থেকেও পালিয়ে গেল।"

মামাবাবু এবার গম্ভীর হয়ে শুধু বললেন—"তা বটে!" তারপর খানিক নীরবে চলার পর আবার বললেন—"দেখা যাক লি-সিন কি খবর দেয়।"

pathagar.net

কিন্তু লি-সিনের কাছে কোনো খবর পাবার আশা আমার ছিল না। মামাবাবু যাই বলুন, লি-সিনের গতিবিধির আমি অন্য রকম ব্যাখ্যাই করেছিলাম এবং সে ব্যাখ্যা যে ভুল নয় ঘটনার দ্বারা খানিকটা প্রমাণও হয়ে গেল।

নিজেদের তাঁবুতে গিয়ে কি দেখব সে বিষয়ে আমার একটু ভয়ই ছিল। লাওচেনের লোকদের মত আমাদের বাহকেরাও আমাদের ফেলে সরে পড়তে পারে হয়ত।

কিন্তু তাঁবুতে পৌছে দেখা গেল—সে রকম কোনো ব্যাপার ঘটেনি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল আমাদের অনুচরদের সকলেই উপস্থিত। শুধু এক লি-সিন ছাড়া।

লি-সিন সম্বন্ধে মামাবাবুর গভীর বিশ্বাসে একটু খোঁচা না দিয়ে পারলাম না এবার—"আপনার লি-সিনের ত পাত্তা নেই, মামাবাবু! চোর না ধরে বোধ হয় ফিরবে না মনে হচ্ছে!"

মামাবাবু আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে বললেন—"তোর কি এখনো লি-সিনের ওপর সন্দেহ গেল না?"

একটু অপ্রসন্নভাবেই বললাম—"কেমন করে যাবে তা ত বুঝতে পারছি না। আর সকলেই ত উপস্থিত, শুধু লি-সিনকেই পাওয়া যাচ্ছে না, এর মানে কি? আমাদের দলের যে সাংঘাতিক লোককে কাল অনুসরণ করেছিলেন বলেছেন, সেও ত বোঝা যাচ্ছে কোনোরকমে দলে ফিরে এসেছে!"

মামাবাবু একথা ভেবেছিলেন কি না বলা যায় না, কিন্তু তিনি উত্তর না দিয়ে গম্ভীরভাবে চুপ করে রইলেন।

আমি আবার অসহিষ্ণুভাবে বললাম—"আমাদের ভেতর অমন ভয়ানক লোক কে আছে তাও ত খুঁজে বার করা দরকার। ঘরের ভেতর বিষাক্ত সাপ নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকাও ত উচিত নয়।"

এবার মামাবাবু যা উত্তর দিলেন তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না! মনে হল, ক'দিনের ঘটনা-বিপর্যয়ে তাঁর মাথাই একটু খারাপ হয়েছে। তিনি বললেন—"ভাবনা নেই! সাপ কোথায় আছে জানলে যথাসময়ে মারা যাবে। তা ছাড়া এখন আমাদের কিছুদিন আর কোনো ভয় নেই।"

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কেন বলুন দেখি?"

"আমার তাই মনে হচ্ছে।"

মামাবাবুর পাগলামিতে বিরক্ত হয়েই আমি এবার চুপ করে গেলাম।

মামাবাবুর কথা কিন্তু এবার আশ্চর্যভাবে ফলল। এতদিন যে বিপদ আমাদের অনুসরণ করে আসছিল যাদুমন্ত্রে তা যেন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। হার্টজ কেল্লা পর্যন্ত পাহাড়ের পথে আমাদের সামান্য একটু-আধটু জঙ্গলের অসুবিধা ছাড়া আর কিছুই ভোগ করতে হল না। আশ্চর্যের বিষয় লি-সিনের সেই রাত্রের পর আর পাত্তা পাওয়া যায়নি। না পাওয়াতে আমি বিশেষ দুঃখিত হইনি। আমার ধারণা, সে সময় বুঝে এবার নিজের পথ দেখেছিল।

pathagar.net

ভেবেছিলাম, মামাবাবু খুব বিচলিত হবেন। আমার কথায় লি-সিন সম্বন্ধে বিশ্বাস তাঁর একটু শিথিল হয়েছিল সম্ভবত। কিন্তু তাঁকে তেমন কিছু ব্যাকুল দেখা গেল না। তা ছাড়া সম্প্রতি পথে লাওচেনের সঙ্গ পেয়ে দিনগুলো ভালোই কাটছিল। লাওচেনের আমাদের সঙ্গে এসে মেশা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা যেতে পারে। তার সঙ্গে পরিচয় হবার দিনেই সে নিজে আবার দেখা করতে আসে আমাদের সঙ্গে এবং জানায় যে আমরা তাকে একটু সাহায্য করলে সে এখনো নিজের দেশ ইউনানে গিয়ে উঠতে পারে। তার লোক লস্কর নেই; সামান্য কয়েকজন অনুচর নিয়ে এই বিপদসঙ্কুল পথে যাবার ভরসা তার হয় না। আমাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি পেলে তার অনেক সুবিধে হয়ে যায়।

মামাবাবু বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ তাকে আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলেন—"আপনি আসবেন ভেবে আমি আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়েছিলাম।" লাওচেন একটু অবাক হলেও হেসে বলেছিল—"আপনার আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ।" লাওচেন সেই থেকেই আমাদের সঙ্গেই আছে। এবারের যাত্রা লাওচেন থাকার দরুনই অনেকটা সহজ হয়েছিল। এদিকের পথ-ঘাট তার বেশ জানা। জঙ্গলের ভেতর তারই পরামর্শ মত চলে আমাদের অনেক সুবিধে হয়েছে। লাওচেনের লোক-লস্কর যে মিছিমিছিই একটা ভয়ের ছুতো করে তাকে ছেড়ে গেছে এ বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস ক্রমশই দৃঢ় হচ্ছিল। পথে কোনো গোলমালের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। হার্টজ কেল্লার কাছাকাছি যখন পৌছালাম তখন কয়েকদিন পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার মধ্যে কাটিয়ে গোড়ার দিকের ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলোও আমাদের কাছে যেন অবাস্তব হয়ে গেছে।

কাচনী পাহাড়ের উঁচু-নীচু জঙ্গলময় আঁকাবাঁকা পথে ঘোরার পর হার্টজ কেল্লার প্রথম দেখা পেয়ে মনে আপনা থেকেই যেন শান্তি আসে। চারিদিকের সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণীর মাঝখানে সমতল বিশাল উপত্যকায় কেল্লাটি অবস্থিত। সেখানে শস্য-শ্যামল প্রান্তরের মাঝে কৃষকদের পরিচ্ছন্ন গ্রামগুলি দেখা যাচ্ছে। বৌদ্ধ প্যাগোডার চূড়া উঠেছে এখানে সেখানে। এখানকার অধিবাসীরা কাচীন নয়, শান জাতি। তারা এককালে যোদ্ধা হিসেবে এ দেশ জয় করলেও এখন অকর্মণ্য অলস হয়ে গেছে। কাচীনরাই এখন তাদের ওপর উৎপাত করে।

এই হার্টজ কেল্লার পরই দারুদের অজানা দেশে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে পাহাড় ও জঙ্গলের মাঝে অশ্বতর-বাহিনী পর্যন্ত চলতে পারে না। পায়ে হেঁটে কুলির মাথায় মোট নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। পাহাড় থেকে হার্টজ কেল্লার সমতল প্রান্তরে নামবার আগের দিন সন্ধ্যায় আমাদের তাঁবুতে সেই নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। লাওচেনের তাঁবুতেই আমরা সকলে বসেছিলাম। এ ক'দিন আমাদের দুজনের তাঁবু কাছাকাছিই ফেলা হচ্ছে। কুলি সংগ্রহ ও পথঘাট সম্বন্ধে একঘেয়ে আলোচনা কতক্ষণ সহ্য করা যায়। খানিক বাদে আমি উঠে পড়লাম। পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের সমতল প্রান্তরের দৃশ্যটি সন্ধ্যার আলোয় আর একবার দেখতে ইচ্ছে করছিল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের ধারে সেই জন্যেই যাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময়ে আমাদের তাঁবুর দিকে চোখ পড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কে একটা লোক সন্তর্পণে আমাদের তাঁবুতে ঢুকছে। আমার দিকে পেছন

BanglaBook.org

ফিরে থাকলেও সে যে মঙপো বা আমাদের কাচীন চাকর নয় তা বুঝতে আমার কষ্ট হল না। আমাদের অশ্বতর চালকদের কেউও সে নয়। তার পোশাক পর্যন্ত আলাদা।

প্রথমে আমার ইচ্ছে হয়েছিল তৎক্ষণাৎ মামাবাবু ও লাওচেনকে ডাকতে। কিন্তু তার পরে মনে হল লোকটার উদ্দেশ্যটা আগে গোপনে জানা দরকার। পা টিপেটিপে আমি আমাদের তাঁবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। লোকটা তখন ভেতরে ঢুকেছে। একটুখানি অপেক্ষা করে আমি হঠাৎ তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে বললাম—"কে তুমি?" কিন্তু আর অগ্রসর হতে আমায় হল না। তাঁবুর ভেতর তখনো আলো জ্বালা হয়নি। বাইরের তুলনায় সেখানে বেশ অন্ধকার। ভালো করে কিছু দেখতে পাবার আগেই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় আমি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম। মামাবাবুর ক্যাম্প খাটের কোণে সজোরে আমার মাথাটা ঠুকে গেল। লোকটা তখন ছুটে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

মাটি থেকে উঠে আমিও তার পেছু নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মাথায় চোটটা একটু বেশীই লেগেছিল। তাঁবু থেকে বেরোতেই মনে হল সমস্ত পা টলছে, মাথা ঝিম ঝিম করছে। লোকটা আমার চোখের সামনেই তখন দ্রুতবেগে পাহাড়ের প্রান্তে যেখানে পথ নেমে গিয়েছে সেই দিকে দৌড়োচ্ছিল। এ অবস্থায় তাকে ধরা অসম্ভব জেনে আমি চীৎকার করে মামাবাবুকে ডাকলাম।

লাওচেন ও মামাবাবু একসঙ্গেই বেবিয়ে এলেন ব্যস্ত হয়ে তাঁবু থেকে। কিন্তু তখন লোকটাকে ধরবার আর কোনো আশা নেই। দেখতে দেখতে সে পাহাড়ের ধার দিয়ে নীচে নেমে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশই যে রকম গাঢ় হয়ে আসছিল তাতে লোকজন লাগিয়েও তাকে খুঁজে বার করা তখন অসম্ভব।

মামাবাবু কাছে এসেই অবাক হয়ে বললেন—"এ কি, তোর মাথায় রক্ত কেন?"

মাথা কেটে যে রক্ত পড়ছিল তা এতক্ষণ টের পাইনি। দেখলাম কাঁধের জামাটা পর্যন্ত লাল হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার তখন সময় নেই। আমি সংক্ষেপে ঘটনাটা তাঁদের বললাম।

লাওচেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেও মামাবাবু নিতান্ত সহজভাবে বললেন—"দাঁড়া, তোর মাথাটা কতখানি কাটল আগে দেখি।"

বিরক্ত হয়ে আমি বললাম—"মাথা পরে দেখলে চলবে। এদিকে লোকটা যে পালিয়ে গেল!"

"তার আর কি করা যাবে? এখন ত আর উপায় নেই।" বলে মামাবাবু তাঁবুর আলোটা জ্বালাতে গেলেন।

বিস্মিত কণ্ঠে লাওচেন জিজ্ঞাসা করলেন—"লোকটার মতলব কি ছিল মনে হয়?"

মামাবাবু আলো জ্বালতে জ্বালতে বললেন—"কি আবার! চুরি-টুরি হবে। এখানকার কাচীনরা ত এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত।"

আমি উত্তেজিতভাবে বলতে যাচ্ছিলাম—"সে কাচীন নয়, কাচীনদের অমন চেহারা বা পোষাক হয় না।" কিন্তু সে কথা বলবার দরকার হল না। আলো জ্বলে উঠতেই ঘরের মেঝেয় একটি জিনিষ একসঙ্গে আমাদের তিনজনেরই চোখে পড়ল।

pathagar.net

ভাঁজ করে মোড়া একটি কাগজ মেঝেয় পড়ে আছে। সে কাগজের ওপর মেয়ের মুখ বসান বাদুড়ের সেই ছবি আঁকা।

লাওচেন নীচু হয়ে সেটা কুড়োতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগে মামাবাবু একরকম ছোঁ মেরেই সেটা তুলে নিলেন।

মামাবাবু কাগজটা তুলে নিয়েই ভাঁজ খুলে সেটা পড়তে আরম্ভ করেছিলেন।

মামাবাবু যত দেরী করছিলেন, লাওচেন ও আমি তত বেশী অধীর হয়ে উঠছিলাম। লাওচেনের অধৈর্য বুঝি আমার চেয়ে বেশী।

মামাবাবু কিন্তু বৃথাই চেষ্টা করছিলেন বোঝা গেল। খানিকবাদে কাগজটা লাওচেনের হাতে দিয়ে তিনি বললেন—"পড়ে দেখুন। চীনে ভাষার বিদ্যে আমার অত্যন্ত সামান্য। যেটুকু জানি তাতে এ চিঠি পড়া অসম্ভব। শুধু একটা কথার বোধ হয় মানে করতে পেরেছি।"

আমি একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললাম—"শুধু একটা কথা পড়বার জন্যে এতক্ষণ ধরে কসরৎ করবার কি দরকার ছিল!"

মামাবাবু বললেন—"শুধু দেখলাম একটু চেষ্টা করে।"

লাওচেন চীনে ভাষা নিশ্চয়ই জানে, কিন্তু সেও চিঠিটার ওপর যতক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইল তাতে চীনের মত শক্ত ভাষারও গোটা একটা গল্প বোধ হয় পড়া যায়। মামাবাবু ততক্ষণে আমার কপালটা বেঁধে ফেলেছেন। সে যে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এটুকু বোঝা যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে যেন নিজেকে শান্ত করে সে মামাবাবুকে বললে—"আপনি চিঠির কি মানে করেছেন?"

মামাবাবু একটু থেমে বললেন—"মানে আমি কিছুই ঠিক করতে পারিনি। চীনে অক্ষরের ত আর মাথামুণ্ডু বোঝবার উপায় নেই। এক একটা অক্ষরের এক জাহাজ মানে। তবে বাদুড়ের ডানা সম্বন্ধে কি একটা কথা যেন আছে।"

লাওচেন খানিক চুপ করে থেকে মামাবাবুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললে—"আপনি ঠিকই ধরেছেন। বাদুড়ের ডানার কথা এতে আছে এবং তার সঙ্গে আর যা আছে তা ভয়ঙ্কর।"

ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি?"

চিঠিটা খুলে ধরে লাওচেন বললে—"চিঠিটা আগে তর্জমা করে বলি, শুনুন। চিঠিতে লিখেছে— মায়া বাদুড়ের চোখ অন্ধকারেও দেখতে পায়, অরণ্য-পর্বত তার ডানাকে বাধা দিতে পারে না। প্রস্তুত থেক। আজ তোমাদের শেষ দিন।"

"কিন্তু এ হুমকির মানে কি? মায়া বাদুড়ই বা কি?"

লাওচেন বললে—"মায়া বাদুড় যে কি সেটুকু আপনাদের বলতে পারি।" বলতে বলতে লাওচেনের স্বরও যেন আতঙ্কে কেঁপে উঠল। "আমি এদের কথা কিছু জানতে পেরেছি। মায়া বাদুড় একজন কেউ নয়—একটা প্রকাণ্ড গোপন সম্প্রদায়। সমস্ত চীন ব্রহ্মদেশ জাপান পর্যন্ত এদের শাখা আছে। এরা যে কি ভয়ানক হিংস্র তা আপনারা কল্পনাও করতে পারেন না। এরা করতে পারে না এমন কাজ নেই, এদের ক্ষমতাও অসাধারণ।"

"কিন্তু আমাদের ওপর এদের আক্রোশ হবার কারণ কি? মিচিনাতেও মামাবাবু এই রকম চিঠি পেয়েছিলেন।"

লাওচেন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললে—"মিচিনাতেও পেয়েছিলেন? কি ছিল তাতে?"

মামাবাবু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই আমি বললাম—"তাতে আমাদের এ অভিযানে বেরুতে মানা করা হয়েছিল।"

লাওচেন বললে—"তবু আপনারা সে মানা শোনেন নি! তবে আপনারা ত জানতেন না। মায়া বাদুড় সম্প্রদায়ের সব কথা জানলে বোধ হয় পারতেন না এ পথে আসতে।"

"কিন্তু বেরিয়ে যখন পড়েছি তখন কি করা যাবে! আজকের চিঠিতে এভাবে ভয় দেখাবার অর্থ কি?"

লাওচেন গম্ভীরভাবে বললে—"শুধু শুধু ভয় এরা দেখায় না।"

"তা হলে আপনি কি বলতে চান!"

"আমি কিছু বলতে চাই না, আমি জানি যে আজ ভয়ঙ্কর কোনো কাণ্ড ঘটবেই। একটা প্রাণ অন্তত নষ্ট হবেই।"

মামাবাবু এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও একটু হেসে বললেন—"সেটা আমাদের ত নাও হতে পারে।"

লাওচেন কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললে—"সেই চেষ্টা ত অন্ততঃ করতে হবে। আমাদের আজ অত্যন্ত সাবধান আর সজাগ থাকা দরকার।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"আমাদের কি করা উচিত? তাঁবুতে আর দু-জন পাহারার ব্যবস্থা করব?"

"তা করতে পারেন। কিন্তু আজ আমি নিজে এসে আপনাদের সঙ্গে থাকব।"

মামাবাবু ভদ্রতা করেই বোধ হয় বললেন—"তার দরকার নেই। আমাদের বিপদ আপনার ঘাড়ে চাপাতে চাই না।"

লাওচেন সে কথায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে—"আপনারা আমার যে উপকার করেছেন তার বদলে এটুকু করবার সুযোগ থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না। অবশ্য আমি কতটুকু সাহায্য করতে পারব, জানি না।"

মামাবাবু আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু লাওচেন বাধা দিয়ে দৃঢ়স্বরে বললে—"সে হবে না। আপনাদের বিপদের ভাগ নিতে আমি বাধ্য। আজ আমি এখানেই কাটাব।"

শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই হল। ঠিক হল লাওচেনের তাঁবুতে মঙপো আর আমাদের কাচীন চাকর পাহারায় থাকবে। আমাদের তাঁবুতে থাকব আমরা তিনজন। আমাদের অনুচরদের ভেতর থেকে আর কাউকে পাহারায় ডাকতে মামাবাবু রাজী হলেন না। প্রথমত, ব্যাপারটাকে জানাজানি হতে দিয়ে অনুচরদের ভেতর ভীতির সঞ্চার করতে তিনি চান না; দ্বিতীয়ত, অনুচরদের কে বিশ্বাসী কে অবিশ্বাসী তাঁর মতে ঠিক করা এখন কঠিন; তাদের কাউকে ডাকলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

জঙ্গলের পথে এমন অদ্ভুত রাত আমাদের কোনোদিন কাটেনি। সশস্ত্র হয়ে তিনজনে মুখোমুখি বসে আছি। তাঁবুর ভেতর উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর রাত্রে

pathagar.net

পাছে ঘুম আসে বলে স্টোভে কফির জল ফুটোন হচ্ছে। কোনোরকম সাড়া শব্দ আর নেই। আমরা পরস্পরের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পর্যন্ত পারছি না।

রাত ক্রমশ বাড়তে লাগল। জঙ্গলের পোকা মাকড়ের গাঁদি লেগে গেছে তাঁবুর ভেতর। তবু আলো জ্বালিয়ে রাখতেই হবে। লাওচেন এক সময়ে উঠে পড়ে বললে—"ইচ্ছে করলে আপনারা একজন একজন করে ঘুমিয়ে নিতে পারেন!"

আমি রাজী হলেও মামাবাবু কিন্তু রাজী হলেন না। বললেন—"কি দরকার? এত কষ্ট সওয়া গেছে, একটা রাত জাগলে কি আর হবে।"

রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জঙ্গলও যেন জেগে উঠছে। রাত্রির অন্ধকারে চারিধারে অদ্ভুত সব শব্দ। সে সব শব্দের অর্থ বুঝতে পারলে জঙ্গলের বিচিত্র কাহিনী যেন জানা যায়। একবার মনে হল অনতিদূরে কোথায় যেন কাশির মত শব্দ পাওয়া গেল। সে কাশি সম্ভবত কেঁদো বাঘের গলার আওয়াজ! হঠাৎ এক সময়ে সমস্ত জঙ্গল সচকিত হয়ে উঠল ভীষণ সোরগোলে। সে সোরগোল কিন্তু খানিক বাদেই থেমে গেল। গাছের মাথায় বাঁদরেরা কিসের ভয় পেয়ে কিচিমিচি করে লাফালাফি করে উঠেছিল। হয়ত কোনো বিশাল বোড়া সাপই তাদের আশ্রয়ে হানা দিয়েছে, কিংবা শয়তান কোনো নিঃশব্দচারী চিতা। থেকে থেকে নিশাচর প্যাঁচার অদ্ভুত ডাক আমাদের কাছেই শোনা যাচ্ছে।

প্রত্যেক বার শব্দ হলেই লাওচেন সভয়ে উৎসুকভাবে কানখাড়া করে থাকছিল। জিজ্ঞাসা করলাম—"কি শুনছেন?"

লাওচেন অদ্ভুতভাবে হেসে বললে—"মায়া বাদুড়ের সঙ্কেত শোনবার চেষ্টা করছি।"

"সঙ্কেত আবার কোথায়? জঙ্গলের জানোয়ারের আওয়াজই ত পাওয়া যাচ্ছে।"

"জানোয়ারদের আওয়াজ নকল করেই তারা সঙ্কেত করে পরস্পরকে।"

লাওচেনের কথা শেষ হতে না হতে পিঠের শিড়দাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত সমস্ত শরীরকে অবশ করে যেন বয়ে গেল। অদ্ভুত একরকম পাখীর ডাক। অন্ধকার যেন ককিয়ে উঠছে। লাওচেন না বলে দিলেও বোধ হয় বুঝতে পারতাম সে আওয়াজ স্বাভাবিক নয় কোনোমতেই।

লাওচেন ধড়মড় করে উঠে পড়ল। তার হলদে মুখ আরো হলদে হয়ে গেছে ভয়ে। অস্পষ্ট স্বরে বললে—"সময় হয়েছে।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাঁবুর দরজা খুলে বাইরে টর্চটা ফেললাম। আমাদের তাঁবুর কাছের একটা গাছ থেকে পাখা ঝটপট করতে করতে সত্যিই একটা বড় পাখী উড়ে গেল। আর কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। ফিরে এসে বললাম—"কোথায় কি? সত্যিই ত একটা পাখী দেখলাম।"

লাওচেন তেমনি পাংশুমুখে বলে—"ভালো! তবু এবার প্রস্তুত থাকুন।"

মামাবাবুর কি হচ্ছিল বলতে পারি না, কিন্তু আমার ত সমস্ত দেহ উত্তেজনায় কাঁপছিল। জানা শত্রুর সঙ্গে সামনাসামনি যোঝা যায়, সে শত্রু যত ভয়ঙ্করই হোক, কিন্তু এই অদৃশ্য রহস্যময় শত্রুর অপেক্ষায় এইভাবে বসে থাকার যন্ত্রণা অসহ্য। কিভাবে সে দেখা দেবে কিছুই জানি না। তার আক্রমণের ধরনও অজ্ঞাত। তাঁবুর তিনদিকে তিনটি ফুটোতে মাঝে

BanglaBook.org

মাঝে চোখ লাগিয়ে দেখছি, বাইরের অন্ধকারে কি হচ্ছে কিছুই কিন্তু তাতে বোঝা যায় না। কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলাম না। পিস্তলটা শক্ত করে চেপে ধরলেও বুঝতে পারছিলাম আমার হাত ঘেমে উঠে মুঠি শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হল না। হঠাৎ নিশাচর পাখীর সেই অদ্ভুত ডাকে আমার মনে হল রাত্রির আকাশ এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিদীর্ণ হয়ে গেল। তার পরেই আমাদের তাঁবুর ফাঁকাগুলির ভেতর দিয়ে দেখা গেল আগুনের আঁচ। কাছেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

ব্যাপার কি? আমি বাইরে ছুটে বেরুতে গেলাম। মামাবাবু আমায় একবার বাধা দিতে গেছলেন কি ভেবে কে জানে। তারপর বললেন—"চল"। লাওচেন চীৎকার করে বললে—"সবাই মিলে অমন করে বেরুবেন না।"

কিন্তু আমি তখন উত্তেজনার শিখরে উঠেছি। নিজেকে থামাবার ক্ষমতা আর নেই। আমি বেরিয়ে পড়লাম কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে। তাঁবুর ভেতর ওইভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে তিল তিল করে যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে যা হোক একটা কিছু করতে পারলে বেঁচে যাই।

বাইরে বেরিয়েই শুনলাম, মঙপো ও কাচীন চাকরটার চীৎকার। লাওচেনের তাঁবুই দাউদাউ করে জ্বলছে এবং তার ভেতর থেকে তারা কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। কাচীন চাকরটার দু-এক জায়গা বেশ পুড়েও গিয়েছিল। তার ভীত চীৎকার আর থামতে চায় না।

আগুন নেভাবার চেষ্টা করা তখন বৃথা। সমস্ত তাঁবু ধরে উঠেছে। তার শিখায় বনের অনেকখানি আলোকিত। কিন্তু দেখবার সেখানে কিছু নেই। কেমন করে আগুন লাগল, তারা কিছু দেখেছে কি না, সে সব তখন জিজ্ঞাসা করা বৃথা। তাদের দুজনকে একটু শান্ত করে আমাদের তাঁবুতে আনবার ব্যবস্থা করছি এমন সময়ে আবার চমকে উঠলাম। এবার পিস্তলের শব্দ এবং আমাদেরই তাঁবুর ভেতর থেকে।

এতক্ষণে খেয়াল হল, মামাবাবু আমার সঙ্গে আসবেন বলেও ত আমায় অনুসরণ করেননি। সেই সঙ্গে বুকটা কেঁপে উঠল আতঙ্কে। লাওচেন বলেছিল—"একটি প্রাণ আজ নষ্ট হবেই।"

মঙপোকে আমায় অনুসরণ করবার ইশারা করে আবার নিজেদের তাঁবুতে এসে ঢুকলাম। তারপর সামনে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে খানিকক্ষণের জন্যে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল।

আমার পায়ের শব্দে প্রথমে লাওচেন চমকে উঠে পিস্তলটা আমার দিকেই তুলে ধরেছিল, কিন্তু তারপর লজ্জিতভাবে সেটা নামিয়ে কাতরভাবে বললে—"দেখুন কি হয়েছে! এই জন্যেই আপনাকে যেতে বারণ করেছিলাম। তিনজনে একসঙ্গে থাকলে বোধহয় এ-ব্যাপার ঘটত না।"

"কিন্তু কি হয়েছে কি! মামাবাবু বেঁচে আছেন ত!"

লাওচেন আমার কথার উত্তরে যা বললে তাতে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে আফসোসের আর সীমা রইল না। কেন আমি মূর্খের মত এ বিপদের মধ্যে বেরুতে গিয়েছিলাম!

pathagar.net

মামাবাবু আমার সঙ্গে যাবার জন্যে পেছন ফিরে তাঁর পিস্তলটা নিতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে লাওচেন দরজার গোড়ায় শত্রুকে দেখতে পায়। মামাবাবু তখন তার সামনে। পিস্তল ছোঁড়বার আগেই শত্রু ভারী একটা দণ্ড দিয়ে মামাবাবুর মাথায় সজোরে আঘাত করে। লাওচেন তারপর গুলি করেছে সত্য, কিন্তু ক্ষতি কিছু করতে পারেনি।

লাওচেন যতক্ষণ কথা বলছিল ততক্ষণ মামাবাবুর কাছে বসে তাঁকে পরীক্ষা করছিলাম। মাথার আঘাত গুরুতর, রক্ত সেখানে চুলের সঙ্গে জমাট বেঁধে গেছে। মামাবাবুর জ্ঞান এখনো নেই, কিন্তু প্রাণ আছে বলেই মনে হল। বুকের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

লাওচেন সে কথা শুনে আগ্রহভরে মামাবাবুকে আর একবার পরীক্ষা করে বললে—"হ্যাঁ—আছে বলেই মনে হচ্ছে। এখন খুব সাবধানে রাখা প্রয়োজন। আগে মাথার ঘা-টা পরিষ্কার করে বাঁধতে হবে।"

আমি সেই ব্যবস্থা করতে গিয়ে সহসা চমকে উঠে বললাম—"দরজার কাছে কিসের রক্ত লাওচেন? মামাবাবুর রক্ত ত ঘরের মাঝখানেই পড়েছে?

"দরজার কাছে রক্ত? কই দেখি!" বলে লাওচেন এগিয়ে এল। তারপর সোল্লাসে বললে—"তা হলে আমার গুলি ব্যর্থ হয়নি। নিশ্চয়ই তার গায়ে ভাল রকম লেগেছে। এই ত রক্তের আরও দাগ। শীগগির আসুন আমার সঙ্গে। লোকটা দস্তুরমত জখম হয়েছে। এ রকম গুলি খেয়ে বেশীদূর সে যেতে নিশ্চয়ই পারেনি। এখনি তাকে ধরতে পারা যাবে।"

"কিন্তু মামাবাবু যে রইলেন!"

"দু মিনিট শুধু। মঙপো রয়েছে, কোনো ক্ষতি হবে না। মামাবাবুর জন্যেই এ শয়তানকে ধরবার চেষ্টা করা উচিত।"

সেই কথা ভেবেই কাচীন চাকরটাকে দরজায় রেখে আমরা এগিয়ে গেলাম।

রক্তের দাগ কিন্তু খানিকটা দূর গিয়েই একেবারে যেন ভোজবাজিতে মিলিয়ে গেল। আশেপাশে সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, লুকোবার কোনো জায়গা নেই। এক জায়গায় অনেকখানি রক্ত জমাট বেঁধে আছে। মনে হল সেখানে লোকটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু তারপর সে গেল কোথায়! নিঃশব্দে কোনো হিংস্র শ্বাপদই কি তাকে তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু তা হলেও ত রক্তের দাগ থাকবে। আর এখন নিভে এলেও তখন যেরকমভাবে লাওচেনের তাঁবু জ্বলছিল তাতে হিংস্র শ্বাপদের কাছাকাছি সাহস করে আসা সম্ভব নয়।

বিমূঢ়ভাবে কিছুই বুঝতে না পেরে আমরা আবার তাঁবুতে ফিরলাম; কিন্তু সেখানে আরো ভয়ানক বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল।

তাঁবুতে ঢুকে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ভেতরে মঙপো বা মামাবাবু কেউই নেই। মাত্র কয়েক মিনিট। কাচীন চাকর দরজায় বসে আগাগোড়া পাহারা দিচ্ছে। এর ভেতর একটি সুস্থ ও একটি অচেতন লোক এই তাঁবুর ভেতর থেকে উধাও হয়ে গেল কোথায়?

তাঁবুর ভেতর ঢুকে খানিকটা বিস্ময়ে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। লাওচেনের মুখ দেখে ত মনে হচ্ছিল আমার চেয়ে সে যেন অনেক বেশী ভয় পেয়ে একেবারে বিহ্বল হয়ে গেছে। কি যে এখন করা উচিত, সে বিষয়ে মনস্থির করবার ক্ষমতাও আমাদের নেই।

pathagar.net

আশ্চর্যের কথা এই যে, তাঁবুর ভেতর আমরা যা দেখে গিয়েছিলাম তার চেয়ে বেশী বিশৃঙ্খলতার কোনো চিহ্ন নেই। যে 'রাগের' ওপর মামাবাবুকে শোয়ানো হয়েছিল সেটা পর্যন্ত এতটুকু ভাঁজ হয়নি। কোথাও এতটুকু ধ্বস্তাধ্বস্তির পরিচয়ও পাওয়া গেল না। মামাবাবু না হয় অচৈতন্য হয়েছিলেন, কিন্তু মঙপো ত সুস্থ ছিল—সে কি একটু বাধা দেবার অবসরও পায়নি। সুস্থ ও অচৈতন্য দুটি লোককে এই অল্প সময়ের মধ্যে কাবু করে সরিয়ে ফেলা ত কম বাহাদুরী নয়।

যারাই এমনভাবে একাজ করে থাক তাদের ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়। সমস্ত ব্যাপার এমন নিঃশব্দে নিখুঁতভাবে করা হয়েছে যে, অলৌকিক কোনো ব্যাখ্যার দিকেই মন প্রথমটা ঝুঁকে পড়ে।

সম্ভবত সেই জন্যেই প্রথমটা আমরা তাঁবুর ভেতর অসাধারণ কিছু দেখতে পাইনি।

এইবার চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম।

লাওচেনও বোধহয় আমার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেয়েছিল। দুজনে এক সঙ্গে তাঁবুর ধারে এগিয়ে গেলাম। এবার আর বুঝতে বাকী রইল না, দরজায় কাচীন চাকর পাহারায় থাকা সত্ত্বেও কোথা দিয়ে শত্রু তাঁবুতে প্রবেশ করে তাদের কাজ হাসিল করেছে। কোনো ধারাল অস্ত্রে তাঁবুর পেছনের দেয়ালের কাপড় প্রায় তিন হাত চেরা হয়েছে দেখা গেল। সেইখানের তাঁবুর কাপড় সরিয়েই যে তারা ভেতরে ঢুকেছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তারপর কেমন করে নিঃশব্দে দুটি মানুষকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে রহস্য অবশ্য সূত্রটুকু থেকে মীমাংসিত হল না। আমরা দুজনেই তৎক্ষণাৎ পেছনের সেই কাটা অংশ সরিয়ে তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বাইরে লাওচেনের তাঁবুর আগুন প্রায় নিভে এসেছে। সে নিভু-নিভু আগুন চারিধারের গাঢ় অন্ধকার কিছুমাত্র আর দূর করতে পারছে না।

আমাদের তাঁবুর এই পিছনের দিকটা, আগুন যখন প্রবলভাবে জ্বলছে তখনো নিশ্চয়ই অন্ধকার ছিল। শত্রু সেই অন্ধকারেই সুযোগ নিয়েছে। আমরা যখন প্রথমবার তাঁবুর বাইরে রক্তের দাগ অনুসরণ করতে যাই, তখন আমাদের কয়েক হাত মাত্র দূরে থাকলেও তাদের আমরা দেখতে পাইনি।

টর্চ নিয়ে আমরা এবার অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। কিন্তু এই গহন অন্ধকারে কোথায় তাদের খোঁজ পাওয়া যাবে। আগের বারে তবু রক্তের দাগ ধরে খানিকটা অগ্রসর হওয়া গেছল, এবার সামান্য কোনো চিহ্ন নেই। এক রাত্রের মধ্যে দুবার আমাদের এক রকম চোখের ওপরেই এমন রহস্যময় অন্তর্ধান ঘটল, যার কোনো কিনারাই হয় না।

হতাশ হয়ে যখন তাঁবুতে ফিরে এলাম তখন আমার মনের অবস্থা বর্ণনা করবার মত নয়। প্রথম দিকটা বিপদের মাঝে বিমূঢ় হয়ে ভালো করে উপলব্ধি করতে পারিনি। এইবার সম্পূর্ণভাবে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিসত্যিই চোখে অন্ধকার দেখলাম।

pathagar.net

মুখে আগে যাই বলে থাকি, এই অজানা দেশে বিপদের মাঝে যাঁর ভরসায় আসতে সাহস করেছিলাম সেই মামাবাবুর এই পরিণামের পর আমার উপায় কি হবে! কোথায় আমি দাঁড়াব এখন? কি আমার এখন কর্তব্য?

জীবিত থাকুন বা না থাকুন, মামাবাবুর সন্ধান করা এখন দরকার। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? সম্পূর্ণ অজানা বিপদসঙ্কুল দেশ। এ পর্যন্ত সামান্য যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে বোঝা কঠিন নয় যে, শত্রুও যেমন রহস্যময় তেমনি অসামান্য শক্তিমান। তাদের বিরুদ্ধে আমি কি করতে পারি! করতে চাইলেও মামাবাবুর অভাবে আমাদের দলের লোকেরাই আমার বাধ্য আর থাকবে কি না সন্দেহ। একা একা এখানে কিছু করবার চেষ্টা বাতুলতা। হিংস্র শ্বাপদের হাতেই তা হলে আগে প্রাণ দিতে হবে।

অথচ ফিরে যাওয়া অসম্ভব। মামাবাবুর খোঁজ না নিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ফিরে যেতে আমি কিছুতেই পারব না।

হতাশভাবে কোনো দিকে কোনও কূল দেখতে না পেয়ে আমি দু'হাতের ভেতর মাথা গুঁজে বসেছিলাম। লুকিয়ে কোনো লাভ নেই, এই নিদারুণ অবস্থার মধ্যে পড়ে তখন আমার চোখও সজল হয়ে উঠেছিল। সজল হয়েছিল নিজের কোনো বিপদের কথা ভেবে নয়। সব দিক দিয়ে এমন করে সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায়, নিজের অক্ষমতায় ও মামাবাবুর শোচনীয় পরিণামের কথা ভেবেই ক্ষোভে দুঃখে নিজেকে আর সামলাতে পারিনি।

মাথা গুঁজে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে উঠলাম। লাওচেন কাছে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রেখেছে।

আমি মুখ তুলে তাকাতেই সে বললে—"ভাববেন না, মিঃ সেন, আপনার মামার সন্ধান আমি করবই। এই শয়তানীর প্রতিশোধ নেওয়া আমার নিজের দায় বলে আমি মনে করি, জানবেন।"

মুখে আমি কিছু বলতে পারলাম না, কিন্তু আমার চোখে সে মুহূর্তে যে অসীম কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছিল, তা বুঝতে লাওচেনের নিশ্চয়ই ভুল হয়নি।

লাওচেন খানিক চুপ করে থেকে বললে—"আমার এতে একদম স্বার্থ নেই মনে করবেন না। আপনাদের অভিযান ব্যর্থ হলে তাই আমারও সমূহ ক্ষতি। তা ছাড়া এ ক'দিনে আপনাদের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে, তার জন্যেও এ অবস্থায় আমি শুধু নিজের সুবিধার কথা ভাবতে পারি না। বন্ধুত্বের উপকারের ঋণও অন্ততঃ আমায় শোধ করবার চেষ্টা করতে হবে।"

আমি এইবার বললাম—"আপনার কি আশা হয় মামাবাবুর খোঁজ পাওয়া যাবে? আপনি নিজেই ত মায়া বাদুড়দের ভয়ঙ্কর প্রতাপ ও ক্ষমতার কথা বলেছেন!"

"তা বলেছি এবং এখনো বলছি যে তারা ভয়ঙ্কর। কিছু তাদের অসাধ্য নয়, তাদের শত্রুতা করা মানে স্বয়ং যমকে ঘাঁটান। কিন্তু তা বলে ত নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না।"

এই চীনেম্যানের প্রতি শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় সত্যি আমি এবার অভিভূত হয়ে গেলাম। উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরে বুঝি একটু বিহ্বলভাবেই বললাম—"এ সময়ে আপনার এ

pathagar.net

সাহায্যের কথা আমি জীবনে ভুলব না! অথচ একদিন আপনাকেও আমি সন্দেহ করেছিলাম।"

লাওচেন কোনোরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে, তার টেরচা চীনে চোখ দুটো শুধু অর্ধ নিমীলিত করে বললে—"সময়ই আমাদের সব ভুল শুধরে দেয়, মিঃ সেন!"

কিন্তু মামাবাবুর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। অন্ততঃ এই ক'দিনে তেমন কোনো সূত্র আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি বলতে পারি না। লাওচেনের পরামর্শ মত, পাহাড় থেকে সমতলক্ষেত্রে নেমে, হার্টজ কেল্লা বাঁ দিকে রেখে, শানেদের দেশের ভেতর দিয়ে আমরা আবার গহনতম পার্বত্য অরণ্যে এসে পৌঁছেছি। হার্টজ কেল্লায় আমরা ইচ্ছা করেই আশ্রয় নিইনি। লাওচেনের মত যে ঠিক, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ আমার ছিল না। সেখানে সহকারী কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষ কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা বৃথা। তারা মায়া বাদুড়ের ব্যাপার আজগুবি বলেই সম্ভবত উড়িয়ে দিত। তার ওপর মামাবাবু না থাকায় আমাদের আর অগ্রসর হবার অনুমতি পাওয়াই শক্ত হত। তাদের সাহায্য চাইতে গিয়ে সব দিক নষ্ট করার চেয়ে নিজেদের চেষ্টায় যতটা করতে পারি তার ব্যবস্থা করা ঢের বেশী প্রয়োজনীয় বুঝেই আমরা গোপনে শান প্রদেশ পার হয়ে এসেছি।

অবশ্য পথ ও গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে আমাকে লাওচেনের ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে। এ অঞ্চল তারই পরিচিত। শত্রুদের চালচলনও তারই জানা। এ ব্যাপারে তার ওপর কোনো কথা বলা আমার উচিত নয়। তার প্রয়োজনও হয়নি।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল পার হয়ে লাভ কি হল? পর্বত যেমন দুরারোহ, অরণ্য এখানে তেমনি গভীর। সর্বশ্রেষ্ঠ দু-পেয়ে জীব হিসাবে এখানে মানুষ নিজের গৌরব সব জায়গায় বজায় রাখতে পারে না। হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হয় এমন খাড়াই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত পাহাড় বেশী। এর কিছু দূরেই বামনাকৃতি দারুদের অজানা দেশ। মামাবাবুর অভিযানের এই দেশই অবশ্য লক্ষ্য ছিল, কিন্তু তাঁর সন্ধানে এখানে আসা কতদূর যুক্তিযুক্ত আমি বুঝতে পারছিলাম না। লাওচেনের অবশ্য ধারণা অন্য রকম। মায়া বাদুড়দের সন্ধান এখানেই পাওয়া যাবে বলে তার স্থির বিশ্বাস। এতদিনেও কোনও ঘটনায় সে ধারণার সমর্থন না পেয়ে একদিন আমি তার সঙ্গে একথা আলোচনা করতে বাধ্য হলাম।

পাহাড়ের দুর্গম চড়াই উৎরাই ভেঙে সমস্ত দিনে সেদিন মাত্র মাইল সাতেক আমরা পার হয়েছি। যেখানে আমাদের তাঁবু পড়েছে, সেটি দুটি পাহাড়ের মাঝখানের একটা গলির মত স্থান—ঘন অরণ্যে ঢাকা। দুধারে খাড়া পাহাড় কতদূর যে উঠে গেছে বলা যায় না। তারই মাঝখানে সঙ্কীর্ণ একটু গিরিসঙ্কটে তাঁবুর ভেতরও যেন স্বস্তি বোধ করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল দু'ধার দিয়ে পাহাড় যেন জীবন্ত দৈত্যের মত যে কোনো মুহূর্তে আমাদের চেপে পিষে ফেলতে পারে।

pathagar.net

লাওচেন ও আমি আজকাল এক তাঁবুতেই থাকি। আমাদের কুলিরা সমস্ত মালপত্র নিয়ে আর একটি তাঁবু ব্যবহার করে। এখানে শীতের প্রচণ্ডতার জন্যে ও হিংস্র শ্বাপদের ভয়ে তাঁবু ব্যবহার না করে উপায় নেই।

বাইরে গাঢ় অন্ধকার রাত। লাওচেন একটা কাগজের ওপর ম্যাপ এঁকে আমাদের যাত্রাপথ ঠিক করছিল। আমি আমার বন্দুকটা পরিষ্কার করতে করতে তাকে বললাম—"আর অগ্রসর হতে আমার মন কিন্তু চাইছে না!"

"কেন?" লাওচেন ম্যাপ থেকে মুখ না তুলেই বললে।

আমি একটু বিরক্ত স্বরেই বললাম—"কেন, তাও বলতে হবে? এতদিনে কোনো পাত্তাই ত মিলল না! আমরা যে ভুল পথে যাচ্ছি না তার প্রমাণ কি?"

লাওচেন ম্যাপটা সরিয়ে বললে—"প্রমাণ অবশ্য কিছু নেই—"

"তা হলে এ হয়রানিতে লাভ কি? আমার মনে হয় মায়া বাদুড়দের অত ভয়ঙ্কর ভেবেই আমরা ভুল করেছি। আমাদের হার্টজ কেল্লাতেই যাওয়া উচিত ছিল। এই গহন জঙ্গলে অন্ততঃ তাদের কোনো খোঁজ মিলবে না।"

আমার মুখের কথা মুখেই খানিকটা রয়ে গেল। লাওচেন ও আমি দুজনেই এক সঙ্গে চমকে উঠলাম। বাইরে নিশাচর কোনো পাখীর ভয়ঙ্কর ডাকে অন্ধকার পর্যন্ত যেন শিউরে উঠল।

আমার সমস্ত শরীর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। মামাবাবুর দেহ যেদিন অন্তর্হিত হয় সেদিন এই নিশাচর পাখীর ডাক থেকেই কি সব বিভীষিকাময় ঘটনার সূত্রপাত হয়, সে কথা ত কোনো দিন ভোলবার নয়। নিজের অজ্ঞাতে আমার হাত কোমরবন্ধের পিস্তলে গিয়ে তখন পৌঁছেছে।

কিন্তু লাওচেন প্রথমে চমকে উঠলেও তারপর হেসে উঠল।

"ও কি, হাসছেন যে!" আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"হাসছি আপনার রকম দেখে।"

"আমার রকম দেখে। কেন আপনি কি কালা নাকি! শুনতে পাননি?"

"শুনতে পাব না কেন! কিন্তু তাতে ভয় পাবার কিছু নেই।"

আমায় অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে লাওচেন আবার বললে—"আসল আর নকলের তফাৎ বোঝবার মত আপনার কান এখনো তৈরী হয়নি। এ হল এদেশের টিঙ্কার বার্ড বলে এক রকম পাখীর আসল ডাক। মায়া বাদুড়েরা এই আওয়াজেরই নকল করে—সঙ্কেত করবার জন্যে। কিন্তু সে নকল আওয়াজ ধরা যায়।"

আমি আবার একটু অপ্রস্তুত হয়েই বন্দুক পরিষ্কার করায় মন দিলাম। লাওচেনের কথায় সত্যি কথা বলতে গেলে আশ্বস্ত হওয়ার চেয়ে হতাশই হয়েছিলাম বেশী! ভয় যতই পেয়ে থাকি সেই নিশাচর পাখীর ডাকে প্রথমে মনে একটু আশাও জেগেছিল। আশা হয়েছিল এই ভেবে যে, মায়া বাদুড়ের সাড়া অন্ততঃ এতদিনে পাওয়া গেল। যে কোনোরকমে মায়া বাদুড়ের সন্ধান পাওয়াই এখন আমাদের দরকার। তা না হলে মামাবাবুর খোঁজ কেমন

pathagar.net

করে, কোন সূত্র ধরে করব। যাকে মায়া বাদুড়ের সঙ্কেত মনে করেছিলাম এখানকার সত্যকার কোনো পাখীর সাধারণ ডাক শুনে তাই ভয় দূর হলেও মনটা খারাপ হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে বন্দুক পরিষ্কার করা শেষ করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। লাওচেন তখন তার ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে বিশেষ মন দিয়ে কি দেখছে।

সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে ম্যাপটার দিকে চেয়ে বললাম—"আপনার এত ম্যাপ দেখাদেখির অর্থ আমি বুঝতে পারি না! ম্যাপ দিয়ে কি আমাদের শত্রুর সন্ধান পাওয়া যাবে মনে হয়?"

ম্যাপটা উল্টে রেখে আমার দিকে ফিরে লাওচেন যেন একটু অসহিষ্ণুভাবেই এবার বললে—"ম্যাপ না হলে আমরা চলব কি করে?"

"কিন্তু আমরা চলেছি কোথায়?"

লাওচেন খানিক চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলে। তারপর আমায় তার পাশে বসতে বলে একটা কাগজ টেনে নিয়ে তার ওপর কয়েকটা দাগ টেনে বললে—"এর মানে কিছু বুঝতে পারছেন?"

"বুঝতে পারছি। আমরা যে গিরিপথে এখন এসে পড়েছি এটা তারই মানচিত্র।"

"ঠিক ধরেছেন। কিন্তু একটা কথা আপনি জানেন না। এ মানচিত্র সম্পূর্ণ নয়। আমাদের ডানদিকে পাহাড়ের পেছনে কি আছে আমরা জানি না। কেউ জানে না! এ পাহাড় দুর্লঙ্ঘ্য বলে এ পর্যন্ত সেখানকার মানচিত্র তৈরী হয় নি।"

"কিন্তু মানচিত্র ঠিক করতে ত আমরা আসিনি।"

"না, তা আসিনি, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই আমাদের পাহাড়ের ওদিকে যাওয়া দরকার!"

"যেখানকার কথা কেউ জানে না, সেখানে গেলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে মনে করছেন কেন?"

লাওচেন এতক্ষণে যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললে—"সব কথা বোঝাতে পারব না, মিঃ সেন। এখানে আমার ওপর আপনাকে নির্ভর করতে হবে।"

"তা করছি, কিন্তু ভেবে দেখুন, এতদিনেও এতটুকু সূত্র কোথাও না পেয়ে আমার পক্ষে হতাশ হওয়া স্বাভাবিক কি না। তা ছাড়া আর একটা কথা। এ পাহাড় ত দুর্লঙ্ঘ্য বলছেন। পার হব কি করে?"

"যেমন করে হোক, যতদূর ঘুরে হোক, পার হবার চেষ্টা করতে হবে, যদি না—"

"যদি না—কি?"

"যদি না ভাগ্যক্রমে দারুদের গোপন পথ আমরা খুঁজে পাই! এ পাহাড় পার হবার একটা সহজ গোপন রাস্তা আছে, মিঃ সেন। শুধু দারুরা এবং আমার বিশ্বাস মায়া বাদুড়রা সে পথের সন্ধান জানে—"

লাওচেনের কথা শেষ হবার আগেই অপ্রসন্ন মনে আমি উঠে তাঁবুর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে একটু বিরক্তির স্বরেই বললাম—"তারা তো গলা ধরে সে

pathagar.net

খবর আমাদের জানিয়ে যাবে না। আমাদের এই পাহাড় জঙ্গলে অকারণে ঘুরে মরাই সার হবে। এর চেয়ে হার্টজ কেল্লায় গিয়ে খবর দিলে হয়ত এতদিনে একটা কিনারা হত।"

লাওচেন এ কথার কোনো উত্তর দিলে না। আমি অন্যমনস্কভাবে তাঁবুর পর্দাটা সরিয়ে হঠাৎ চমকে উঠে উত্তেজিত স্বরে চাপা গলায় বললাম—"লাওচেন, আমার টর্চটা শীগগির—"

বাইরে গভীর অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকির আলো ছাড়া আর কিছু দেখবার উপায় নেই। কিন্তু তারই ভেতর শুকনো জঙ্গলের পাতা মাড়িয়ে কারুর দৌড়ে চলে যাবার শব্দ আমি স্পষ্ট শুনেছি।

লাওচেন টর্চ আনতেই কিন্তু সে শব্দ থেমে গেল। টর্চ ফেলে চারিদিকে ঘুরিয়ে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

লাওচেন উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে—"কি হয়েছে, ব্যাপার কি?"

বললাম—"কে যেন আমাদের তাঁবুর কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শোনবার চেষ্টা করছিল। আমি বাইরে মুখ বাড়াতেই পালিয়ে গেল।"

"পালিয়ে গেল! কিন্তু এখান থেকে ত পালাবার পথ নেই! এই সঙ্কীর্ণ গিরিপথ পেছনের দিকে মাইল চারেক এবং সামনের দিকে কতদূর যে দীর্ঘ তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। গোপন রাস্তা না জানলে আমাদের হাত এড়িয়ে সে কিছুতেই যেতে পারবে না, মিঃ সেন।"

লাওচেন নিজেই এবার টর্চটা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল। পায়ের শব্দটা আমাদের কুলিদের তাঁবুর দিকেই গেছল! কিন্তু সেখানে পৌঁছে চারিধারে টর্চ ফেলেও কোথাও কাউকে দেখতে পেলাম না। সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। অনেক বড় গাছ চারিদিকে থাকলেও আমাদের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে থাকবার সুযোগ কোথাও ছিল না। দ্রুত পালিয়ে গেলেও পায়ের শব্দ আবার পাওয়া যেত।

হঠাৎ একটা সন্দেহ হওয়ায় আমি লাওচেনকে বললাম—"আমাদের কুলিদের একবার ডাকুন দেখি।"

"কেন? না, না, আপনার সন্দেহ অমূলক। তারা কেউ একাজ করবে না। তারা সবাই বিশ্বাসী। তা ছাড়া রাত্রে 'নাটের' অর্থাৎ ভূতের ভয়ে একলা বার হবার সাহস তাদের কারুর নেই।"

আমি তবু জেদ করে বললাম—"না থাক, তবু একবার দেখতে ক্ষতি কি! আপনি না হয় টর্চ জ্বেলে বাইরে চারিদিকে লক্ষ রাখুন, আমি গিয়ে দেখি।"

আমি চলে যাচ্ছিলাম;—লাওচেন হঠাৎ আমার হাতটা ধরে ফেলে বললে, —"দাঁড়ান, আমিও যাচ্ছি সঙ্গে!"

"কিন্তু বাইরেও দৃষ্টি রাখা দরকার একজনের।"

"তা হলে আপনি বরং বাইরে থাকুন, আমি ভেতরে যাচ্ছি কুলিদের খবর নিতে।"

লাওচেনের বাইরে একলা থাকতে আপত্তি দেখে, সত্যি একটু হাসি পেল। যাই হোক, নেহাত তার ইচ্ছা নেই দেখে অগত্যা রাজী হলাম।

pathagar.net

কুলিরা অধিকাংশই ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধ হয়। ডাকাডাকি করে তাদের তুলতে লাওচেনের সময় লাগল। ভেতরে যাবার পরও অনেকক্ষণ ধরে তার আর সাড়া পাওয়া গেল না।

বাইরে দাঁড়িয়ে, কান খাড়া রেখে তখনো আমি চারিধারে আলো ফেলে দেখছি। চারিধার নিস্তব্ধ, আমার টর্চ ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় গাছের ছায়া ছাড়া আর কিছু নড়ছে না। বাইরের কনকনে শীতে মনে হচ্ছে নাকের ভেতর দিয়ে বুক পর্যন্ত জমানো বরফ চলে যাচ্ছে।

এ রকমভাবে বৃথা আর দাঁড়িয়ে থাকব কি না ভাবছি, এমন সময় মনে হল পাহাড়ের দিকে একটা বড় গাছের ছায়ায় সামান্য একটু যেন কিসের নড়ার আভাস পাওয়া গেল।

পিস্তলটা বেল্ট থেকে খুলে ডান হাতে নিয়ে, বাঁ হাতে টর্চ ধরে আমি এবার ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম। বেশীদূর এগুতে হল না, শুকনো পাতা মড়মড়িয়ে অকস্মাৎ গাছের আড়াল থেকে যে জীবটি বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে দৌড়াল, তাকে চিনতে পেরে প্রথমটা হাসিও যেমন পেল, লজ্জা তার চেয়ে কম হল না।

এই সামান্য প্রাণীটির জন্যে ভয় পেয়ে, আমি কি মিথ্যে হৈ-চৈ-ই না বাধিয়ে তুলেছি! সেটি এদেশের পাহাড়ী অঞ্চলের ছাগল ও হরিণের মাঝামাঝি এক রকম প্রাণী, নাম 'গুরাল'। রাত্রির অন্ধকারে আমাদের তাঁবুর ধারে বোধ হয় সাহস করে চরতে এসেছিল, তারপর পালিয়েছিল আমার সাড়া পেয়ে। তাকেই শত্রুর চর ভেবে মিছিমিছি শীতের ভেতর আমি নিজেও নাকাল হয়েছি, লাওচেনকেও নাকাল করেছি।

যাই হোক, শিকার হিসাবে গুরাল দুষ্প্রাপ্য জিনিষ। পিস্তল দিয়ে লক্ষ্য ঠিক করা কঠিন হলেও একেবারে চেষ্টা না করে ছেড়ে দেওয়া আমার উচিত মনে হল না। তা ছাড়া জানোয়ারটাকে বেশ বাগেই পাওয়া গেছে। গিরিপথ সঙ্কীর্ণ এবং পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে অভ্যস্ত হলেও সামনের খাড়া পাহাড় গুরালটির পক্ষে পার হয়ে যাওয়া অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত আমার দিকে ফিরতেই হবে এবং তখন পিস্তল দিয়ে তাকে মারা সম্ভব হলেও হতে পারে।

সামনের ছোট একটা ঢিবির আড়ালে প্রাণীটি গিয়ে থেমেছিল, আমি লক্ষ করেছিলাম। সতর্কভাবে পিস্তল বাগিয়ে ধরে সেদিকে আবার অগ্রসর হতে লাগলাম। ঢিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে সে একবার ছুটতে আরম্ভ করলেই গুলি করব। ঢিবির ওধারে পাহাড়ের দেয়াল আরম্ভ হয়েছে, সুতরাং সেদিকে তার যাবার উপায় নেই।

কিন্তু ঢিবির অত্যন্ত কাছে এসেও জানোয়ারটার নড়বার কোনো লক্ষণ না দেখে অবাক হয়ে গেলাম। অত্যন্ত সন্তর্পণে আমি এবার টর্চ নিভিয়ে ঢিবির অপরদিকে পা টিপে টিপে গিয়ে হঠাৎ টর্চটা আবার জ্বেলে ফেললাম। কিন্তু না শোনা গেল দ্রুত পলায়নের শব্দ, না দেখা গেল গুরাল বা কোনো রকম প্রাণী। সামনের পাহাড়ে সঙ্কীর্ণ একটা গুহা শুধু ভয়ঙ্কর কোনো প্রাণীর মত মুখব্যাদান করে আছে।

pathagar.net

মাত্র দু' সেকেন্ড বোধ হয় আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপরেই আমার মাথার ভেতর দিয়ে লাওচেনের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেকার আলাপের কথাগুলো বিদ্যুতের মত খেলে গেল।

সামনের গুহামুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। বিশেষ গভীর বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় না। মুখের ফাঁকটা বেশ ছোটই বলতে হবে। সাধারণ আকারের মানুষকে মাথা নীচু করে খুব হেঁট হয়েই তার ভেতর ঢুকতে হয়। কিন্তু তবু সেটা পরীক্ষা না করে ফেরা উচিত হবে বলে মনে হল না। অন্তত গুরালটির অন্তর্ধান-রহস্যের মীমাংসা যে সেই গুহার মধ্যেই হবে, এ বিষয়ে আমার তখন কোনো সন্দেহ ছিল না।

টর্চের আলো ভেতরে ফেলে হেঁট হয়ে তার ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। অনবরত মাথা নীচু করে যাওয়া বেশ কষ্টকর। আমার টর্চের আলোয় ভয় পেয়ে অসংখ্য চামচিকে ঝটপট করতে করতে চারিধারে উড়ে বেড়াচ্ছে। গুহাতে হিংস্র কোনো প্রাণীও থাকতে পারে। তবু সামান্য কয়েক পা যাবার পরই গুহা-পথ একদিকে বেঁকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়তন বিস্তৃত হতে দেখে, উৎসাহে কোনো বিপদের কথাই আর মনে রইল না।

এবারে আমার মনে কোনো সন্দেহই আর নেই। আশ্চর্যভাবে দারুদের রাজ্যের গোপন পথই যে আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি।

কিন্তু কতদূর এই পথ ধরে একলা যাব। পথ যখন আবিষ্কৃত হয়েছে তখন কাল সদলবলে এসে তা অনুসরণ করলেই চলবে। আপাতত ফিরে গিয়ে লাওচেনকে এ সংবাদ দেওয়া দরকার। গুহাপথ যেরকম নানা শাখায় জায়গায় জায়গায় বিভক্ত হয়ে গেছে, তাতে বেশীদূর এগুলে হয়ত ফেরবার সময় পথ ভুলও হতে পারে।

এই সমস্ত ভেবে পিছু ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময় সামনের একটি শাখা পথ থেকে সেই গুরালটি দ্রুত বেগে বেরিয়ে আমার একেবারে সামনে ভীতভাবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েই আবার লাফ দিয়ে পালাতে উদ্যত হল। তার সঙ্গে কি কুক্ষণে যে দেখা হয়েছিল তখন যদি জানতাম। দেখবামাত্র হাতের পিস্তলের গুলি যেন আপনা থেকে ছুটে গেল এবং সেই সঙ্গে বুঝতে পারলাম নিজের নির্বুদ্ধিতায় কি সর্বনাশ নিজের করেছি।

পিস্তল নয়, মনে হল যেন একেবারে আমার মাথার ওপর অনেকগুলি বজ্রপাত হয়েছে। সেই সঙ্কীর্ণ বহুদূর বিস্তৃত গুহাপথে পিস্তলের আওয়াজ যে কি ভয়ঙ্করভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল তার বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু শুধু আওয়াজ হলেও রক্ষা ছিল। পিস্তলের আওয়াজে কেঁপে উঠে সমস্ত পাহাড়ই যেন দুলে উঠল। তারপর যা আরম্ভ হল তাকে প্রলয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

পিস্তলের শব্দের এত বড় শক্তি আগে কখনো কল্পনা করিনি। গুহাপথের ওপরের ছাদে বহু আলগা পাথর নিশ্চয়ই ছিল। হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজে কেঁপে উঠে সেগুলি ভয়ঙ্কর শব্দে পড়তে আরম্ভ করল। সেই ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে খানিকক্ষণ বোধ হয় মাথার ঠিক ছিল না!

pathagar.net

অনেকক্ষণ বাদে পাথর পড়া বন্ধ হবার পর স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি যেন ফিরে পেলাম। দু'এক জায়গায় পাথরের কুচিতে শরীর ক্ষত হলেও মাথাটা কেমন করে বেঁচে গেছল বলতে পারি না। কিন্তু ধূলো-বালি-পড়া চোখ রগড়ে, আতঙ্কের আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে যখন টর্চটা জ্বেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, তখন বুঝতে পারলাম মাথাটা গুঁড়ো হয়ে গেলেই এর চেয়ে ভালো ছিল। দেখলাম, বড় বড় পাথরের চাঁই পড়ে আমার দু'ধারের পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। এই অজানা পাহাড়ের গুহাপথে নিজের নির্বুদ্ধিতায় আমি আমার জীবন্ত সমাধি রচনা করেছি।

পিস্তলটা ডান হাত থেকে একটা আলগা পাথরের ঘায়ে ছিটকে পড়ে হারিয়ে গেলেও টর্চটা কেমন করে থেকে গেছল। সেই টর্চের আলো ফেলে উন্মত্তের মত আমি চারিদিক পরীক্ষা করে দেখলাম। না, পথ কোথাও নেই; সামনে পেছনে দু-দিকেই আমার রাস্তা একেবারে পাথর দিয়ে গেঁথে যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আলগা পাথর সব জায়গাতেই খসে পড়েছে। ওপরের গুহার ছাদ এখানে সাধারণত যে রকম উঁচু, তাতে সে রকম পাথর ছ-সাত হাত উঁচু ঢিবি হয়ে পড়লেও আমি অনায়াসে তার ওপর দিয়ে টপকে যেতে পারতাম, কিন্তু সামনে ও পেছনে দুটি বাঁকের মুখে সুড়ঙ্গের ছাদ যেখানে অত্যন্ত নীচু হয়ে এসেছে, সেইখানেই বড় বড় পাথর ওপর থেকে ধ্বসে পড়ায় সামান্য একটা ইঁদুর গলবার রাস্তাও বুঝি আর ছিল না।

প্রথমটা আমি বিপদে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেও একেবারে আশা ছাড়িনি। ভেবেছিলাম, পাথরগুলিকে একটু-আধটু নড়িয়ে বেরুবার পথ বোধ হয় আমি করে নিতে পারব। প্রথমে তাঁবুতে ফিরে যাবার পথ যে পাথরের স্তূপে বন্ধ হয়ে গেছল, সেগুলিকে আমি নড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। সেদিকে গুহার একটা বড় অংশই ধ্বসে পড়েছে। অসুরের মত শক্তি নিয়ে জনদশেক লোকও সে পাথর নড়াতে পারে কি না সন্দেহ। পেছনে ফিরবার উপায় না দেখে এবার আমি সামনের দিকেই বেরুবার পথ বার করবার চেষ্টা করলাম। সেদিকে পাথরগুলি তেমন বড় নয়। একটার পর আর একটা যেমন-তেমনভাবে পড়ায় মাঝে মাঝে তার ফাঁকও দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু সেখানেও খানিকক্ষণ ব্যর্থ পরিশ্রমের পর আমি গলদঘর্ম হয়ে উঠলাম, শুধু ক্লান্তিতে নয়, ভয়ঙ্কর আতঙ্কে। সত্যিই যে আমার আর বেরুবার উপায় নেই এই জীবন্ত সমাধি থেকে! এদিকের পাথরগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট হলে কি হয়, আমার মত একজন লোকের পক্ষে তাদের সরান অসম্ভব। লোহার শাবলের মত কোনো অস্ত্র থাকলেও হয়ত কিছু আশা ছিল। কিন্তু শুধু হাতে কিছুই করবার জো নেই। ক্ষতবিক্ষত হাত নিয়ে দারুণ হতাশায় ও ক্লান্তিতে আমি এবার সেইখানেই বসে পড়লাম। পাহাড়ের এই গোপন সুড়ঙ্গপথে এরকমভাবে বন্দী হবার পরিণাম যে কি তা আমি ভালো রকমই জানি। সঙ্গে কোনো রকম খাবার, এমনকি জল পর্যন্ত নেই। মৃত্যুর সঙ্গে বেশী দিন যুঝতে আমায় হবে না এবং তারপর আমার কঙ্কাল পর্যন্ত চিরদিন এ পাহাড়ের ভেতর মানুষের দৃষ্টির আড়ালে পচতে থাকবে।

আমার হতাশা তখন এমন গভীর যে, পিস্তলটা সঙ্গে থাকলে, অনাহারে দীর্ঘ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে শ্রেয় মনে করে আমি হয়ত আত্মহত্যাই করতে পারতাম। কিন্তু পিস্তলটা

pathagar.net

কোথায় যে ঠিকরে পড়ে পাথর ও বালির আবর্জনায় চাপা পড়েছিল খানিক আগে টর্চ জ্বেলে চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। টর্চের আলো বেশী খরচ করতেও ভয় হচ্ছিল। ওই আলোটুকুই আমার ভরসা। এই গুহায় এই নিদারুণ অন্ধকারে আলোটুকুর সান্ত্বনা না থাকলে আমি বোধ হয় খানিকক্ষণের মধ্যে উন্মাদ হয়ে যেতাম। নেহাত প্রয়োজন না হলে এবং মাঝে মাঝে নিজেকে আশ্বস্ত করবার জন্যে ছাড়া, টর্চটা আমি ব্যবহার করব না ঠিক করেছিলাম। ওপর দিকে আলো ফেলে এর মধ্যে একবার আমি সেদিকে কোথাও কোনো বেরুবার পথ আছে কি না খুঁজে দেখেছি। গুহার ছাদ মাঝামাঝি জায়গায় বেশ উঁচু। আমার জোরালো টর্চের আলোও সেখানে ভালো পৌঁছায় না, নীচে থেকে মনে হয় ছাদ সেখানে যেন নেই, অন্ধকার রাত্রের আকাশই দেখা যাচ্ছে। খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে কালো পাথরের এবড়ো-খেবড়ো চেহারা অস্পষ্ট দেখা যায়। যাই হোক, সেখানে অসংখ্য উড়ন্ত চামচিকে ছাড়া কোনো ফোকর আমি দেখতে পেলাম না।

ক্লান্ত হতাশভাবে কতক্ষণ আমি বসেছিলাম বলতে পারি না। এই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের ভেতর সময়ের কোনো হিসাব রাখা অসম্ভব। দিন রাত্রি এখানে নেই, নিজের বুকের স্পন্দন ছাড়া আর কোনো কিছুর দ্বারা সময় যে বইছে তা এখানে জানা যায় না। ক্লান্তিতে, হতাশায় চোখও আমার বুজে এসেছিল। মনে হচ্ছিল মৃত্যুই যদি হয় তবে ঘুমের মধ্যে অচেতন অবস্থায় তা হওয়াই ভাল।

হঠাৎ আমি চমকে চোখ খুলে তাকালাম! আমার নিজের স্পন্দন শুধু নয়, আরও একটা কি মৃদু শব্দ আমি যেন শুনতে পেয়েছি। ওপরে চামচিকেদের পাখার শব্দও সে নয়। কিন্তু সে শব্দ আমার অত্যন্ত কাছে।

চোখ খুলে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আতঙ্কে। গুহার মেঝের ওপর নীলাভ কয়েকটা আলো যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্ধকারে।

সত্যিই কি আমার মাথা এর মধ্যেই খারাপ হয়ে গেছে! আমি নিজের চুল ধরে মাথাটাকে ঝাঁকি দিয়ে উঠে বসলাম। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে পাথরের মেঝের সেই সমস্ত আলো গুহাপথের ধারের ছোট একটি ফাটলের ভেতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমূঢ়ভাবে আমি এবার টর্চটা জ্বাললাম। আতঙ্কে গলা শুকিয়ে আমার কাঠ হয়ে গেছে। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। আমার গুলিতে নিহত গুরালটির মৃতদেহটা শুধু পাথরগুলির ভেতর পড়ে আছে।

সত্যিই কি তাহলে এদেশের লোকেরা যাকে 'নাট' বলে সেই প্রেতমূর্তি আমি দেখেছি। এই বিপদের মাঝেও আমার হাসি পেল। ওসব কোনও 'নাট' বা ভূতে আমি বিশ্বাস করি না। না, বিপদ যত বড় হোক এ রকম কুসংস্কারের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। আমায় যেমন করে হোক মাথা ঠিক রাখতে হবে।

কিন্তু আলোটাই বা তা হলে কিসের? আমি টর্চটা নিভিয়ে আবার রুদ্ধশ্বাসে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ কোনো কিছুই দেখা গেল না, কোনো সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না। তারপর হঠাৎ গুহাপথের দেয়ালের একটা ফোকরে সেই

pathagar.net

আলো দেখা গেল। একটি দুটি করে অনেকগুলি আলো সেখান থেকে বেরিয়ে এসে গুরালটার মৃতদেহের চারিধারেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মনকে শক্ত করবার চেষ্টা সত্ত্বেও আমার সমস্ত গা শিউরে উঠল। তৎক্ষণাৎ টর্চের বোতাম টিপে দিলাম।

আশ্চর্য! টর্চের আলো পড়তেই আলোর বদলে গোটাকতক ধেড়ে ইঁদুর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে সেই ফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ধেড়ে ইঁদুর দেখে আশ্বস্ত হওয়া দূরে থাক, বিস্ময়ই কিন্তু আমার বেড়ে গেল। অন্ধকারে ইঁদুরের গা থেকে আলো বেরোয় এ কথা ত কখনো শুনিনি। টর্চটা নিয়ে আমি ইঁদুরদের ফোকরটার দিকে এগিয়ে এলাম। ফোকরটা বেশ বড়। মেঝের ওপর উপুড় হয়ে তার ভেতরে আলো ফেলে দেখলাম সেটা নীচের দিকে নেমে যায়নি, সামনের দিকেই অনেক দূর সোজা চলে গিয়েছে। আর একবার যদি সে ইঁদুরগুলি আসে সেই আশায় একটা পাথর হাতে নিয়ে সেই ফোকরের ধারে এবার অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার নিজের যে জীবন্ত কবর হয়েছে সে বিপদের কথা এই নতুন রহস্যের মীমাংসা করবার উত্তেজনায় তখন আর মনে নেই।

আমার গন্ধ পেয়ে, কিম্বা যে কোনো রকমে আমার উপস্থিতি টের পাবার দরুন, ইঁদুরগুলির কিন্তু এদিকে বেরুবার আর উৎসাহ দেখা গেল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি আবার টর্চ জ্বালতে যাচ্ছি এমন সময় স্পষ্ট মানুষের পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম।

এখানে মানুষের পায়ের শব্দ! প্রথমটা অবাক হলেও আমার বুঝতে দেরী হল না যে, ফোকরের ওধারে আর একটি গুহাপথ, আমি যে সুড়ঙ্গটিতে আছি তারই গা ঘেঁষে গেছে। মাঝখানে সামান্য খানিকটা পাথরের ব্যবধান।

মানুষের পায়ের শব্দ শুনে প্রথমটা আমি মুক্তি পাবার আশায় তাদের ডাকতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সে আহ্বান আমার মুখ দিয়ে বেরুল না। মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ফোকর দিয়ে আমি অপর দিকে লক্ষ রেখেছিলাম। পায়ের শব্দ সেই ফোকরের কাছে আসার সঙ্গে—নীলচে আলোয় সেখানকার অন্ধকার দূর হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম, অপরদিকের পথ দিয়ে যারা পার হয়ে যাচ্ছে তাদের সকলের পা দিয়ে অদ্ভুত এক রকম নীলচে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

এবার সত্যি আমার মনে হল আমি আর প্রকৃতিস্থ নেই। ভয়ঙ্কর বিপদে কেমন করে যেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। প্রথমে ইঁদুরের গা দিয়ে এবং তারপর মানুষের পা থেকে আলো বেরুতে দেখার এ ছাড়া আর কোনো মানে হতে পারে না। স্বাভাবিক বুদ্ধিতে আমি জানি এ ব্যাপার কখনো সম্ভব হতে পারে না। এ নিশ্চয় আমার উন্মত্ত মস্তিষ্কের দুঃস্বপ্ন।

নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভয়ে আমি অস্ফুট চীৎকার করে উঠলাম। এবং সেই চীৎকারের ফলেই আশ্চর্যভাবে আমার মুক্তির উপায় হয়ে গেল।

pathagar.net

কাল্পনিক বা বাস্তব প্রাণী—যাই হোক, আমার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই ওধারে যারা যাচ্ছিল তারা থেমে পড়ল। ফোকরের ভেতর দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, অনেকগুলি খালি লম্বা লম্বা পা সেখানে তাদের নিজেদের আলোতেই দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার ফোকরের ধারের পাথরে লোহার শাবলের মত কোনো অস্ত্রের ঘা শুনতে পেলাম, বুঝলাম তারা পাথর সরিয়ে এ ধারের আওয়াজের কারণ জানবার চেষ্টা করছে। তাদের উত্তেজিত কথাবার্তাও আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। যদিও তার একবর্ণও আমার বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। আমার জানিত কোনও ভাষার সঙ্গেই তার সাদৃশ্য নেই।

না, কাল্পনিক প্রাণী এরা নয়। কিন্তু এরা কে? এদের হাতে পড়লে আরো বিপন্ন হব না, তারই বা নিশ্চয়তা কি? তাদের অস্ত্রের ঘায়ে ফাটলের ধারের একটা পাথর ক্রমশ আলগা হয়ে আসছিল। সে পাথরটা সরে গেলে তাদের পক্ষে এগিয়ে আসা আর শক্ত হবে না জেনে আমি কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারলাম না। পাথরটা আলগা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয়ও বাড়ছিল।

একবার হঠাৎ তাদের শাবলটা পাথর থেকে ফসকে কেমন করে এধারে এসে পড়ল এবং সেই মুহূর্তেই কিছু না ভেবেই আমি সেটা সবলে চেপে ধরলাম। তারপর একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই শাবলটা আমার কবলে এসে পড়ল। ওধারে যে শাবল চালাচ্ছিল, সে এরকম ব্যাপারের জন্যে নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিল না। জোর করে শাবলটা টেনে রাখবার সময়ই পায়নি সে।

ওধারে তাদের চেঁচামেচি শুনে বোঝা যাচ্ছিল, তারা যেমন বিমূঢ় তেমনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের কাছে আর কোনো অস্ত্র বোধ হয় ছিল না। অন্ততঃ আর পাথরের ওপর কোনো ঘা শোনা গেল না।

শাবলটা কেড়ে নেবার সময় সত্যিই আমি নিজের মুক্তির কথা কিছু ভাবি নি। তাদের এদিকে আসতে না দেবার উদ্দেশ্যেই আমি সেটা কেড়ে নিয়েছিলাম। এতক্ষণে আমার মনে হল এই শাবল দিয়েই ত আমার পথ পরিষ্কার করতে পারি আমি।

একথা মনে হবার পর আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করা যায় না। ওধারের লোকেরা এর পর কি করবে কে জানে! যেমন করে হোক আমায় এখান থেকে বেরুতেই হবে।

পেছনে ফেরার পথ একেবারেই বন্ধ। তাই সামনের দিকে পাথরগুলির ফাটলের ভেতর শাবল চালিয়ে আমি প্রাণপণে এক জায়গায় চাড় দিলাম। শাবল হাতে পড়ায়, উৎসাহের সঙ্গে আমার শক্তিও বুঝি বেড়েছিল। দেখতে দেখতে বেশ বড় একটা পাথর সরে সশব্দে অপর দিকে পড়ে গেল। পথ তাতে একেবারে পরিষ্কার হল না বটে, কিন্তু আগেকার দুর্ভেদ্য দেয়ালে যে ফোকর হল, তার ফলে দেখা গেল তার ভেতর দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে আমার মত চেহারার লোক গলে যেতে পারে। শাবলটা প্রথমে ওধারে ফেলে আমি টর্চটা নিয়ে সেই ফোকরের ভেতর দিয়ে কোনো রকমে হাত-পা একটু-আধটু ক্ষতবিক্ষত করে অপর দিকে গিয়ে পড়লাম।

pathagar.net

সুড়ঙ্গপথ এখান থেকে বাঁক নিয়ে কোথায় যে গিয়েছে আমি জানি না। হয়ত শাবল যাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি তাদের কাছে গিয়েই আবার পড়তে পারি। কিন্তু আমার তখন তা নিয়ে ভাববার সময় নেই। এগিয়ে আমায় যেতেই হবে।

মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পথটা একটু দেখে নিয়ে আমি বেশীর ভাগ অন্ধকারের ভেতরেই ছুটতে লাগলাম! সুড়ঙ্গপথের অনেক শাখা, অনেক বাঁক। সবসুদ্ধ একটা গোলক ধাঁধার মত। কিন্তু আমি ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে যখন যেটা উচিত মনে হচ্ছিল, সেইটেই অনুসরণ করছিলাম। কোনো রকমে এই দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাময় পাহাড় থেকে আমায় বেরুতেই হবে।

কিছুক্ষণ ধরে আমার পায়ের শব্দ ছাড়া আর একটা আওয়াজ মাঝে মাঝে কানে আসছিল। আওয়াজটা অনেকটা ক্ষুব্ধ গর্জনের মত, কিন্তু কোনো প্রাণীর গলা থেকে নিরবচ্ছিন্ন অমন গর্জন বার হওয়া সম্ভব নয়; তাছাড়া আওয়াজটা আমার এগুবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমানভাবে বাড়ছিল।

খানিক বাদে একটা বাঁক ফিরতেই আওয়াজটার মানে বোঝা গেল। কিন্তু সেই সূত্রে এমন অপরূপ দৃশ্য দেখবার কল্পনা আমি করিনি।

সুড়ঙ্গপথ বাঁক নিয়েই যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে পাহাড়ের ভেতরটা কেটে কারা যেন বিশাল এক হল তৈরি করেছে মনে হল। মাঝখানে তার পাথরের মেঝের বদলে প্রকাণ্ড এক জলের কুণ্ড। পাহাড়ের এক ধারের একটি গহ্বর থেকে প্রচণ্ড বেগে জল এসে সে কুণ্ডে পড়ছে। এতক্ষণ এই জলের কল্লোলই আমি শুনেছিলাম। কিন্তু এই জলের কুণ্ড ও প্রপাতের চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল এখানকার অদ্ভুত এক নীলাভ আলো। পাহাড়ের গা বেয়ে মোটা পেশীর মত মিশকালো এক রকম পাথব জলপ্রপাতের মুখ থেকে কুণ্ডের ভেতর নেমে গিয়েছে। কুণ্ডের ধারে ধারে অন্য দিকেও সে রকম পাথর আছে। অন্ধকারে সেই পাথরগুলিই যেন জ্বলছে মনে হচ্ছিল।

নিজের বিপদ ভুলে এ দৃশ্য হয়ত আরো খানিকটা আমি দেখতাম, কিন্তু সহসা কুণ্ডের ওপারে দৃষ্টি পড়ায় চমকে উঠলাম। আমি যেটি দিয়ে পৌঁছেছি সেটি ছাড়া আরো অনেক সুড়ঙ্গ নানা দিক থেকে কুণ্ডটিতে এসে মিলেছে। ওপারের তেমনি একটি সুড়ঙ্গপথের শেষে জলের ধারে দুটি লোক দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ অন্যান্য দিকে দৃষ্টি থাকাতেই তাদের চোখে পড়েনি। তাদের একজন আমার দিকে পেছন ফিরে নীচু হয়ে কি করছিল, কিন্তু যে লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল, অস্পষ্ট আলোতেও তাকে চিনতে আমার বিলম্ব হল না। সে লি-সিন।

নিঃশব্দে তৎক্ষণাৎ আমি সেখান থেকে সরে পড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। হঠাৎ লি-সিন মুখ তুলে আমার দিকে তাকালে এবং সেই সঙ্গে তার কণ্ঠ থেকে যে চীৎকার বেরুল, জলের কল্লোলে খানিকটা চাপা পড়লেও তা ঠিক আদরের ডাক বলে মনে হল না আমার।

pathagar.net

পেছন ফিরে পালাবার জন্যে দৌড় দিলাম, কিন্তু সেদিকেও বেশীদূর এগুতে হল না।

সামনে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে অসংখ্য উজ্জ্বল কঙ্কাল আমার দিকে এগিয়ে আসছে! কঙ্কালগুলির ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত নীলচে আলোয় সুড়ঙ্গপথ এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে যে ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না।

আমার তখনকার অবস্থাটা বর্ণনা করাও শক্ত। পেছনে আমার বিশাল জলের কুণ্ড ও তার ওপারে পরম শত্রু লি-সিন, আর সামনে রহস্যময় উজ্জ্বল সব কঙ্কালের সারি!

সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে বেছে নেবার উপায় থাকলে আমি বোধ হয় অজানা জলের কুণ্ড ও লি-সিনের সঙ্গে সাক্ষাতের বিপদই পছন্দ করতাম এই ভূতুড়ে কঙ্কালদের সংসর্গের চেয়ে। কিন্তু তখন আর সময় নেই। রহস্যময় কঙ্কালগুলি তখন একেবারে আমার কাছে এসে পড়েছে।

হতভম্ব হয়েই আমি বোধহয় কিছু করবার খুঁজে না পেয়ে, টর্চটা টিপে দিলাম। মুহূর্তে যেন ভোজবাজিতে সেই উজ্জ্বল কঙ্কালের সার মিলিয়ে গেল। তার জায়গায় টর্চের আলোয় দেখা গেল গুহাপথে অদ্ভুত এক জাতের অসংখ্য মানুষের সারি। এদেরই দেহের সমস্ত হাড় থেকে অন্ধকারে এমন অদ্ভুত আলো এতক্ষণ বেরুচ্ছিল। আকারে তারা নিতান্ত ছোট। চার *ফুট সাড়ে চার ফুটের বেশী লম্বা তাদের ভেতর কেউ নেই। একলা এরকম গোটা-দশেক* মানুষকে কাবু করেও আমি বোধহয় বেরিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তারা গোটা-দশেক ত নয়, অমন দু-শ লোক গুহাপথ ও তার পরের রাস্তায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা নিরস্ত্রও নয়, অনেকেরই হাতে ছোট বল্লম ও তীর-ধনুক দেখা গেল। কয়েকজনের হাতে কলসীর মত একরকম মাটির পাত্রও রয়েছে।

আমাকে দেখতে পাওয়া মাত্র তারা সকলে মিলে উন্মত্ত চীৎকার করে উঠল। আমার পরিণাম যে এই উন্মত্ত জনতার হাতে কি হবে, তা তখন বুঝতে আমার বাকী নেই, তবু মরবার আগে অন্ততঃ কাপুরুষের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকব না সঙ্কল্প করে আমি তখন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছি! আমার গায়ে প্রথম যে আঘাত করবে শুধু হাতেই অন্ততঃ তাকে আমি সাবাড় করে তবে ছাড়ব।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমায় আক্রমণ বা অস্ত্র দিয়ে আঘাত তারা কেউ করলে না! চারিদিক থেকে এসে তারা আমায় ঘিরে দাঁড়াল। হাতে তাদের উদ্যত বল্লম, আর বাগিয়ে ধরা তীর-ধনুক দেখে বুঝতে পারলাম আমায় না মেরে বন্দী করাই তাদের উদ্দেশ্য। সে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা আপাততঃ নিষ্ফল জেনেই আমিও কোনোরকম প্রতিবাদ করলাম না।

আমাকে মাঝখানে রেখে, এবার তারা সামনের দিকেই এগিয়ে চলল। নিজেদের মধ্যে আমার অবোধ্য ভাষায়, উত্তেজিতভাবে কি আলোচনা করতে করতে কুণ্ডের সামনে গিয়েই তারা থামল। চেয়ে দেখলাম লি-সিন বা তার সঙ্গীর কোনো চিহ্ন ওপারে নেই। বিপদ বুঝেই হোক বা অন্য যে কোনো কারণে তারা একেবারে গা ঢাকা দিয়েছে।

যে অদ্ভুত জাতের মানুষের ভেতর আমি পড়েছিলাম তাদের সম্বন্ধে ভাববার মত মনের অবস্থা এতক্ষণে আমার হয়েছে। কিন্তু ভেবে কোনো কূল কিনারাও পাচ্ছিলাম না। তাদের

বামনের মত আকৃতি দেখে, দারু বলেই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু দারুদের হাড়ের ভেতর থেকে এ রকম অদ্ভুত আলো বার হবার কথা ত কখনো শুনিনি। এ আলোর অর্থই বা কি? এই রহস্যময় আলোর কথা ভাবতে গেলে সত্যিই সমস্ত ব্যাপারটা এমন আজগুবি হয়ে ওঠে যে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। সমস্ত ব্যাপারটা মনে হয় ভৌতিক। কোনো স্বাভাবিক ব্যাখ্যাই তার খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমার মনে হচ্ছিল জাগ্রত অবস্থাতেই আমি যেন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখছি। তারা আমায় বন্দী করার পরই আমি টর্চটা নিভিয়ে ফেলেছিলাম। তারাও কি কারণে বলা যায় না আমার হাত থেকে সেটা কেড়ে নেয়নি বা নিতে সাহস করেনি। টর্চ নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মূর্তিগুলি আবার উজ্জ্বল কঙ্কালে পরিণত হয়ে গেছল। অন্ধকার অজানা গুহাপথে চারিধারে সেই অগ্নিময় কঙ্কালে বেষ্টিত হয়ে থাকা যে কি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা তা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। বেশীক্ষণ এই সংসর্গে থাকলে মনে হচ্ছিল, আমার মস্তিষ্ক এতক্ষণে যদি না হয়ে থাকে, তা হলে এবার সত্যিই বিকৃত হয়ে যাবে!

তারা আপাততঃ কুণ্ডের কাছে থেমে যা করছিল তাও অদ্ভুত। সেটা তাদের ধর্মের যে একরকম অনুষ্ঠান এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথমে সকলের কণ্ঠ থেকে অদ্ভুত একরকম কাঁদুনির মত গান শোনা গেল। তারপর এক এক করে কয়েকটি লোক—কলসীর মত যে মাটির পাত্র তাদের হাতে দেখেছিলাম, তাই মাথায় করে কুণ্ডের ভেতর নেমে গেল। সে কলসীতে কুণ্ডের জল ভরে যখন তারা উঠে এল, তখন সমবেত সকলে মাটির ওপর সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে আবার সেই কাঁদুনির মত গান শুরু করেছে। আমি প্রথমটা কিছু বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়েই ছিলাম, কিন্তু তারা কয়েকজন মিলে আমায় একরকম জোর করেই মাটিতে শুইয়ে দিলে। কলসী মাথায় করে উজ্জ্বল কঙ্কালগুলি আমাকে যেমন ইচ্ছে মাড়িয়ে একেবারে এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ আর উঠল না, গানও থামল না।

এবার ফিরে চলার পালা। পাহাড়ের সুড়ঙ্গপথের গলির পর গলি পার হয়ে তারা যে আমায় কোথায় নিয়ে চলছিল, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না! আচ্ছন্নের মত তাদের সঙ্গে যেতে যেতে এক সময়ে শুধু মনে হল, কঙ্কালগুলির আলো যেন ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে। তার কারণ বুঝতেও দেরী হল না। সুড়ঙ্গপথ এইবার নিশ্চয় কোনো খোলা জায়গায় শেষ হতে চলেছে। বাইরের আলো ভেতরে এসে পড়ার ফলেই কঙ্কালগুলি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গিয়ে মানুষের আকৃতি পেয়ে গেল।

গুহাপথ থেকে তখন আমরা বাইরে বেরিয়ে এসেছি। ভোরের আলোয় সামনে অপরিচিত পাহাড় জঙ্গলের দেশ দেখা যাচ্ছে। নানারকম উত্তেজনায় পাহাড়ের ভেতর সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় গোটা রাত যে আমার কেটে গেছে, এতক্ষণে সে খেয়াল হয় নি।

লাওচেন পাহাড় পেরিয়ে যেখানে পৌঁছাতে চেয়েছিল, এই যে দারুদের সেই গোপন দেশ, এ বিষয়ে আর আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এভাবে এখানে পৌঁছাতে ত আমি চাইনি। আমার সম্বন্ধে এদের যে কি মতলব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আপাততঃ অদূরের একটা ছোট পাহাড়ের দিকেই তারা আমায় নিয়ে চলেছিল। পাহাড় না

বলে তাকে বড় পাথরের ঢিবি বলাই উচিত। কলকাতার মনুমেন্টের চেয়ে তার চূড়ো বেশী উঁচু নয়। সেই চূড়োয় কয়েকটা ঘর দেখতে পাচ্ছিলাম।

খানিক বাদে পাহাড় বেয়ে উঠে দেখলাম শক্ত বাঁশ দিয়ে তৈরী সেখানে খুপরি খুপরি অনেকগুলি সারি সারি ঘর সাজান। তারই একটায় আমায় ঠেলে ঢুকিয়ে দেবার আগে আমি সমস্ত জায়গাটা কিন্তু ভালো করে দেখে নিয়েছি। পালাবার সুযোগ খোঁজাই ছিল উদ্দেশ্য, কিন্তু সে সুযোগ সত্যিই সেখানে নেই। আমরা যেদিক দিয়ে উঠেছিলাম সেই দিকটা ঢালু হলেও পেছনের দিকে পাহাড় খাড়াভাবে বহুদূরে নেমে গেছে। আমার ঘরটাও একেবারে সেই খাড়াইয়ের কিনারায়। দারুদের পাহারা শুধু সামনের দিকেই হলেও পেছন দিয়ে নেমে যাবার কোনো আশাই দেখলাম না।

ঘরগুলির মাথায় পাতার ছাওনি দেওয়া। দেওয়ালগুলি শুধু বাঁশের খুঁটিতে তৈরী। তার ভেতর যথেষ্ট ফাঁক আছে। সেই বাঁশের বেড়ার ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম আমার পাশের ঘরগুলিতেও অনেকগুলি লোক পড়ে আছে। তারা দারুদেরই জাতের, কিন্তু অধিকাংশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় তারা একেবারে মৃত্যুর দরজায় এসে পৌঁছেছে। উত্থান শক্তি পর্যন্ত তাদের অনেকের নেই, মাটিতে পড়ে তাদের অনেকেই কাতরাচ্ছে।

তারা কিন্তু আমার মত বন্দী বলে মনে হল না। দারুরা সসম্ভ্রমে এসে তাদের খুপরির সামনে যে রকম সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে যাচ্ছিল, তাতে সেকথা মনে করা শক্ত। রহস্যটা সম্পূর্ণ বুঝতে না পেরে কেমন একটা অজানা আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছিল। গুহাপথের উজ্জ্বল কঙ্কাল থেকে আরম্ভ করে, এই অদ্ভুত জাতের যা কিছু কাণ্ড-কারখানা এ পর্যন্ত দেখেছি, সমস্তই দুর্বোধ্য রহস্যময়। এরা যে আমায় নিয়ে কি করবে কিছুই জানি না, কিন্তু কেমন যেন অনুভব করছিলাম, সে পরিণামের চেয়ে মৃত্যু বুঝি লোভনীয়।

এ আতঙ্ক আর একটি কারণে আরো বেড়ে গেল। অনেকক্ষণ ঘরে পড়ে থাকার পর হঠাৎ একটি লোক কয়েকজনের সঙ্গে বাঁশের আগড় খুলে ভেতরে ঢুকল। সাধারণ দারুদের চেয়ে সে অনেক বেশী লম্বা-চওড়া; দারুদের মধ্যে তাকে দৈত্য বলেই মনে হয়—কিন্তু সেইটেই তার প্রধান বিশেষত্ব নয়। বিশেষত্ব তার মুখ। এখানকার দারুদের অনেকের মুখেই নানারকম রং মাখান, কিন্তু মানুষের মুখ শুধু রঙের ছোপে যে কি ভীষণ হয়ে উঠতে পারে এই লোকটিকে না দেখে বোঝা যায় না। লোকটা আমার কাছে এসে অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপর হঠাৎ আমায় সবলে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলে। সে মুহূর্তে তার রং করা পৈশাচিক মুখে সবলে একটা ঘুঁষি মারবার লোভ আমি যে কি করে সম্বরণ করেছিলাম বলতে পারি না। লোকটা শুধু আমায় দাঁড় করিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হল না, এতক্ষণ কেউ যা করেনি তাই সে করে বসল। হঠাৎ আমার হাত থেকে টর্চটা ছিনিয়ে নিয়ে সে আমায় সবলে একটা ধাক্কা দিলে। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে আমি পড়ে গেছিলাম। উঠে তার দিকে উন্মত্তভাবে ছুটে যাবার আগেই আর সকলের সঙ্গে বাইরে

বেরিয়ে সে আগড় বন্ধ করে দিলে। তার সেই মুহূর্তের হাসি কোনোদিন ভুলবার নয়। সে হাসি ভয়ঙ্কর কি না আমি বলতে পারি না, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল অমন অদ্ভুত হাসি মানুষের কণ্ঠ থেকে যেন বেরুতে পারে না।

এর পরেও কয়েকবার আমার ঘরের সামনে দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইতে চাইতে তাকে যাতায়াত করতে দেখেছিলাম, কিন্তু তখনো বুঝতে পারিনি আমার ভাগ্যের উপর কতখানি হাত তার আছে।

বুঝতে পারলাম রাত হবার পর। সারাদিন অনাহারের পর আমার মাথা তখন ঝিম ঝিম করছে। তারই ভেতর অবাক হয়ে দেখলাম আমার পাশের সমস্ত ঘরে মানুষ আর নেই। কিছু উজ্জ্বল কঙ্কাল শুধু পড়ে আছে সারি সারি। গুহাপথের অন্ধকারে যে সব কঙ্কাল দেখেছিলাম তার চেয়েও এদের জ্যোতি অনেক বেশী প্রখর। মনে হয় যেন জ্বলন্ত ইস্পাত দিয়ে সেগুলি তৈরী!

বাইরে অন্ধকারে অনেক লোকের হট্টগোল শুনতে পাচ্ছিলাম। খানিক বাদে একটা মশাল সেখানে জ্বলে উঠল। দেখলাম পাহাড়ের খাড়াইয়ের ঠিক সামনেই একটা প্রকাণ্ড মোটা খুঁটি পোঁতা। তার সামনে বেদীর মত খানিকটা উঁচু জায়গায় মশালের আলোয় অনেকগুলি দারুকে দেখা গেল। তাদের চারিধারে খানিকটা দূরত্ব রেখে আরো অসংখ্য দারু দাঁড়িয়ে আছে। মশালের রাঙা অস্পষ্ট আলোয় তাদের দেখাচ্ছে অদ্ভুত।

কোনো পৈশাচিক অনুষ্ঠানের জন্যে যে তারা প্রস্তুত হচ্ছে তা বোঝা কঠিন নয়। যখন কয়েকজন মিলে উদ্যত বল্লম হাতে এসে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সেই বেদীতে দাঁড় করিয়ে দিলে তখন একথাও বুঝলাম যে আমিই সেই অনুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ।

কিন্তু কি সে অনুষ্ঠান? রক্তাক্ত যুপকাষ্ঠ বা খড়্গ নয়, উত্তপ্ত তেলের কড়াইও নয়! সাধারণত যেসব জিনিস অসভ্য জাতিদের পৈশাচিক ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকে বলে আমরা মনে করি, সে সব কিছুই সেখানে নেই। বেদীর ওপর একটি গর্তের ভেতর মশালটি পোঁতা। একটি কলসী জল ছাড়া বেদীর ওপর আর কোনো জিনিসই নেই। শুধু বেদীর পেছনে খাড়া পাহাড় আর বেদীর ওপর দারুদের সেই রঙমাখা দৈত্যের উপস্থিতি ছাড়া ভয় করবার আমি আর কিছু দেখতে পেলাম না। দারুদের দৈত্যের দৃষ্টি তখনো আমার মুখের ওপর অদ্ভুতভাবে মাঝে মাঝে অনুভব করছিলাম। সে দৃষ্টি দুর্বোধ্য! বুঝতে পারছিলাম না কি এদের মতলব! এরা কি তাহলে এই খাড়া পাহাড় থেকে আমায় নীচে ফেলে দিতে চায়! তাদের নরবলির নীতি কি এই?

বেশীক্ষণ কিন্তু দ্বিধায় থাকতে হবে না মনে হল। অনুষ্ঠান এর মধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। পেছনের খুঁটিতে আমায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে দুজন শীর্ণকায় দারু কি এক রকম শব্দ উচ্চারণ করতে করতে আমার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চারিধারে অসংখ্য দারুও কাঁদুনি সুরে অদ্ভুত এক রকম আবৃত্তি শুরু করে দিলে।

ব্যাপারটা যে এখন একটু একটু আমি বুঝতে পারছি না এমন নয়। এরা আমায় দেবতা হিসাবে পূজা করছে, বলির আগে ছাগলকে যেমন করা হয়। কিন্তু পূজার পর কি হবে? ভীতভাবে আমি একবার পেছনের অতল খাদ ও সামনের সেই দারু-দৈত্যের মুখের দিকে

তাকালাম। আমার পাশে আমাকে পাহারা দেবার জন্যেই যেন সে দাঁড়িয়ে ছিল। সে মুখে কোনো ভাবান্তর নেই—রঙের পৈশাচিকতা ছাড়া।

কিন্তু আমায় ধরে পাহাড় থেকে ফেলে দেবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। খানিকবাদে আবৃত্তি থামতেই কাঠের একটি বাটির মত পাত্রে একজন বুড়ো দারু কলসী থেকে জল ঢেলে সসম্ভ্রমে আমার কাছে নিয়ে এল। সমবেত দারুরা তখন মাটিতে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে আবার নূতন রকম আবৃত্তি আরম্ভ করেছে।

অনুষ্ঠানের শেষে যাই থাক আপাততঃ তার এই অঙ্গটুকুতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। সমস্তদিন নির্জলা উপোসে এবং ভয়ে ভাবনায় আমার গলা তখন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কৃতজ্ঞ হয়েই আমি সে জলের জন্যে হাত বাড়ালাম।...

...আর সেই মুহূর্তেই অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড ঘটে গেল। জলের পাত্র আমি মুখে তুলতে যাচ্ছি, হঠাৎ দৈত্যাকার সেই দারুর প্রকাণ্ড এক চড়ে জলের পাত্র আমার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। আমি বিমূঢ় হয়ে মুখ তুলতে না তুলতেই দেখি বেদীর ওপর থেকে মশালটা উপড়ে নিয়ে সে সজোরে পাহাড়ের ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। উল্কার মত অতল শূন্যে মশালটা অদৃশ্য হতেই রাতের অন্ধকার যেন বন্যার মত আমাদের ওপর নেমে এল। চারিধারে শুধু অসংখ্য উজ্জ্বল কঙ্কালের জ্যোতি।

সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে স্পষ্ট বাংলায় শুনতে পেলাম—"শিগগির দড়ি ধরে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে নেমে যা। পেছনের খুঁটিতে দড়ি বাঁধা আছে।"

সে ভাষা, সে স্বর এমন অপ্রত্যাশিত যে প্রথমটা আমি আরো বিমূঢ় হয়ে একেবারে স্থাণুর মতই দাঁড়িয়ে রইলাম। সব কিছু যেন আমার গুলিয়ে গেছে। ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত যে কথাগুলির সোজা অর্থ যেন আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না।

পর মুহূর্তেই আবার ধমকানি শোনা গেল—"হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নয়। শীগগির নেমে যা।"

এবার আর আমার অসাড়তা রইল না। সত্যিই সময় যে নিতান্ত অল্প। পালাবার এমন সুযোগ পেয়েও কি হারাব! বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে আমি নীচু হয়ে বসে পড়ে অন্ধকারে খুঁটির গোড়ায় হাত দিলাম। সেখানে সত্যিই মোটা একটা দড়ি শক্ত করে বাঁধা রয়েছে। সেই দড়ি ধরে পাহাড়ের ধার থেকে নীচে ঝুলে পড়া তিন সেকেন্ডের কাজ। যদি যথেষ্ট লম্বা হয় তা হলে তা ধরে পাহাড়ের খাড়াইটা যে অনায়াসে নেমে যেতে পারব এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু দড়ি ধরে পাহাড়ে পা ঠেকিয়ে নেমে যেতে যেতে হঠাৎ আমি থেমে গেলাম।

ওপরে এরি মধ্যে উত্তেজিত হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। সমবেত জনতা এতক্ষণে বুঝি প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছে।

চীৎকার করে বললাম—"মামাবাবু, আপনি কি করবেন?"

pathagar.net

অন্ধকারে মামাবাবুর স্বরই যে শুনেছিলাম এ বিষয়ে আমার অবশ্য কোনো সন্দেহ ছিল না। গলার স্বর সম্বন্ধে ভুল করা যদি বা সম্ভব হয় এই অজানা দারুদের দেশে বাংলা যে আর কেউ বলতে পারে না এটা ঠিক।

চারিধারের উত্তেজিত কলরবের ভেতর মামাবাবুর গলা আবার শোনা গেল—"দেরী করে সমস্ত মাটি করলে আহাম্মুখ! আমার জন্যে ভাববার আর সময় পেলে না! আমি তোর পরেই যাচ্ছি, তুই তাড়াতাড়ি নেমে যা।"

বকুনি খেয়ে আমি আর বিলম্ব করতে সাহস করলাম না। দড়ি ধরে পাহাড়ে পা ঠেকিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি নেমে যেতে লাগলাম। কিন্তু মন আমার কিছুতেই আশ্বস্ত হচ্ছিল না।

মামাবাবু যে ওই উত্তেজিত দারুদের ভেতর কতবড় বিপদের মধ্যে আছেন তা বোঝা আমার পক্ষে শক্ত নয়। তাদের হাত ছাড়িয়ে তিনি নেমে আসবার সুযোগ পাবেন কি না কে জানে! এই অবস্থায় শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে নেমে যেতে কিছুতেই আমার মন সরছিল না।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামতে নামতে হঠাৎ ওপরে বন্দুকের শব্দ শুনে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আর একটু হলেই দড়ি থেকে হাত খুলে গিয়ে আমি নীচে পড়ে গিয়েছিলাম আর কি!

কোনো রকমে সে বিপদ সামলে নেবার পর আমি কিন্তু আর নামতে পারলাম না। বন্দুক যখন ছুঁড়তে হয়েছে তখন ব্যাপার কতদূর গড়িয়েছে কে জানে! মামাবাবু একা সমস্ত দারুদের বিরুদ্ধে কি করতে পারবেন! তারা সবাই মিলে শুধু ঠেলেই তাঁকে এই পাহাড় থেকে ত ফেলে দিতে পারে।

কথাটা মনে হতেই আর নিশ্চেষ্ট হয়ে নেমে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। আমি নিজেও নিরস্ত্র। এভাবে একলা মামাবাবুর সাহায্যে গিয়ে কিছু করতে পারব না জেনেও আবার দড়ি ধরে ওপরে না উঠে পারলাম না।

কিন্তু বেশী দূর উঠতে আমায় হল না। হঠাৎ দড়িতে একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। এবং তারপর একটা টর্চের আলো এসে পড়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে!

মামাবাবু ওপর থেকে চীৎকার করে বললেন—"একি! এতক্ষণে এইটুকু নেমেছিস? তাড়াতাড়ি—আরো তাড়াতাড়ি। আমি আসছি।"

টর্চের আলো নিভিয়ে মামাবাবু এইবার নামতে শুরু করলেন। আমার কাছে তিনি না আসা পর্যন্ত কিন্তু আমি থেমেই রইলাম।

মামাবাবু আমার কাছে পৌঁছাবার পর বকুনি দেবার আগেই বললাম—"কিছু বলবেন না, মামাবাবু! আপনাকে বিপদের মধ্যে রেখে একলা নেমে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন বাঁচলে দুজনেই বাঁচব। পাহাড় থেকে পড়ে মরতে হয় দুজনেই মরব।"

"আচ্ছা, খুব বাহাদুরী হয়েছে, এখন তাড়াতাড়ি চলো!"

আমাদের আর কোনো কথাবার্তা অনেকক্ষণ হল না। দুজনে পরস্পর দড়ি ধরে খাড়া পাহাড়ের গায়ে যথাসম্ভব পায়ের ভর দিয়ে নেমে যেতে লাগলাম। কাজটা নিতান্ত সোজা

pathagar.net

যে নয় তা বলাই বাহুল্য। খাড়া পাহাড় কতদূর পর্যন্ত নেমে গেছে কে জানে। ক্রমশই পায়ের ভর দেওয়ার আর সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। হাতের ওপর অসম্ভব ভার পড়ছিল। মোটা ঘাসের দড়িতে হাতের চামড়া যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল। যত এগিয়ে যাচ্ছিলাম ততই মনে হচ্ছিল শেষ যেন আর নেই।

চারিধারে সূচীভেদ্য অন্ধকার। তাতে অবশ্য একটু সুবিধেই হয়েছিল। ওপরের দারুরা আমাদের দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু পাহাড় থেকে কি রকম অবস্থায় ঝুলছি বুঝতে না পেরে অস্বস্তিও হচ্ছিল ভয়ানক।

ওপরে পাহাড়ের ঠিক কিনারে গণ্ডগোল ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাদের দড়িটা প্রচণ্ড বেগে নড়ে উঠল।

থেমে পড়ে ভীতস্বরে বললাম—"ব্যাপার কি?"

মামাবাবু শান্তস্বরে বললেন—"থামিস নি, ওরা দড়িটার কথা এইবার জানতে পেরেছে।"

এই অবস্থায়ও মামাবাবুকে শান্ত থাকতে দেখে সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। নামতে নামতে বললাম—"তা হলে উপায়?"

"উপায় আরো জোরে হাত চালান!"

কিন্তু হাত যে আর চলতে চায় না। মনে হচ্ছিল দড়িটা যেন কেটে হাতের ভেতর বসে যাচ্ছে। সমস্ত বাহু অসাড় হয়ে শরীরের ভার আর যেন বইতে পারছে না।

মামাবাবু হঠাৎ সেই অবস্থায় টর্চটা জ্বেলে ওপরে ফেললেন। পাহাড়ের ধারে অসংখ্য দারু ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে আমাদের দেখবারই বোধ হয় চেষ্টা করছিল। টর্চের আলো দেখেই তারা চীৎকার করে উঠল। কিন্তু সে চীৎকারে নয়, সেখানকার জনতার ভেতর একটা ব্যাপার দেখে আমার সমস্ত শরীর যেন সহসা হিম হয়ে গেল। ভীত উত্তেজিত স্বরে বললাম—"মামাবাবু ওরা কি করছে জানেন?"

"কি?"

"আমাদের দড়ি কাটছে যে!"

টর্চের আলো নিভিয়ে তেমনি শান্তস্বরে মামাবাবু বললেন—"কাটুক, ভয় নেই।"

ভয় নেই! আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললাম—"হ্যাঁ, ভয় আর কি! সমস্ত শরীরটা গুঁড়ো হয়ে যাবে, এই যা! এর চেয়ে ওপরে দাঁড়িয়ে থেকে সসম্মানে যুঝে মরতে পারতাম!"

মামাবাবুর কিন্তু কোনো রকম উত্তেজনা দেখা গেল না। শুধু বললেন—"না, মরতে হবে না, আমরা নীচে না পৌঁছলে ও দড়ি কাটা পড়বে না। একটু হাত চালা।"

হাত চালান ছাড়া আর কি করা যায়। কিন্তু আমি তখন সমস্ত আশা পরিত্যাগ করেছি। মামাবাবুর প্রশান্তিতে শুধু অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হচ্ছিল। বললাম—"কাটা যে পড়বে না তা জানলেন কেমন করে? ওদের ছুরিও কি ভোঁতা?"

"না ভোঁতা নয়, কিন্তু ছুরি চালাচ্ছে মঙপো।"

"মঙপো!"

pathagar.net

"হ্যাঁ, মঙপো! মাথায় দারুদেরই প্রায় সমান বলে তাদের ভেতর থেকে ওকে চেনা যায় না। মঙপো আমার সঙ্গেই ছিল বরাবর।"

আমার মুখ দিয়ে অস্ফুটভাবে বেরুল শুধু—"কিন্তু মঙপো দড়ি কাটছে কেন?"

মামাবাবু সংক্ষেপে শুধু বললেন—"আহাম্মুখ, তা না হলে ওদের কেউ-ই যে কাটত!"

ঠিক দরকারের সময় মঙপো কেমন করে যথাস্থানে এসে উদয় হল, মামাবাবুই বা কেমন করে এমনভাবে এসে আবির্ভূত হলেন, সেই ভয়ঙ্কর রাতের পর তাঁদের কি পরিণাম হয়েছিল, এতদিনই বা কি করছিলেন, এ সমস্ত জানবার কি অদম্য কৌতূহল যে তখন হচ্ছিল তা বোধহয় আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। সমস্ত ব্যাপারটা একটা প্রহেলিকার মত—সত্যি বলে বিশ্বাস করাই যায় না, কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্তি করবার সময় এখন নয়। হাতের মাংস দড়ির ঘর্ষণে কেটে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে, দুটো কাঁধ যন্ত্রণায় মনে হচ্ছিল যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে! সমস্ত দিন অনাহারে থাকবার দরুনই আরো বেশী ক্লান্ত যে হয়ে পড়েছিলাম এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমনভাবে কতক্ষণ আর দড়ি ধরে থাকবার জোর গায়ে থাকবে তা বুঝতে পারছিলাম না। ওপরে মঙপো চালাকী করে উন্মত্ত দারুদেরই বা কতক্ষণ আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। না, এত করেও বুঝি কিছু হল না। সমস্ত হাত অসাড় হয়ে আসছে, হাতের শিথিল মুঠির ভেতর দিয়ে দড়ি যেন পিছলে যাচ্ছে বুঝতে পারছিলাম।

মনের হতাশা মুখ থেকে আপনা থেকেই প্রকাশ পেয়ে গেল।—"আর পারছি না মামাবাবু! হাতে আর সাড় নেই।"

মামাবাবুর উত্তর শুনে কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম। তিনি বললেন—"ছেড়ে দে তা হলে হাত।"

প্রাণের মায়া বড় সামান্য জিনিষ নয়। সত্যিই তখনো আমি প্রাণপণে দড়ি ধরে থাকবারই চেষ্টা করছি। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"ছেড়ে দেব? বাঃ, আপনি বেশ ত! এই পাহাড়ে আমার গুঁড়ো হওয়াই কি আপনি চান?"

"না রে, গুঁড়ো হবি না, আর হাত তিনেক মাত্র আছে। আমি গুণে গুণে আসছি। অনায়াসে ছাড়তে পারিস।"

মামাবাবুর কথা শেষ হবার আগেই আমি হাত ছেড়ে দিয়ে শক্ত পাথরের ওপরে পড়েছি। আঘাত অবশ্য একটু লাগল, কিন্তু নিরাপদে মাটিতে পা দেওয়ার আনন্দ ও হাতের যন্ত্রণা শেষ হওয়ার আরামের কাছে সে আঘাত কিছুই নয়।

মামাবাবু আমার পরেই অন্ধকারে সেখানে এসে নেমে বেগে দড়িটাকে একটা ঝাঁকানি দিলেন, টের পেলাম। তার কয়েক মুহূর্ত বাদেই দড়িটা ওপর থেকে কাটা হয়ে সশব্দে আমাদের পায়ের কাছে পড়ল। দড়িটা অমনভাবে কাটা হয়ে না পড়লে হয়ত আমাদের জীবন কি ভয়ঙ্করভাবে বিপন্ন হয়েছিল ভালো করে বুঝতে পারতাম না। আর মিনিটখানেক আগেও দড়ি কাটা পড়লে আমাদের আর চিহ্ন থাকত না।

ওপরের দারুরা ইতিমধ্যে কয়েকটা মশাল সেখানে জ্বেলে ফেলেছে। দড়ি কাটা পড়বার পর নীচের দিকে মশাল ঝুলিয়ে পাহাড়ের ধার থেকে ঝুঁকে পড়ে তারা ফলাফলটা দেখবার

pathagar.net

চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে চেষ্টা তাদের বৃথা। তাদের মশালের আলো এই গাঢ় অন্ধকারে কতদূর আর পৌঁছাবে।

আমি সেজন্যে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে এই দারুণ শক্তি পরীক্ষার পর একটু জিরোবার কথাই বুঝি ভাবছিলাম। দারুরা আপাততঃ আমাদের আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং একটু দম নিলে ক্ষতি কি! বিশেষ করে মনের ভেতর যত প্রশ্ন জমে আছে, তাদের কয়েকটার উত্তর না পেলে যে স্থিরই থাকতে পারছি না।

কিন্তু মামাবাবু আমায় সে অবসর দিলেন না। পাহাড়ের ধারে মশালের আলো দেখা যেতেই তিনি আমার হাত ধরে টান দিয়ে প্রাণপণ বেগে নীচে নামতে শুরু করলেন।

অন্ধকারে পাহাড়ের এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি নামা সোজা কথা নয়। পদে পদে হোঁচট লাগছিল। আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি, এমন সময় মামাবাবু যে মিছিমিছি পালাবার জন্যে ব্যস্ত হননি তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আমাদের হাত দুয়েক দূরেই সশব্দে একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই এসে পড়ল। সে পাথরের পর ছোট বড় আরো অনেক পাথর এবার নীচে এসে পড়তে লাগল। কি ভাগ্যি আমরা তখন পাহাড়ের আরেক দিকে সরে গেছি মামাবাবুর উপস্থিত বুদ্ধির জোরে। নইলে সেই একটি পাথর মাথায় পড়লেই আর আমাদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত না।

দারুরা এতক্ষণ যে কেন এ উপায় অবলম্বন করেনি কে জানে। তা হলে মঙপোর সমস্ত চাতুরী সত্ত্বেও দড়ি বেয়ে নীচে নামা আর আমাদের ভাগ্যে হত না; সম্ভবতঃ আমাদের মারবার জন্যে দড়ি কাটাই যথেষ্ট মনে করে তারা এতক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিল। অন্য কোনো উপায়ের কথা তাদের মাথায় খেলেনি।

উঁচু-নীচু এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ওপর দিয়ে চলতে হচ্ছে। অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে পথ দেখবার উপায় নেই, কারণ তা হলে আমরা কোথায় আছি দারুদের আর জানতে বাকী থাকবে না।

অনেকক্ষণ বাদে মামাবাবু যখন থামলেন তখন বারবার হোঁচট খেয়ে ও পড়ে গিয়ে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। দম ফিরে পেতেও আমাদের কম সময় লাগল না। কিন্তু এত কাণ্ডের পর এমনভাবে মিলিত হয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় এলেও মামাবাবুকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করবার অবসরও আমি পেলাম না।

প্রথমেই মামাবাবু বললেন,—"এইবার কিন্তু ছাড়াছাড়ি দরকার।"

বিস্মিত যত হলাম, তার চেয়ে ক্ষুণ্ণ হলাম যে বেশী, একথা বলাই বাহুল্য। জিজ্ঞাসা করলাম—"কেন?"

মামাবাবু একটু অসহিষ্ণুভাবেই বললেন—"তর্ক করবার সময় এখন নয়। যা বলছি তাই কর।"

কিন্তু তবু আমি জেদ করাতে মামাবাবু আমায় বুঝিয়ে যা বললেন তা যুক্তিযুক্ত হলেও মনঃপূত কিছুতেই আমার হল না। মামাবাবুকে মঙপোর জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে। মামাবাবু ও মঙপোর এ অঞ্চল পরিচিত, তাঁরা কোনো রকমে আলাদা হয়েও দারুদের এড়াতে পারবেন, কিন্তু আমি সঙ্গে থাকলে বিপদ বাড়বে। আমায় তাই আগে থাকতে তিনি

pathagar.net

নিরাপদ জায়গায় পাঠাতে চান। দারুরা এখনো আমাদের সন্ধানে চারিধারে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। এইবেলা অন্ধকারে আমার চলে যাওয়ার সুবিধা আছে।

সব কথা শুনে বললাম—"তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু যাব কেমন করে! এ অঞ্চল যে চিনি না, তা ত নিজেই বলছেন।"

মামাবাবু হেসে বললেন—"যেখানে যেতে বলছি সে জায়গা অন্ততঃ তুই চিনিস।"

"আমি চিনি!"

"হ্যাঁ, যে সুড়ঙ্গ থেকে দারুদের সঙ্গে বেরিয়েছিলি সেটা মনে আছে ত?"

"সেখানে আবার কেন?"

"সেখানেই আমাদের আস্তানা।" বলে মামাবাবু এবার সেই সুড়ঙ্গপথের গোলকধাঁধার ভেতর কোথায় একটি গোপন গুহার মত স্থানে তিনি আস্তানা করেছেন তা খুঁজে নেবার উপায় বুঝিয়ে দিলেন।

অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করবার ছিল, কিন্তু মামাবাবু একেবারে অটল। মামাবাবুর দেওয়া টর্চটা নিয়ে অত্যন্ত অপ্রসন্নভাবেই তাই এগিয়ে যেতে হল।

নিরাপদ বলে সেখানে আমায় পাঠাবার জন্যে মামাবাবুর এত আগ্রহ, সেখানে কি বিপদ অপেক্ষা করছে মামাবাবু যদি তখন জানতেন! মামাবাবু একটা কথা ঠিকই বলেছিলেন। বিশাল একটা পাহাড় খুঁজে বার করা বিশেষ কঠিন নয়, মামাবাবু যে রকম নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাতে ঘণ্টা খানেক হাঁটবার পর সুড়ঙ্গপথও পেয়ে গেলাম। কিন্তু সুড়ঙ্গপথের মুখে এসে কেন বলা যায় না প্রথমটা থমকে দাঁড়াতেই হল। মনে যতই জোর করি না কেন, গা-টা আপনা থেকেই তখন ছম ছম করছে। এই পাহাড়ের সুড়ঙ্গগুলির মধ্যে যেসব অদ্ভুত ব্যাপার আমি এক রাত্রে দেখেছি তা ভোলা সহজ নয়। সুড়ঙ্গগুলি সত্যিই দুর্বোধ্য রহস্যে আমার কাছে বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঢুকতেই হল। এতক্ষণ বাইরের খোলা জায়গায় আমি টর্চ ব্যবহার করিনি বললেই হয়। সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকেই কিন্তু সেটা জ্বেলে ফেললাম। মামাবাবু যে রকম বলে দিয়েছিলেন তাতে বেশীদূর আমার যাবার দরকার নেই। সুড়ঙ্গের কয়েকটা বাঁকা পথ ঠিকমত ঘুরেই পাথরের দেয়ালে একটা ফাটল দেখা যাবে। সেই ফাটলের একধারে একটু চাপ দিলেই কব্জা দেওয়া দরজার মত পাথরটা ঘুরে গিয়ে একটি সঙ্কীর্ণ পথ বেরিয়ে পড়বে। তার ওধারেই মামাবাবুর আস্তানা।

মনের সন্ত্রস্ত অবস্থায় পথ ভুল করবার জন্যে বা মামাবাবুর নির্দেশের ত্রুটির দরুন—যে কারণেই হোক পাথরের দেয়ালের সে ফাটল কিন্তু আধঘণ্টা ধরে খুঁজে হয়রান হয়েও আমি পেলাম না। দেরী হবার সঙ্গে অধৈর্য আমার বাড়ছিল। সুড়ঙ্গের গলির পর গলি ঘুরে তখন আমি বার হবার রাস্তাও গুলিয়ে ফেলেছি। এই পাহাড়ে আগের এক রাতের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে শুধু পরিশ্রমে নয়, ভয়েও শীতের রাত্রে আমার কপাল ঘেমে উঠছে। ভয় আমার অমূলকও নয়। এ অবস্থায় কি করা উচিত ঠিক করবার জন্যে একটি দুমুখো গলির মোড়ে দাঁড়িয়েই আমি চমকে উঠে টর্চটা নিভিয়ে দিলাম। সুড়ঙ্গের মধ্যে স্পষ্ট পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

pathagar.net

আমি আলো নেভাবার পরই সে পায়ের শব্দ থেমে গেছল, কিন্তু তাতে আশ্বস্ত হবার কিছুই নেই! মানুষ বা পশু যার পায়ের শব্দই শুনে থাকি না কেন, সে যে আমার উপস্থিতি টের পেয়েছে এবং পালাবার চেষ্টা যে তার নেই, এটুকু পায়ের শব্দ থামা থেকে অনায়াসেই বোঝা যায়।

অত্যন্ত সন্তর্পণে নিশ্বাস নিতে নিতে আমি যেদিক থেকে শব্দ এসেছিল তার উল্টো দিকে নিঃশব্দে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলাম। উপবাসী শরীরের এই ক্লান্ত অবস্থায় কারুর সম্মুখ-সমরে নামবার উৎসাহ যে আমার তখন ছিল না একথা লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার করছি। পালানই তখন আমার উদ্দেশ্য।

কিন্তু আমি নড়বামাত্র মনে হল অন্ধকারে আর একজনও নড়ছে। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে আমার কোনো পরমবন্ধু যে এভাবে আমার পিছু নেয়নি তা বুঝতে আমার দেরী হল না। কিন্তু সে কে! দারুদের কেউ হলে সম্ভবত অন্ধকারে তার অস্তিত্ব গোপন থাকত না। অবশ্য দারুদের সবার গা থেকেই আলো বেরোয় না এবং আমার আততায়ী তেমন একজন সাদাসিধে দারুও হতে পারে। ক্ষীণকায় একজন দারুকে হয়ত এই দুর্বল শরীরে কাবু করতেও পারি। কিন্তু সে যে দারু তারও নিশ্চয়তা ত কিছু নেই। ভরসা করে এগিয়ে যাওয়া তাই উচিত মনে হল না।

ব্যাপারটা এতক্ষণে সত্যি শিকার ও শিকারীর পাঁয়তাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে আমি নিঃশব্দে তাকে এড়াবার চেষ্টা করছি, আর সেও আমাকে বাগে পাবার সুযোগ খুঁজছে।

সুড়ঙ্গের ভেতর পায়ের শব্দও ঠিকমত সব সময়ে বোঝা যায় না। তার জন্যে সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আমার হচ্ছিল। আমি তার অবস্থান যেমন ভুল করছিলাম, সেও তেমনি সঠিকভাবে আমি কোথায় আছি বুঝতে পারছিল না।

কিন্তু এই সাংঘাতিক খেলা আর কতক্ষণ চালান যায়। ক্রমশঃই আমি হতাশায় মরিয়া হয়ে উঠছিলাম। হঠাৎ একবার আলো জ্বেলে পথটা দেখে নিয়ে সোজা দৌড় দেবার চেষ্টা করব কি না ভাবছি, এমন সময় কে আমার গায়ের ওপর সজোরে লাফিয়ে পড়ল।

অন্ধকারে তার তাগ অবশ্য ঠিক হয়নি। তা না হলে এ-কাহিনি আমায় আজ লিখতে আর হত না। প্রথমটা পড়ে গেলেও বিদ্যুদ্বেগে তাকে ঝাঁকানি দিয়ে ফেলে আমি উঠে টর্চটা জ্বেলে ফেললাম। এখন আর অন্ধকারকে ভয় করবার কিছু নেই।

কিন্তু একি! যে ধারাল বড় ছোরাটা তখনো পাথরের ওপর পড়ে ঝক-ঝক করছে, তার কথাও আমি সে মুহূর্তে ভুলে গেলাম।

আমার সামনে লাওচেন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু সে রাত্রে আমার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ওইখানেই শেষ হবার নয়।

লাওচেন খানিক বাদে যেন নিজেকে সামলে সবিস্ময়ে বললে—"একি, আপনি! আমি যে লি-সিন ভেবেছিলাম।"

"লি-সিন!" আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"লি-সিনকে আপনি চেনেন নাকি?"

pathagar.net

লাওচেন একটু হেসে বললে—"তা চিনি বৈ কি!"

তাদের দুজনের পরিচয়ের ইতিহাস জানবার জন্যে কিন্তু তখন আমার কৌতূহল নেই। বললাম—"লি-সিনের প্রতি আপনার অনুরাগ এত বেশী আমি অবশ্য জানতাম না। কিন্তু তাকে দেখলেন কোথায়?"

"এই সুড়ঙ্গের ভেতরই খানিক আগে আমি তার পেছু পেছুই অনুসরণ করছিলাম। হঠাৎ এক জায়গায় এসে সে যেন ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ এখানে আলো নিভতে দেখে আমি তাকে পেয়েছি ভেবে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম।"

লি-সিন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে শুনেই কিন্তু আমার চিন্তার স্রোত অন্য দিকে বইতে শুরু করেছে। লি-সিনের এই অদৃশ্য হওয়ার ভেতর কত বড় বিপদের ইঙ্গিত আছে বুঝে উত্তেজিতভাবে বললাম— "লি-সিন অদৃশ্য হয়ে গেছে? কি বলছেন?"

"হ্যাঁ, সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার! আমিও তখন একেবারে হতভম্ভ হয়ে গেছলাম। একটা জলজ্যান্ত মানুষ একেবারে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল! আমি তার খুব বেশী পেছনে ছিলাম না। আমি তাকে অনুসরণ করছি সে কথা সে জানতে পেরেছিল বলেও মনে হয় না। হঠাৎ একটা বাঁক ফিরেই দেখি সে নেই। সেখানে একটিমাত্র পথ অনেক দূর পর্যন্ত সোজাভাবে চলে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি দৌড়ালেও আমি সেখানে পৌঁছাবার আগে তার পক্ষে অন্য মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু তবু দেখতে পেলাম না।"

"যেখানে অদৃশ্য হয়েছিল, সেখানে আমায় নিয়ে যেতে পারেন, এক্ষুনি?"

আমার কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক উত্তেজনার আভাস পেয়েই বোধহয় লাওচেন সবিস্ময়ে বললে— "কিন্তু সেখানে এখন গিয়ে কি হবে? আমি তখনি আলো জ্বেলে খুব ভাল করে খুঁজে দেখেছি! আর এতক্ষণ সে কি সেখানে আমাদের জন্যে বসে আছে মনে করেন?"

"আপনি নিয়ে যেতে পারেন কি না তাই বলুন?"

"তা বোধ হয় পারি, কিন্তু কেন?"

"সব কথা বলবার এখন সময় নেই। তাড়াতাড়ি চলুন।"

লাওচেন কি ভেবে আর কিছু আমায় জিজ্ঞাসা করলে না। আমায় পথ দেখিয়ে সামনের সুড়ঙ্গ দিয়ে এগিয়ে চলল।

সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় আমি হলে বোধহয় কিছুতেই পথ চিনে যেতে পারতাম না, কিন্তু লাওচেনের দেখলাম এবিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা আছে। কোথাও সে একবার থামল না, দ্বিধা করলে না কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে। অনায়াসে গুটি দশেক মোড় ঘুরে, এক জায়গায় এসে বললে— "এইখানে।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"ঠিক জানেন, এইখানে? পথ ভুল হয়নি ত আপনার?"

"না, পথ ভুল হবে কেন! এই দুদিন ধরে অধিকাংশ সুড়ঙ্গই ঘুরে ঘুরে মুখস্থ হয়ে গেছে।"

"তার মানে! সুড়ঙ্গের পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন কেন? আর এ পথের সন্ধান পেলেনই বা কেমন করে?"

pathagar.net

লাওচেন একটু চুপ করে থেকে হেসে বললে—"ঘুরে বেড়িয়েছি আপনার খোঁজে। আর সন্ধান পেয়েছি আপনি সে রাত্রে নিরুদ্দেশ হবার পর পাহাড়ের ভেতর পিস্তলের আওয়াজ শুনে।"

সত্যিই ত! লাওচেনের এ সুড়ঙ্গপথে দেখা দেওয়া যে বিস্ময়কর তা এতক্ষণ অন্য সব ব্যাপারের উত্তেজনায় মনে হয়নি। আমার গুলির শব্দে যে পাহাড় ধ্বসে পড়েছিল তার শব্দ লাওচেনের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছেছে শুনে অবশ্য একটু অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু সে সব কথা আলোচনার জন্যে সময় ঢের পাওয়া যাবে। আমি টর্চটা পাথরের দেয়ালের চারিধারে ঘুরিয়ে ফেলতে ফেলতে হঠাৎ আনন্দে উত্তেজনায় কেঁপে উঠলাম। বললাম—"এইবার হয়ত আপনার ছোরা কাজে লাগতে পারে। প্রস্তুত থাকুন।"

"ছোরা কেন, আমার কাছে পিস্তল আছে, কিন্তু পাথরের দেয়ালে ছুঁড়ব নাকি!"

পাহাড়ের সেই ফাটলের কাছে সরে গিয়ে সেটায় একটু মৃদু চাপ দিয়ে বললাম—"না, পাথরের দেওয়ালে নয়, মামাবাবুর গোপন আস্তানার সন্ধান জেনে যে সর্বনাশ করতে এসেছে, তাকে পালাতে না দেবার জন্যে।"

লাওচেনের ট্যারা চীনে চোখও এবার যেন কপালে উঠল।

"মামাবাবুর গোপন আস্তানা!"

ফাটলের ধারে জোরে চাপ দিতেই দরজার পাথরটা তখন ঘুরে গিয়ে একটা সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে পড়েছে। টর্চটা তাড়াতাড়ি নিভিয়ে চুপি চুপি বললাম—"হ্যাঁ, লি-সিন কেমন করে সন্ধান পেয়েছে জানি না, কিন্তু এর ভেতরেই সে যে অদৃশ্য হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবার তাকে এখানে ধরতে হবেই।"

সুড়ঙ্গপথ দিয়ে এবার আগু-পিছু হয়ে আমরা দুজনে এগিয়ে চললাম। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। দুধারে দেওয়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে আমি সামনের পথ ঠিক করছি, লাওচেন পেছন থেকে আমার কাঁধ ছুঁয়ে চলেছে। বেশীদূর এভাবে যেতে হল না। খানিক এগিয়ে সুড়ঙ্গপথ একটি প্রকাণ্ড বিশাল গুহার মুখে শেষ হয়েছে। সেইখানে পৌঁছেই আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লাওচেনের হাতে চাপ দিয়ে থামতে ইশারা করলাম। সামনের গুহাটি যেমন লম্বা-চওড়া তেমনি উঁচু, সে গুহার একেবারে অপর প্রান্তে মিট মিট করে একটি আলো জ্বলছে। বিশাল গুহার অন্ধকার তাতে দূর হয়নি। কিন্তু সেই আলোই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। গুহার ভেতর আসবাবপত্র বিশেষ কিছু থাকলেও ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। আমাদের দিকে পেছন ফিরে পাথরের মেঝেয় পাতা ঘাসপাতার একটি বিছানার ওপর বসে লি-সিন একান্ত মনোযোগ সহকারে একটা কিছু যে দেখেছে তা আমরা কিন্তু বেশ ভালো করেই বুঝতে পারলাম।

এখানে তার অনুসরণ যে কেউ করতে পারে না, এ বিষয়ে লি-সিন বোধ হয় বেশ নিশ্চিন্তই ছিল। সেই জন্যেই বোধ হয় আমরা সন্তর্পণে তার হাত তিনেক কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত সে কিছু টের পায়নি। তারপর হঠাৎ আমাদের মৃদু পদশব্দেই বোধ হয় চমকে ফিরে তাকাল সে। সেই মুহূর্তে টর্চটা জ্বেলে তার মুখে ফেলে আমি বললাম—"খবরদার নড়বে না, তাহলেই মরবে।"

pathagar.net

লি-সিনের তখনকার স্তম্ভিত মুখভঙ্গি দেখবার মত। আমাকে ও লাওচেনকে একসঙ্গে এভাবে দেখবার আশা সে নিশ্চয়ই করেনি। চীনাদের মুখোশের মত মুখে কোনো ভাব ফোটেনা। এ কথা যে মিথ্যা সেই দিনই তা বুঝেছিলাম। কিন্তু এরকমভাবে হাতের মুঠোয় পেয়েও আর একটু হলে আমরা তাকে হারাতে বসেছিলাম। স্থাণুর মত কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে লি-সিন লাওচেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লাওচেন একেবারেই প্রস্তুত ছিল না এই আকস্মিক আক্রমণের জন্যে। তার পিস্তলের গুলি ছুটল—কিন্তু ছুটল উল্টো দিকে। এবং লি-সিনের ধাক্কায় পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটাও ছিটকে পড়ল মেঝের ওপর। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমটা এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে আমি হতভম্বই হয়ে গেছলাম। লাওচেনকে চিত করে ফেলে আর একটু হলেই লি-সিন সুড়ঙ্গ দিয়ে বোধ হয় সরে পড়ত। ধরা পড়ল সেও, নিজেরই দোষে। লাওচেনকে কাবু করে ফেলে সোজা ছুটে পালালে আমার বোধ হয় কিছু করবার ক্ষমতাই থাকত না। কিন্তু সে গুহার ভেতর থেকে ছোট একটা নোট বইয়ের মত খাতা তুলে নিতে গিয়েই নিজের বিপদ বাধালে। আমার বিমূঢ়তা তখন কেটে গেছে। পিস্তলটা যেখানে ঠিকরে পড়েছিল সেখান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে লি-সিন দৌড় দেবার আগে আমি তার দিকে লক্ষ্য স্থির করে দাঁড়ালাম। বিছানা থেকে বইটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ান আর লি-সিনের হল না। আমার দিকে চেয়ে সে স্থির হয়ে বসে পড়ল। লাওচেন ততক্ষণে সামলে উঠে বসেছে। মুহূর্তের মধ্যে সে পেছন থেকে গিয়ে লি-সিনকে জাপটে ধরলে। এবারে লি সিনের আর কোনো বেয়াড়াপনা করবার সাহস বোধহয় ছিল না। হাত থেকে বইটা কেড়ে নেবার সময় সে শুধু আমার দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে বললে—"কাজটা ভাল করলেন না। আপনাকে এর জন্যে পস্তাতে হবে।"

"তার আগে তুমি এখন পস্তাও।" বলে আমি লাওচেনকে বললাম—"দড়ি দিয়ে ওকে বাঁধুন।"

লাওচেন অবশ্য শত্রুকে একেবারে শেষ করে দেবারই পক্ষপাতী। তার যে রকম জেদ দেখলাম তাতে মনে হল পিস্তলটা আমার হাতে না থাকলে সে লি-সিনের গায়ে গোটা কয়েক গুলির ফুটো করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করত না। কিন্তু যত বড় শত্রুই হোক এরকমভাবে জানোয়ারের মত তাকে গুলি করে মারা আমার পক্ষে অসম্ভব। বিছানার একটা কম্বলকে ছোরা দিয়ে কেটে দড়ি বানিয়ে লি-সিনকে আমরা পিছমোড়া করে বেঁধে গুহার একদিকে শুইয়ে দিলাম। তর্ক বাধল তারপর কি করা যায় তাই নিয়ে। গুহার ভেতরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে লাওচেন ও আমি ওই নোট বই ও সামান্য কয়েকটা রান্নাবান্নার সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। নোট বইয়ের ভেতরও একটি কাগজে সামান্য কয়েকটা দুর্বোধ্য অঙ্কের অক্ষর ছাড়া আর কিছু নেই। নোট বইটাতে যাই থাক, সেটা যে অত্যন্ত মূল্যবান এবং লি-সিনের যে সেটা চুরি করারও সঙ্কল্প ছিল, এবিষয়ে আমার মনে তখন কোনো সন্দেহ নেই। সে চুরি যখন নিবারণ করা গেছে তখন মামাবাবুর মণ্ডপোকে নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ওই গুহাতেই অপেক্ষা করতে চাইছিলাম। কিন্তু লাওচেন কিছুতেই রাজী হল না। তার মতে আমাদের গুহায় থাকা মানে অকারণে নিজেদের বিপন্ন করা। লি-সিন যে

একাই এ গুহার সন্ধান জেনেছে তার ঠিক কি? তার দলের লোকেরা হয়ত একথা জানে এবং তার দেরী দেখে তার খোঁজেও আসতে পারে। তখন আমরা ধরা পড়বই। মামাবাবুর এ নোট বইয়ের মূল্য যখন তাদের কাছে এত বেশী, তখন এটা তাদের হাত থেকে রক্ষা করাও আমাদের কর্তব্য, এই হল তার যুক্তি।

বললাম—"কিন্তু মামাবাবুরাও ত এসে এদের কবলে পড়তে পারেন!"

লাওচেন একটু হাসল—"না, তা পড়বেন না!" তারপর একটু থেমে আবার বললে—"মামাবাবুর ওপর এত অবিশ্বাস কেন! এদের হাত থেকে যিনি অমনভাবে একবার পালাতে পেরেছেন তিনি সহজে ধরা দেবার পাত্র নন। আমাদের এখান থেকে নিজেদের তাঁবুতে গেলে কোনো ক্ষতি হবে না কোনো দিক দিয়ে। আমার সন্দেহ যদি অমূলক হয়, লি-সিনের দলের লোক যদি কেউ নাও আসে, তাহলেও আমি এখানে যে চিঠি রেখে যাচ্ছি তা থেকেই মামাবাবু সব কথা জানতে পারবেন। আমাদের ঠিকানাও রেখে যাচ্ছি।"

লাওচেনের কথাতেই শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল। নোট বইয়ের একটি পাতা ছিঁড়ে সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে লিখে লাওচেন চর্বির মিটমিটে বাতিটির কাছে পাথর চাপা দিয়ে চিঠিটি রেখে দিলে।

কিন্তু তবু সুড়ঙ্গের গুপ্ত দ্বার ঠেলে বেরিয়ে যাবার সময় মনটা কেমন যেন খুঁতখুঁত করতে লাগল। লি-সিন আমাদের চলে আসবার সময় কোনো কথাই বলেনি। মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে লাওচেন তার সে পথ বন্ধই করে দিয়েছিল, তবু তার শেষ মুহূর্তের দৃষ্টি ভোলবার নয়। তার ভেতর দুর্বোধ্য কি ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত যেন আছে। মামাবাবুর বুদ্ধিতে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, কিন্তু তিনিও এখানে অসন্দিগ্ধভাবে আসছেন। সতর্ক হবার আগেই যদি আবার তিনি এদের কবলে পড়ে যান?

লাওচেনের সঙ্গে যেতে যেতে নিজের মনের উদ্বেগ আমি বেশীক্ষণ চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম—"আমাদের এভাবে চলে আসা ঠিক হল না কিন্তু। মামাবাবু যদি সত্যি আবার কোনো বিপদে পড়েন।"

লাওচেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার কাঁধে হাত রেখে অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বললে— "শুনুন মিঃ সেন, বিপদ যদি আজ কারুর ঘনিয়ে থাকে সে মায়া বাদুড়দের সর্দারের!"

"মায়া বাদুড়দের সর্দার!"

"হ্যাঁ, আজই তার দেখা পাবেন। আজ রাত্রেই তার লীলা শেষ।"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি আপনি বলছেন, মিঃ লাওচেন? হঠাৎ এমন সবজান্তা হলেন কি করে?"

লাওচেন তেমনি গম্ভীরভাবে বললে—"একটা অনুরোধ করছি, মিঃ সেন, কোনো প্রশ্ন এখন আর করবেন না। মায়া বাদুড়দের রহস্য ভেদ করবার যদি ইচ্ছা থাকে, তা হলে আমার কথা আপনাকে আজ বিনা প্রতিবাদে শুনতে হবে।"

pathagar.net

তখনকার মত কোনো কথাই আর বললাম না, কিন্তু প্রশ্ন না করার প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত রাখা গেল না, যদিও সে প্রশ্নের বিষয়ে আলাদা।

লাওচেনের সোজা পথ জানা ছিল বলেই পাহাড়ের ভেতরের সুড়ঙ্গগুলি ক্লান্ত অবস্থাতেও এবার তেমন দীর্ঘ বোধ হয়নি। পাহাড় থেকে বেরিয়ে লাওচেনের তাঁবুর দরজার কাছে পৌঁছে কিন্তু আমায় থমকে দাঁড়াতে হল। আমরা ঢোকবার আগে তাঁবুর ভেতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে লাওচেনকে অভিবাদন করে চলে যাচ্ছিল। সম্ভবতঃ তাঁবুর পাহারাতেই তাকে রাখা হয়েছিল। তাঁবুর দরজায় কাপড় সরাবার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের আলোয় মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে তার মুখ দেখতে পেলেও, তাকে চিনতে আমার দেরী হয়নি। আমার সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়বার কারণও তাই।

লাওচেন আমার হাত ধরে টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আবার দাঁড়ালেন কেন? চলুন ভেতরে।"

"যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা তার আগে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি বাধ্য হচ্ছি।"

লাওচেন হেসে বললে—"না, আপনাকে নিয়ে পারা গেল না। করুন জিজ্ঞাসা, কিন্তু মায়া বাদুড় সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে জানবেন আমি বোবা।"

"না মায়া বাদুড় সম্বন্ধে নয়, যে লোকটি এইমাত্র বেরিয়ে গেল তার সম্বন্ধে। একে কোথায় পেলেন?"

লাওচেন আমার দিকে চেয়ে আবার হেসে বললে—"যাক, লোকটা তা হলে মিথ্যা বলেনি। আপনি তা হলে চিনতে পেরেছেন?"

"না চেনবার কি আছে, লোকটা আমাদের অশ্বতর-চালকদের একজন ছিল।"

"তবে ওর ত কোনো অপরাধ হয়নি—ও আমার কাছে নিজেই তা বলেছে।"

একটু অধৈর্যভাবে বললাম—"অপরাধ আছে, মিঃ লাওচেন। লোকটা আমাদের দল থেকে রহস্যজনকভাবে একদিন সরে পড়ে, তারপর ও এখানে উদয় হল কি করে!"

কথা কইতে কইতে আমরা এবার তাঁবুর ভেতর এসে ঢুকেছিলাম। লাওচেন একটা চেয়ারে বসে পড়তে গিয়ে, হঠাৎ চমকে আমার দিকে ফিরে বললে—"সে কি! রোগে পড়ার দরুন আপনারা ওকে কাচীনদের এক গ্রামে রেখে আসেন নি?"

আমি একটু হাসলাম মাত্র। লাওচেন যেন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে—"আপনাদের বিশ্বাসী লোক ভেবেই একদিনের পরিচয়ে আমি যে ওকে তাঁবুর পাহারায় পর্যন্ত রেখেছিলাম! কাল সবে ও এখানে কাজ নিয়েছে; আমায় জানিয়েছে যে, রোগ সারবার পর ও নিজে আপনাদের খোঁজে এতদূর এসেছে।"

"আমাদের খোঁজেই এসেছে ঠিক, কিন্তু প্রভুভক্তিতে নয়। মায়া বাদুড়দের সর্দারকে ধরবার যোগাড় করছেন, অথচ তাদের অনুচরদের চেনেন না, মিঃ লাওচেন?"

লাওচেন খানিকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কি ভেবে বললে—"আপনি বিশ্রাম করুন, মিঃ সেন, আমি আসছি।"

বাধা দিয়ে আমি বললাম—"আপনি মিছিমিছি যাচ্ছেন, তার দেখা পাওয়ার আশা অল্প! আমাকেও সে দেখেছে।"

pathagar.net

"তবু একবার যাওয়া দরকার।" বলে লাওচেন বেরিয়ে গেল এবং বহুক্ষণ বাদে যখন ফিরে এল তখন আমি দীর্ঘ উপবাস ভঙ্গ করে শ্রান্ত হয়ে একটু বিছানায় গা এলিয়েছি।

আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার দরকার হল না। উদ্বিগ্নমুখে চেয়ারে বসে পড়ে লাওচেন বললে—"আপনার কথাই ঠিক। তার কোনো পাত্তাই নেই।"

একটু বিদ্রূপের স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম—"মায়া বাদুড়দের সর্দারের দেখা কি তবুও আজ পাওয়া যাবে মনে হয়?"

লাওচেন এবারে অদ্ভুতভাবে হেসে বললে—"সে বিষয়ে আরো নিঃসংশয় হলাম।"

তার গলার স্বরে আমার ব্যঙ্গ করবার প্রবৃত্তি কিন্তু কেমন করে উড়ে গেল। সে স্বর শুধু দৃঢ় নয়, কেমন যেন হিংস্র।

বিছানায় উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলাম—"আমায় কি করতে হবে?"

লাওচেন একটু হেসে বললে—"বিশেষ কিছু নয়, এই ঘরে প্রথম যে প্রবেশ করবে তাকে গুলি করতে হবে।"

লাওচেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের আলো নিভে গেল। লাওচেনের পদশব্দও পেলাম। তাঁবুর দরজা সরিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিছু বলবার আগেই বাইরে থেকে তার গলা শুনতে পেলাম—"আমি বাইরে আছি। ঘর থেকে নড়বেন না।"

লাওচেন বেশ অনায়াসে বলে গেল, "ঘর থেকে নড়বেন না", কিন্তু সেই অন্ধকার ঘরে প্রতি মুহূর্তে কান খাড়া করে পরম শত্রুর পায়ের শব্দের জন্যে অপেক্ষা করা যে কি ভয়ানক ব্যাপার তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। লাওচেনের অনুমান সত্য হলে মায়া বাদুড়দের সর্দার যে কোনো মুহূর্তে এসে হাজির হতে পারে। কিন্তু নিতান্ত সাধারণ মানুষ ত সে নয়। অসীম তার ধূর্ততা, অদ্ভুত, এবং এক হিসাবে, অলৌকিক তার ক্ষমতা। চোখ কান বুজে ভালো মানুষটির মত সোজাসুজি ঘরে ঢুকে আমার গুলিটি বুক পেতে সে নিশ্চয়ই নেবে না। কি ভয়ানক অভিসন্ধি নিয়ে, কি রকম অপ্রত্যাশিতভাবে সে এসে উপস্থিত হবে, কে জানে। পিস্তলের গুলি যদি ছোটে—তা হলে কার যে আগে ছুটবে, তা বলা কঠিন। লাওচেন বাইরে লুকিয়ে পাহারায় আছে জেনেও, সত্যি কথা বলতে গেলে, কোনো সাহস পেলাম না। মায়া বাদুড়দের হাতে লাওচেন ত কম নাকাল এ পর্যন্ত হয়নি, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে বাঁচাতে পারলে ত আমায় সাহায্য করবে! গাঢ় অন্ধকারে পিস্তলটা সজোরে মুঠোতে চেপে তাঁবুর দরজার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে থাকতে থাকতে টের পাচ্ছিলাম আমি বেশ ঘেমে উঠেছি। এ রকমভাবে ঘরের ভেতর অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় থাকার দরুনই বোধহয় অস্বস্তি ও যন্ত্রণা এত বেশী হচ্ছিল। তাঁবুর বাইরে খোলা জায়গায় শত্রুর সম্মুখীন হতে হলে আমার মনের জোর এতটা বোধহয় কমে যেত না।

লাওচেন ঘরে কেউ ঢোকবামাত্র গুলি করতে বলেছে। তার এ কথা থেকে এটুকু বোঝা কঠিন নয় যে, গুলি করার তৎপরতার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে, আমার জীবন পর্যন্ত। এক মুহূর্ত বিলম্ব হলে বা লক্ষ্য ঠিক না হলে আফসোস করবার জন্যেও বোধহয়

আর বেঁচে থাকতে হবে না। জন্তুজানোয়ার ছাড়া মানুষের ওপর কখনো পিস্তল ব্যবহার এর আগে করিনি। কিন্তু এখন সে বিষয়ে কি উচিত-অনুচিত তা ভাবছিলাম না। শুধু ভয় হচ্ছিল, ঠিক সময়ে হাত ও মনের জোর বুঝি থাকবে না। যে রকম উত্তেজনার মধ্যে প্রত্যেক মুহূর্ত কাটছিল তাতে খানিকক্ষণ বাদে মনের অবসাদ আসা খুবই স্বাভাবিক। সামান্য একটু শব্দতেই থেকে থেকে চমকে উঠেছিলাম, তাঁবুর ভেতরের অন্ধকারে চোখের ওপর যেন অদ্ভুত সব ছায়ামূর্তি ভেসে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছিল, কোনটা মনের ভুল আর কোনটা সত্যি, তাই ঠিক করতে পারব না।

সময় এমনি করে বড় কম কেটে গেল না। এক একবার মনে হচ্ছিল, লাওচেনের কথায় অতখানি বিশ্বাস করবার হয়ত কোনো হেতু নেই। তার ধারণা হয়ত সম্পূর্ণ ভুল। মিছিমিছিই এমনিভাবে অপেক্ষা করার যন্ত্রণা ভোগ করছি। কিন্তু সে কথা ভেবেও, নিশ্চিন্ত হয়ে একাগ্র পাহারা শিথিল করতে পারলাম কই!

একবার মনে হল, লাওচেনের কথা অমান্য করে তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়! বিছানা থেকে উঠে পর্দার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম! চারিধার নিস্তব্ধ, বাইরে শীতের যে কনকনে হাওয়া এখানে রোজ রাত্রে সজোরে বয়, তাও শান্ত হয়ে এসেছে। পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে বাইরে তাকালাম, কিন্তু সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে কি আর দেখতে পাব! বাইরে কান পেতে কোনো শব্দ শোনা যায় কি না বোঝবার বৃথাই চেষ্টা করলাম। সমস্ত পাহাড়-অরণ্যও যেন নিশ্বাস রোধ করে কি একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রতীক্ষা করছে। এতটুকু আওয়াজ কোথাও নেই।

লাওচেনের কথা ঠেলে তাঁবু থেকে শেষ পর্যন্ত বেরুতে পারলাম না। যাই ঘটুক না কেন, আমায় আজ এ তাঁবুর ভেতরে থেকে পাহারা দিতেই হবে। মনকে সেই জন্যই প্রস্তুত করা দরকার! মনে হচ্ছিল, যা হবার তা যেন তাড়াতাড়ি হয়ে গেলেই এখন অবশ্য ভাল হয়, অধীরভাবে এই অপেক্ষা করে থাকার উদ্বেগ ও উত্তেজনা আর সহ্য করা যাচ্ছে না!

আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্যেই যেন ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁবুর পেছন দিকে অকস্মাৎ অদ্ভুত একটা শব্দ শোনা গেল। ধারাল ছোরাতে তাঁবুর অনেকখানি কাপড় একটানে কে যেন কেটে ফেলছে। গভীর নিস্তব্ধতার ভেতর অতর্কিতে এই শব্দ শুনে সমস্ত গায়ে আপনা থেকেই যে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, এ কথা অস্বীকার করব না, কিন্তু হতবুদ্ধি সত্যিই হয়ে পড়িনি। মামাবাবুকে অজ্ঞান অবস্থায় যেদিন সরিয়ে নিয়ে যায়, সেদিনও তাঁবুর কাপড় এই রকমভাবে যে কাটা ছিল তা তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হয়েছে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই সেদিকে ফিরে আওয়াজ ধরেই লক্ষ্য ঠিক করে গুলি ছুঁড়লাম একটি—দুটি।

কোনো প্রত্যুত্তর, কোনো সাড়াশব্দ তারপর আর নেই। টর্চটা বিছানার ওপরই ছিল। সেটা খুঁজে নিয়ে জ্বালতে যাচ্ছি, হঠাৎ পিঠের ওপর একটা শক্ত জিনিসের খোঁচা অনুভব করলাম! খোঁচাটা যে কিসের তা বুঝতে বিলম্ব হবার কথা নয়। মেরুদণ্ডের ঠিক বাঁ দিকে পিস্তলের নল যে ঠেলে ধরেছে, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করারও নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্য নেই। তাঁবুর পেছনের দিকে যখন আমি কাপড় চেরার শব্দ লক্ষ্য করে গুলি করছি, তখনই

সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে শত্রু কিভাবে আমায় বোকা বানিয়েছে তা নিয়ে মাথা ঘামান তখন বৃথা, তার সময়ও ছিল না।

পিঠে পিস্তলের খোঁচা যে দিয়েছিল এবারে তার কথা শোনা গেল।

কিন্তু সে কথা আমার কাছে অর্থহীন। সেটা যে চীনা ভাষা তা বুঝলেও, তার ভেতর এক, 'লাওচেন' এই সম্বোধন ছাড়া আর কিছুই আমার বোধগম্য নয়। কথা না বুঝলেও, লাওচেনের প্রতি বিশেষ প্রীতি যে মায়া বাদুড়দের সর্দারের নেই, তা তার বলার ধরন থেকেই স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম। আমি যে লাওচেন নই, একথা জানতে পারলেও হয়ত তার আক্রোশ দূর হবে না, তবু আমার মত সেও যে একটু ঠকেছে, তা জানাবার লোভ ত্যাগ করতে পারলাম না। তার কথা শেষ হওয়া মাত্র বললাম—"তোমার পিস্তলের নল বসাতে একটু ভুল হয়েছে, এটা লাওচেনের পিঠ নয়।"

ইংরাজীতে কথাগুলো বলার দরুন, সন্দেহ ছিল, সে তা বুঝবে কি না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমার বক্তব্য শেষ না হতেই হঠাৎ আমার পিঠ থেকে পিস্তলের নল সরে গেল। কিন্তু নল সরে যাবার দরুন নয়, সেই মুহূর্তে রহস্যময় মায়া বাদুড়দের সর্দারের মুখ থেকে অতর্কিতে যে বিস্ময়ের ধ্বনি বেরিয়ে পড়ল, তাতেই চমকে পেছনে ফিরে টর্চটা জ্বেলে ফেললাম।

একি! মামাবাবু!

মামাবাবু মুখের ওপরের পর্দাটা সরিয়ে ফেলে গম্ভীরভাবে বললেন—"হুঁ, আমি এরকমটা আশা করিনি। লাওচেন কোথায় গেল?"

"লাওচেন আপনার পেছনেই আছে। আপনার পিস্তলটা শুধু দয়া করে টেবিলের ওপর রাখুন।"

ঘরের আলোটা ইতিমধ্যে জ্বেলে দিয়ে লাওচেন মামাবাবুর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত, অর্থহীন, ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মত। বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ধাক্কায় আমি তখন সত্যিই হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। প্রথমে মায়া বাদুড়দের সর্দারের জায়গায় মামাবাবু, তারপর মামাবাবুর বিরুদ্ধে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে লাওচেন—যে কোনো সুস্থ মাথাকে ঘুলিয়ে দেবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু তখনো অনেক কিছু দেখতে আমার বাকী আছে।

মামাবাবু আমারই মত ঘটনার এই পরিণতির জন্যে প্রস্তুত বোধ হয় ছিলেন না, কিন্তু মুখে তাঁর কোনো রকম ভাবান্তর দেখা গেল না। পিস্তলটা লাওচেনের কথামত টেবিলের ওপর রেখে তিনি ঈষৎ হেসে বললেন— "তুমি আজ তা হলে জিতেছ মনে হচ্ছে, লাওচেন!"

লাওচেন এগিয়ে এসে আমার শিথিল হাত থেকে পিস্তলটা টেনে নিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর কাছেই একটা চেয়ারে বসে বললে— "আপনার প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ, মিঃ রায়। আমার কাজ যে অনেক সহজ করে দিয়েছেন তার জন্যেও বোধ হয় কৃতজ্ঞতা জানান উচিত। আপনার নোটবুকটি পেয়ে আমার অনেক পরিশ্রম, অনেক হাঙ্গামা বেঁচেছে।"

pathagar.net

লাওচেনের স্বরের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গতেও মামাবাবুকে কিন্তু বিচলিত হতে দেখলাম না। হেসে বললেন— "হ্যাঁ, নোটবুকটা খুব দামী আমার কাছে।"

"দামী বলেই ত আপনাকে এর জন্যে ফাঁদে ফেলতে পারব জানতাম," বলে লাওচেন হেসে উঠল।

আসল রহস্য না বুঝলেও লাওচেনের স্বরূপ এতক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল টুঁটি চেপে ধরে তার ওই কুৎসিত হাসি বন্ধ করে দিই। কিন্তু আমরা নিরুপায়। লাওচেনের পিস্তল আমাদের দিকে হিংস্রভাবে মুখ উঁচিয়ে আছে।

মামাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"এখন তা হলে তুমি কি করতে চাও?"

"বিশেষ কিছু না। নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাদের কাছ থেকে এবার শুধু বিদায় নিতে হবে। ইউনানে আমার জন্যে সত্যিই অনেকে অপেক্ষা করে আছে।"

"তারা বৃথাই অপেক্ষা করে আছে, লাওচেন। নোটবুক নিয়ে সেখানে তুমি পৌঁছাতে পারবে না।"—মামাবাবুর মোলায়েম কণ্ঠস্বর যে কারণে হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে তখন বজ্রগম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা টের পেয়ে কোনোমতে আমি তখন উত্তেজনা দমন করে আছি।

লাওচেনও সে স্বরে চমকে উঠেছিল, কিন্তু নিজেকে সম্বরণ করে সে হেসে বললে— "এখনো রসিকতা করবার মত মনের অবস্থা আপনার আছে দেখে খুশি হচ্ছি, মিঃ রায়।"

"মাথার কাছে পিস্তলের নল আমি ঠিক রসিকতা বলে মনে করি না, লাওচেন। লি-সিন নলটা না হয় মাথায় ঠেকিয়েই দাও।"

আমাকে বিস্ময় বিমূঢ় করে সত্যিই লি-সিন খানিক আগে তাঁবুর কাটা পর্দা দিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে একটু এগিয়ে এল।

লাওচেনের মুখ তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। মামাবাবু তাকে বললেন— "তুমি গুলি করে বড় জোর একজনকে জখম করতে পার, কিন্তু তা হলেও এ নোটবুক ইউনানে পৌঁছাবে না তুমি জানবে।"

নিঃশব্দে খানিক বসে থেকে লাওচেন নিজের পিস্তলটা এবার ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর অদ্ভুতভাবে একটু হেসে বললে— "এইটুকু আমার ভুল হয়েছিল বুঝতে। আমি দুই শত্রুকে আলাদা করে দেখেছিলাম।"

"হ্যাঁ, মায়া বাদুড়দের সঙ্গে নিরীহ কীটতত্ত্ববিদের সংযোগ হতে পারে তা তুমি ভাবতে পারনি, কিন্তু ওই সামান্য ভুলের জন্যই সর্বনাশ হয়। নোট বইটা এবার তা হলে দিতে পার।"

লাওচেন অমন সুবোধ বালকের মত সেটা যে বার করে মামাবাবুর হাতে তুলে দেবে তা ভাবিনি। তার মুখের ভাব দেখেও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম।

মামাবাবু নোটবুকটা খুলে ভালো করে দেখে-শুনে সন্তুষ্টচিত্তেই পকেটে রাখতে যাচ্ছেন, এমন সময় লাওচেন আর একবার হেসে উঠে বললে— "শেষ পর্যন্ত আমারই কিন্তু জিত হল, মিঃ রায়!"

pathagar.net

এবার মামাবাবুই বিদ্রূপ করে বললেন— "আমার বুদ্ধিটা খুব সূক্ষ্ম নয়, একটু বুঝিয়েই বল।"

"বোঝাবার বিশেষ কিছু নেই, ও নোটবই বৃথাই বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।"

"তার মানে?"

"মানে— এ বই আমার হাত থেকে খোয়া যাবার অপেক্ষায় আমি চুপ করে বসে ছিলাম না। ঘণ্টা তিনেক আগে আমার লোক এ বইয়ের আসল তথ্যটুকু নিয়ে ইউনান রওনা হয়ে গেছে। আপনার ভাগনে মিঃ সেন তাকে চেনেন। আপনি মিচিনা পৌঁছাবার আগেই ইউনান সরকারের কাছে আপনার দেওয়া ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউডের হিসাব পৌঁছে যাবে। ইউনানের সীমান্ত-নির্দেশ এখনই চলেছে। সামান্য একটু সীমান্তরেখায় অদলবদল করার ব্যবস্থাও অনায়াসে হয়ে যাবে ততদিনে...."

মামাবাবুর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে একটু থেমে নিষ্ঠুরভাবে হেসে লাওচেন তার কথা শেষ করলে— "কে জানবে বলুন, সেই সামান্য অদল বদলের ফলে একটা গোটা রেডিয়মের খনি বর্মার হাত থেকে চলে যাচ্ছে।"

লাওচেনের কুৎসিত হাসি থেমে যাবার পর সমস্ত তাঁবু খানিকক্ষণের জন্যে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মামাবাবু ও লি-সিনের মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার কাছে সমস্তই একেবারে দুর্বোধ্য। এইমাত্র যে সব ঘটনা চোখের ওপর দ্রুত ঘটে গেল, যে সমস্ত অদ্ভুত খবর শুনলাম, সেগুলির পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধই আমি নির্ণয় করতে পারিনি। নোটবুক নিয়ে কাড়াকাড়ি, ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউড, ইউনানের সীমান্ত, শেষ পর্যন্ত রেডিয়াম—এসব যেন লাওচেনের অসম্বন্ধ প্রলাপ, আমাদের অভিযানের সঙ্গে এই সমস্ত অবান্তর কথার কি সম্পর্ক আমি কিছুতেই ভালো করে গুছিয়ে বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

শুধু মামাবাবুর গম্ভীর মুখের কঠিন রেখাগুলি দেখে মনে হচ্ছিল, এর ভেতর সত্যকার গভীর রহস্য সম্ভবত আছে।

লাওচেন আবার একটু হেসে বললে— "এখন মনে হচ্ছে নাকি যে, সত্যিসত্যি কীট-তত্ত্বের সন্ধানে বেরুলেই ভালো করতেন? তবু কিছু কাজ হত।"

মামাবাবু গম্ভীর মুখেই বললেন—"তুমি ভুল করেছ লাওচেন, আমরা সত্যি পোকার সন্ধানেই বেরিয়েছিলাম। সে সন্ধান অন্য পথে গেছে শুধু তোমারই জন্যে!"

"আমার জন্যে?"

মামাবাবু একটু হাসলেন— "আমাদের কম্পাস, জরীপের যন্ত্রপাতি, এমন অদ্ভুতভাবে চুরি না গেলে আমার চোখ খুলে যেত না। তুমি নির্বিঘ্নে তোমার কার্য সিদ্ধি করতে পারতে। আমরা কোনো কিছু না জেনে পোকামাকড় নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম।"

লাওচেন বিদ্রূপের স্বরেই বললে—"তাই নাকি? আলেয়া-দারুদের দেশ খোঁজবার কোনো উদ্দেশ্য আপনার ছিল না বোধ হয়?"

"বিশ্বাস তুমি না করতে পার, কিন্তু কম্পাস প্রভৃতি চুরি যাবার পরও আমি আলেয়া-দারুদের কথা জানতাম না।"

pathagar.net

লাওচেন হাসল—"যাক, শেষ পর্যন্ত জেনে আমাদের উপকারই করেছেন। আপনার যন্ত্রপাতি চুরি যেই করুক, এখন মনে হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ করেনি। ভাগ্যিস আপনার কাছে বাড়তি সরঞ্জাম ছিল, নইলে ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউডয়ের হিসাব এত সহজে পাওয়া যেত না।"

"আবার একটু ভুল করলে লাওচেন, বাড়তি যন্ত্রপাতি আমার ছিল না।"

"তার মানে।" লাওচেন সন্দিগ্ধভাবে মামাবাবুর দিকে তাকাল।

মামাবাবু হেসে বললেন—"না, তোমার সে সন্দেহের কারণ নেই। তোমায় মিথ্যে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছি না। বাড়তি যন্ত্রপাতি আমার দরকারই হয়নি।"

"তা হলে?"

"আমার যন্ত্র, সূর্য, তারা আর এই জিনিষটি"—মামাবাবু পকেট থেকে ক্রোনোমিটার ঘড়িটা টেবিলের ওপর রেখে আবার বললেন—"ক্ষমতা ও বুদ্ধি থাকলে এই দিয়েই কাজ চলে যায় জানলে অত হাঙ্গামা তুমি বোধ হয় করতে না।"

লাওচেন খানিকটা চুপ করে থেকে বললে— "তাই দেখছি। যাই হোক, হাঙ্গামা যে শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়েছে, আপনার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে সেজন্যে ধন্যবাদ।"

"ধন্যবাদটা আর একটু পরেই দিও, লাওচেন। এখন কিছুই বলা যায় না। মিচিনা দূর হতে পারে, কিন্তু হার্টজ কেল্লা ততটা বোধ হয় নয়। সেখানে সম্প্রতি একটা সামরিক বেতার ঘাঁটিও তৈরী হয়েছে বলে শুনেছি। আমরা আজই রওনা হচ্ছি, এই মুহূর্তে।"

লাওচেন হেসে উঠল— "এই মুহূর্তে রওনা হয়ে দিনরাত সমানে পা চালিয়েও সাতদিনের আগে হার্টজ কেল্লাতে পৌঁছাতে পারবেন না। এখান থেকে ইউনানের রাজধানী ইউনানের পথ মাত্র তিনদিনের। আমার দূতকে সাহায্য করবার জন্যে পথে লোকজনও আগে থাকতে মজুত আছে।"

"তবু একেবারে চেষ্টা না করে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত কি? তাছাড়া তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছে দিতে হবে ত!"

"আমাকে! কেন?"

"তোমার পায়ের মাপ সাধারণের চেয়ে একটু বড় বলে।"

আমি বিমূঢ়ভাবে মামাবাবুর দিকে তাকালাম। এ আবার কি রকম রসিকতা! লাওচেনের পা যে একটু বড় মাপের তা আমরা সবাই জানি, অবশ্য আগেই লক্ষ করেছি। কিন্তু সে কথা এখানে কি সূত্রে আসে!

লাওচেন ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে— "আপনার কথারই প্রতিধ্বনি করে বলছি, আমার বুদ্ধিটা অত সূক্ষ্ম নয়, একটু বুঝিয়ে বলুন।"

"বলবার দরকার নেই, চাক্ষুষই দেখাচ্ছি।"-বলে মামাবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তাঁবুর যে ধারে লাওচেনের বিছানা ছিল সেদিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে লাওচেনের বড় চামড়ার ব্যাগটা খুলে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই লাওচেন চীৎকার করে উঠল— "ব্যাগে হাত দেবেন না, মিঃ রায়!"

pathagar.net

মামাবাবু গম্ভীরভাবে তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে বললেন—"আমার অনধিকার-চর্চা মার্জনা কর। তোমার সাজ-সরঞ্জাম সম্বন্ধে আমার অনেক দিনের কৌতূহল আজ একটু মেটাব। —এই যে, পেয়েছি বোধ হয়।"

মামাবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই তাঁবুর মধ্যে অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড ঘটে গেল। মামাবাবু কি করছেন জানবার আগ্রহে আমি ও লি-সিন একটু বুঝি অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম। সেই সুযোগেই হঠাৎ এক লাফ দিয়ে টেবিলের ওপরকার বাতিটা হাত দিয়ে উল্টে লাওচেন ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও, লি-সিন দু-তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে তার পেছু নিয়েছিল। আমরা টেবিলের তলা থেকে বাতিটা জ্বালবার আগেই বাইরে দুবার পিস্তলের আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম।

বাতি জ্বালা হবার পর আমিও বেরুতে যাচ্ছিলাম। মামাবাবু বাধা দিয়ে বললেন—"দরকার নেই। লি-সিন একাই যথেষ্ট, তা ছাড়া বাইরে মঙপো আছে!"

"কিন্তু এরকম হঠাৎ পালাবার কারণ কি?"

মামাবাবু কাগজের মোড়া খুলে অদ্ভুত আকারের জুতোর মত দুটি জিনিষ টেবিলের ওপর রেখে বললেন— "হঠাৎ মোটেই নয়। পালাবার কারণ যথেষ্ট আছে। তার মধ্যে একটি এই।"

অদ্ভুত জুতো দুটো হাতে তুলে নিয়ে আমারও আর বুঝতে কিছু বাকী রইল না। সাধারণ জুতো সে নয়। তার তলা ঠিক বাঘের থাবার মত তৈরী। মাটির ওপর চাপ দিলে ঠিক বাঘের পায়ের দাগই পড়ে।

মামাবাবু বললেন— "এই জুতোই তার বিরুদ্ধে খুনের প্রধান প্রমাণ। এই জুতো পায়ে দিয়েই সে আমাদের তাঁবুতে হানা দিয়েছে, পথের মাঝে আমাদের অনুচরকে খুন করেছে। লাওচেনের পায়ের মাপ অসাধারণ না হলে এ জুতো পেয়েও, তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ প্রমাণ করতে আমাদের বেগ পেতে হত।"

কিন্তু এ প্রমাণ আমাদের প্রয়োগ করবার সুবিধা বুঝি আর হল না। খানিক বাদে লি-সিন ও মঙপো দুজনেই হতাশভাবে ফিরে এসে জানালে, অন্ধকারে লাওচেন তাদের এড়িয়ে পাহাড়ের সেই সুড়ঙ্গ পথেই ঢুকে পড়েছে। সেখানকার গোলকধাঁধায় তার সন্ধান তারা পায়নি। মঙপো ও লি-সিন দুজনেই দূর থেকে গুলি ছুঁড়েছিল, কিন্তু লাওচেন তাতে আহত হয়েছে বলে মনে হয় না।

তাঁবুর সমস্ত লোকজন নিয়ে সুড়ঙ্গপথে আর একবার সন্ধান করা হয়ত চলত, কিন্তু তাতেও ফল পাওয়া যেত কি না সন্দেহ। লি-সিনের এ প্রস্তাবের তাই প্রতিবাদ করে আমি বললাম—"আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হার্টজ কেল্লায় যাওয়াই বেশী জরুরী নয় কি?"

মামাবাবু হেসে বললেন—"তা সত্যি, লি-সিন। মায়া বাদুড়দের চোখ সব দেখতে পায়, তার ডানা কোনো বাধা মানে না। দুবার ফসকালেও তিনবারের বার প্রতিশোধ নেবার সময় পরেও হবে। কিন্তু ইউনানের সীমান্তের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি কিনারা না করলে আর সুযোগ মিলবে না। আমাদের এখুনি রওনা হতে হবে।"

pathagar.net

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— "দুবার ফসকাবার মানেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মায়া বাদুড় কার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়!"

মামাবাবু হেসে বললেন— "কার ওপর আবার! তাদের বিশ্বাসঘাতক ভূতপূর্ব সর্দার লাওচেনের ওপর।"

"তাহলে সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে আমাদের শাসিয়ে চিঠি দেবার মানে কি। আপনাকেও জখম করে ধরে নিয়ে যাবার কি উদ্দেশ্য!"

মামাবাবু আবার হেসে উঠলেন—"সে রাত্রে মায়া বাদুড় আমাদের শাসিয়ে চিঠি দেয়নি, শাসিয়েছিল লাওচেনকে!"

"লাওচেনকে! আপনি কি করে জানলেন?"

মামাবাবুর চোখে কৌতুকের দৃষ্টি দেখেই আমার মনে পড়ে গেল, খানিক আগে তাঁর মুখে বিশুদ্ধ চীনে ভাষা আমি শুনেছি।

আমার বিমূঢ় মুখের দিকে চেয়ে, হেসে মামাবাবু বললেন—"চীনে ভাষা যে আমি জানি তা তখন ইচ্ছে করেই প্রকাশ করিনি, লাওচেন কি বলে দেখবার জন্যে! সে নিজের সুবিধামত সেই চিঠির ভুল ব্যাখ্যা আমাদের শুনিয়েছিল। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই সে সেদিন আমাদের তাঁবুতে রাত কাটিয়েছে, আমাদের পাহারা দেবার জন্যে নয়।"

"কিন্তু আপনাকে জখম করে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া!"

"আমায় জখম লাওচেনই করে তার পিস্তলের বাঁট মাথার মেরে। যে গুলির শব্দ তুমি শুনেছিলে, তাও লাওচেনের পিস্তলের। আমি সাবধান হবার আগেই আমার পেছনে আত্মরক্ষা করে সে প্রথম লি-সিনকে গুলি করে। লাওচেনের তাঁবুতে আগুন ধরার পরও তাকে বেরুতে না দেখে লি-সিন সন্দিগ্ধ হয়ে আমাদের তাঁবুর দিকে আসছিল। লাওচেনের হঠাৎ আক্রমণের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। আমি সামনে পড়াতেই লি-সিন আর কিছু করতে পারেনি। নিজে সাঙ্ঘাতিক আহত হয়ে সে ফিরে যায়। আমি কিছু করবার আগেই লাওচেন আমাকেও আঘাত করে।"

"কিন্তু লি-সিনের রক্তের দাগ খানিক দূর গিয়েই অমন আশ্চর্যভাবে মিলিয়ে গেল কি করে। আপনাকে ও মঙপোকেই বা অমন উধাও করে কে নিয়ে গেল?"

"ব্যস্ত হয়ো না, এক এক করে বলছি। লি-সিনের রক্তের দাগ মাঝ-রাস্তায় মিলিয়ে যাওয়ার রহস্য জলের মত সোজা। সেটা বুঝলে আমার অন্তর্ধানও অনায়াসে বুঝতে পারতে। লি-সিন খানিকদূর গিয়ে আবার তাঁবুর দিকে নিজের পথে ফিরে আসে বলেই তার রক্তের দাগ আর দেখা যায়নি। তোমরা যখন রক্তের দাগের সন্ধানে বাইরে বেরিয়েছ তখন সে তাঁবুর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁবুর পর্দা চিরে ফেলেছে। প্রচুর রক্তপাত হয়ে তার অবস্থা তখন বেশ খারাপ।"

আমি নির্বোধের মত তাকিয়ে রইলাম এবার।

মামাবাবু আবার বললেন— "আমায় ধরে নিয়ে যাওয়ার রহস্য? আমায় কেউ ধরে নিয়ে যায়নি। তোমরা যখন বাইরে বেরুচ্ছ তখনই আমার জ্ঞান হয়েছে। আমার চোট তেমন গুরুতর ছিল না। আমি আর মঙপোই আহত লি সিনকে নিয়ে পালিয়ে গেছলাম।

pathagar.net

শুধু লি-সিনকে বাঁচাবার জন্যে নয়, বাইরে থেকে নিজেদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সুবিধা হবে বলে। তোমায় একটু বিপদের মধ্যে ফেলে গেছলাম বটে, কিন্তু আমি জানতাম লাওচেন তোমায় সন্দেহ করে না, আসল কাজ হাসিল হবার আগে পর্যন্ত তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।"

"কিন্তু আসল কাজটা কি!"

"আলেয়া-দারুদের দেশ আবিষ্কার!"

"আলেয়া-দারুরা অদ্ভুত জাত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের আবিষ্কার করবার গৌরব এত বড় যে তার জন্যে এত কাণ্ড এত ষড়যন্ত্র এত খুনোখুনি পর্যন্ত দরকার হল?""

মামাবাবু খানিক চুপ করে থেকে আমার দিকে কৌতুক ভরে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন—"পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিষ যে তাদের দেশে আশ্চর্যরকম প্রচুর রয়েছে, আলেয়া-দারুরা তারই জীবন্ত প্রমাণ!"

সে রাত্রে মামাবাবুর কাছে ওর বেশী আর কিছু জানতে পারিনি। হার্টজ কেল্লার উদ্দেশে রওনা হবার জন্যেই তখন আমাদের ব্যস্ত হতে হয়েছে। আমাদের অনুচরেরা সকলেই বিশ্বাসী। লাওচেনের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ ছিল না। লাওচেনের নিজের লোক যে ক'জন ছিল তারা আগেই সরে পড়েছে। সুতরাং সে দিক দিয়ে আমাদের কোনো হাঙ্গামা হয়নি।

লাওচেন একটা কথা ঠিকই বলেছিল। হার্টজ কেল্লা দিন রাত হাঁটলেও সাতদিনের আগে পৌঁছান অসম্ভব। জঙ্গলের পাহাড়ের পথে দিন রাত হাঁটা সম্ভব নয়; আমরা যাও বা তাড়াতাড়ি করছিলাম, মামাবাবুর কুঁড়েমিতে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এত পরিশ্রম করার ক্ষমতা, এত উৎসাহ যাঁর মধ্যে এতদিন দেখেছি তিনি যেন আর এক লোক হয়ে গেছেন। এরই মধ্যে মনে হচ্ছে যেন মিচিনার বাড়িতে দুপুরের দিবানিদ্রাটির জন্যে তাঁর প্রাণ আইঢাই করছে। আমাদের কাজ যে কত জরুরী তা তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন। আমরা বেশী তাড়া দিলে হেসে বলেন— "বর্মার সীমান্তের জন্যে ত আর প্রাণটা দিতে পারি না রে বাপু! তাড়াতাড়ি ত যথাসাধ্য করছি।"

এরপর আর কথা চলে না। সাতদিনের জায়গায় দশদিনে আমরা হার্টজ কেল্লায় গিয়ে পৌঁছালাম। পথের মধ্যে মামাবাবুর কাছে আমাদের অভিযানের সমস্ত রহস্য অংশ পরিষ্কার করে বুঝে নিয়েছিলাম। গোড়া থেকে মায়া বাদুড়রা আমাদের শত্রু, এই ভুল করাতেই যে সমস্ত ব্যাপার দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মায়া বাদুড়রা ইউনানের একটি গুপ্ত দল। ইউনানে নানা জাতি আছে, তাদের মধ্যে মুসু, শান লোলো জাতিই প্রধান। এই মুসুরা ইউনানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এককালে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করত। তারপর তাদের কর্তৃক লোপ পায়। মুসুদের প্রাধান্য ফিরিয়ে আনার জন্যে মায়া বাদুড় দলের সৃষ্টি হয়েছিল অনেক বৎসর আগে। কিন্তু এই দলের নেতা বিশ্বাসঘাতকতা করে বিপক্ষের কাছে দলের লোকেদের ধরিয়ে দেয়। মায়া বাদুড়দের

অধিকাংশকেই তার ফলে প্রাণ দিতে হয়। যারা তখন পালিয়ে বেঁচেছিল তারা এখনো প্রতিহিংসার সুযোগ খুঁজে ফিরছে। লি-সিন সেই পলাতক মায়া বাদুড়দেরই একজন। লাওচেন তাদের বিশ্বাসঘাতক সর্দার।

লাওচেন একটা কোনো গোপন অভিযানে যাবার জন্যে বর্মায় এসেছে সন্ধান পেয়েই লি-সিন তাকে অনুসরণ করে প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প করে। সেই সময়েই মামাবাবুও তাকে সঙ্গে যাবার জন্যে ডাকেন। মামাবাবুর কাছে সে অনেক উপকারের জন্যে কৃতজ্ঞ, সে ডাক সে উপেক্ষা করতে পারে না। কিন্তু লাওচেন কি রকম ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোক, তার গোপন অভিযানের বাধা যাকে মনে হবে, লাওচেন কি রকম পৈশাচিকভাবে তার সর্বনাশ করতে পারে, একথা জেনে লি-সিনই মায়া বাদুড়ের চিহ্ন অঙ্কিত চিঠি দিয়ে মামাবাবুকে তাঁর অভিযান বন্ধ করতে বা এক বৎসর পিছিয়ে দিতে বলে। মামাবাবু সে বারণ না শোনাতে বাধ্য হয়ে সে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। যে মায়া বাদুড়ের উল্কি লি-সিনের হাতে দেখে আমি তার বিরুদ্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলাম, মামাবাবু সেটা দেখেই তখন বুঝেছিলেন, আমাদের শত্রু মায়া বাদুড় নয়, ভয়ঙ্কর অপর কোনো পক্ষ। কম্পাস প্রভৃতি চুরি যাওয়াতে তাঁর প্রথম সন্দেহ হয় মূল্যবান কোনো দেশ আবিষ্কারই তাদের উদ্দেশ্য। আমরা খোঁজ পেলেও তার অবস্থান যাতে নির্ণয় করতে না পারি সেই চেষ্টাই তারা প্রথম করেছে। কিন্তু কোথায় সে দেশ, কি তার মূল্য প্রথমে কিছুই তিনি বুঝতে পারেন নি। লাওচেনের দলের লোক আমাদের ভেতরও আছে জেনে তিনি গোপনে তার গতিবিধি লক্ষ করছিলেন। আমাদের যে অনুচরটি নিহত হয় তার কাছাকাছি যে দু'জন অশ্বতর-চালক ছিল, তাদের ওপর তিনি ও লি-সিন দুজনেই নজর রাখেন। ঘটনার সময়ে তারা সাহায্য করতে না আসাতেই তাঁর সন্দেহ হয়। যখন আমি লি-সিনকে বনের পথে অনুসরণ করি, লি-সিন ও মামাবাবু দুজনেই সে রাত্রে সন্দিগ্ধভাবে ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখে, সেই অনুচরদের একজনের পেছু নেন। লাওচেন তখনই নিজের দলকে অন্যত্র যেতে আদেশ দিয়ে গভীর দুরভিসন্ধি নিয়ে আমাদের সঙ্গে ভিড়বার সঙ্কল্প করেছে। লাওচেনের সেই দলের সন্ধান পেয়েই লি-সিন তাদের কাছাকাছি থেকে তাদের গন্তব্যস্থান ও উদ্দেশ্য জানবার চেষ্টা করে। সেই জন্যেই সে আমাদের তাঁবুতে এসে আশ্রয় নেবার পর তার পক্ষে ফিরে না আসাই সুবিধার হয়।

লি-সিনকে একবার দেখতে পেলেই ধূর্ত লাওচেন সাবধান হয়ে যেত, তা ছাড়া তার সঙ্গে যে আমাদের যোগ আছে একথা লাওচেনকে লি-সিন জানাতে চায় নি। লাওচেন সুড়ঙ্গপথে লি-সিনের দেখা পাবার পরও সে কথা অনুমান করতে পারে নি। মামাবাবুর লাওচেনকে নিজের দলে নেওয়ার ভেতর গভীর উদ্দেশ্য ছিল। চোরের উপর তিনি বাটপাড়ি করতে চেয়েছিলেন। লাওচেন আমাদের দলে ভিড়েছিল আমাদের উদ্দেশ্য জানবার জন্যে এবং দরকার হলে সহজে পথের কাঁটা নির্মূল করে দেবার জন্যে। মামাবাবু তাকে স্থান দিয়েছিলেন তার অভিযানের আসল রহস্য গোপনে জেনে নেবার জন্যে। লাওচেন আলাদা তাঁবুতে থাকলেও মামাবাবু মঙপোর সাহায্যে তার কাগজপত্র উল্টে জেনেছিলেন, আলেয়া-দারু বলে এক অদ্ভুত জাতের দেশ আবিষ্কার করাই তার উদ্দেশ্য। প্রথমে ব্যাপারটা তিনি কিছু বুঝতে পারেন নি। তারপর আলেয়া দারুদের হাড়ের ভেতরে

দিয়ে রাত্রে আশ্চর্য আলো বেরোয় জানতে পেরে সমস্ত রহস্য তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়! সেই মুহূর্ত থেকেই লাওচেনের অভিযানের আসল উদ্দেশ্য বুঝে তাকে ব্যর্থ করবার সঙ্কল্প তিনি করেন।

মামাবাবু খনিজতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, কিন্তু কিছুদিন আগে আমেরিকার একটি আশ্চর্য ঘটনার সংবাদ খবরের কাগজে না পড়লে আলেয়া-দারুদের ব্যাপার তিনি বোধ হয় বুঝতে পারতেন না। আমেরিকার সেই খবর থেকে সেখানকার একটি ঘড়ির কারখানার কয়েকজন কর্মচারীর আশ্চর্যভাবে মৃত্যুর কথা জানা যায়। সে রোগ আর কিছু নয়, দেহের ভেতর রেডিয়ামের ক্রিয়া। ঘড়ির কাঁটা ও ঘন্টা যাতে অন্ধকারেও দেখা যায় সেই জন্যে রেডিয়াম-মিশ্রিত একটি পদার্থ দিয়ে তাদের ঘড়ির ডায়ালে দাগ দিতে হত। লেখবার কলম মুখের লালায় ভিজিয়ে তারা সে কাজ করত। এইভাবে সামান্য মাত্র রেডিয়াম তাদের উদরে গিয়ে রক্তে সঞ্চারিত হয়। রেডিয়ামের ধর্ম যে, শরীর থেকে তা বেরিয়ে যায় না, দেহের সমস্ত হাড়ের ওপর গিয়ে জমা হতে থাকে এবং সেখান থেকে প্রচণ্ড শক্তিমান জ্যোতিকণা বিকীকরণ করে দেহের রক্তকণিকা নষ্ট করে দেয়। এই কর্মচারীদের দেহেও রেডিয়ামের ক্রিয়া এইভাবে প্রকাশ পায়। রাত্রে অন্ধকারে তারা নিজেদের শরীরের ভেতর থেকে আলো বেরুতে দেখে প্রথম চমকে ওঠে। তারপর ডাক্তারের পরীক্ষায় সমস্ত রহস্য প্রকাশ পায়। আলেয়া-দারুদের দেশে কোনো না কোনো জলের উৎসে যে রেডিয়াম-লবণের অস্বাভাবিক প্রাচুর্য আছে এবং তাদের শরীরের উজ্জ্বল আলো যে সেই রেডিয়াম-লবণেরই পরিচয়, একথা বুঝে সে দেশে এই মূল্যবান ধাতুর অত্যন্ত সমৃদ্ধ খনি আবিষ্কারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হন।

লাওচেনের দ্বারা আহত হয়েও সে রাত্রে আমাদের বিমূঢ় করে কিভাবে তিনি অন্তর্হিত হন তার কথা আগেই বলা হয়েছে। যে তিনজন বৌদ্ধ শ্রমণের কথা শুনেও আমরা তেমন গা করিনি, তারাই মামাবাবু, লি-সিন ও মঙপো। বৌদ্ধ শ্রমণের বেশেই তাঁরা আমাদের আগে আলেয়া-দারুদের দেশ সন্ধান করেছেন এবং সেখানে আমি দারুদের হাতে বিপন্ন হবার পর আমায় রক্ষা করেছেন। দারুদের সেই পূজানুষ্ঠানের রাত্রে আমার হাতের জলের পাত্র ছুঁড়ে না দিলে এতদিনে আমার সেই আলেয়া-দারুদের অবস্থাই হত। আমি পাহাড়ের সুড়ঙ্গপথে যে আশ্চর্য জলের কুণ্ড দেখেছিলাম, সেইটিই রেডিয়ামের প্রধান উৎস। শুধু তার জলে রেডিয়াম-লবণ প্রচুরভাবে মিশ্রিত যে আছে তা নয়, তার গা দিয়ে রেডিয়ামের প্রধান আকর পিচব্লেণ্ডের বড় বড় শিরা জলের তলায় নেমে গেছে। সেখানে লি-সিনের সঙ্গে মামাবাবুও ছিলেন। লি-সিন সেদিন আমায় ডাকবার জন্যেই পিছু নিয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে ভুল বুঝেছিলাম। লি-সিনকে এই ভুল বোঝার জন্যে মামাবাবুর গোপন আস্তানায় লাওচেনকে নিয়ে গিয়ে আমি নিজেদের কি সর্বনাশ যে করতে বসেছিলাম ভাবলেও এখন শিউরে উঠতে হয়।

মামাবাবুর কাছে আমাদের অভিযানের সমস্ত রহস্য জেনে কিন্তু আমি আরো হতাশই হয়ে গেলাম। এত কষ্টের পর মামাবাবুর আবিষ্কার এভাবে লাওচেন আত্মসাৎ করে নেবে ভাবলেও যেন মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে। মামাবাবুর কিন্তু সে বিষয়ে কোনো উদ্বেগই

boiRboi.net

যেন নেই। সাতদিনের জায়গায় দশদিনে হার্টজ কেল্লায় পৌঁছেও তাঁর বিশেষ দুর্ভাবনা দেখতে পেলাম না। হার্টজ কেল্লায় আমাদের অবশ্য মামাবাবুর পরিচয় পাবার পর বেশ ভালো রকমই খাতির হল। বেতারযন্ত্রে বর্মা সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রীকে খবর পাঠানর কথা শুনে কিন্তু কেল্লার অধিনায়ক বেঁকে দাঁড়ালেন। এ রকম অদ্ভুত অন্যায় বায়না শুনতে তিনি কিছুতেই পারেন না।

মামাবাবু একটু হেসে বললেন— "যদি এই ব্যাপারের ওপর বর্মা, চীন, ইউনানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তবুও না?"

লেফটেনান্ট ব্লাইদ গম্ভীরভাবে বললেন— " আপনার কথার মানে বুঝতে পারছি না।"

মামাবাবু আধঘণ্টা ধরে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে দেবার পর কিন্তু লেফটেনান্ট ব্লাইদ ভয়ঙ্কর রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন দেখা গেল।

"এর মানে যুদ্ধ, বুঝতে পারছেন, মিঃ রায়? ফাঁকি দিয়ে এভাবে নিজের সুবিধামত সীমান্ত নির্দেশ করে নিলে যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী!"

মামাবাবু হেসে বললেন—"সেইটেই ত নিবারণ করতে চাই।"

এরপর বেতারে খবর পাঠান সম্বন্ধে কোনো অসুবিধা আর হল না। মামাবাবু সীমান্ত-নির্দেশের মূল অফিসে বৈদেশিক মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করে পাঠালেন— "ইউনানের সঙ্গে বর্মার সীমান্ত-নির্ণয় শেষ হয়ে গেছে কি না?"

তখন আমরা সকলে সেখানে সমবেত হয়ে উদ্বিগ্নচিত্তে উত্তরের প্রতীক্ষা করছি।

উত্তর আসতেও বিশেষ বিলম্ব হল না। সে উত্তরে বুক কিন্তু একেবারে দমে যাবারই কথা। বৈদেশিক মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, সীমান্ত নির্ণয়ের কাজ একেবারে সম্পূর্ণ। ইউনান সরকার শেষ মুহূর্তে সামান্য অদল বদল করবার প্রস্তাব করে একটু গোল বাধিয়েছিলেন, তবে তাঁদের সে অনুরোধও শেষ পর্যন্ত রাখা হয়েছে।

লেফটেনান্ট ব্লাইদ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন— "বর্মা এ ফাঁকি কিছুতেই সইবে না। একটা যুদ্ধ আসন্ন, আমি আপনাকে জানাচ্ছি।"

মামাবাবু হেসে বললেন—"না, লেফটেনান্ট ব্লাইদ, যুদ্ধের আর দরকার হবে না। ফাঁকি বর্মা পড়েনি।"

আমরা সমস্বরে বললাম— "তার মানে?"

"তার মানে, আমার নোট বই পরিণামে শত্রুর হাতেই পাছে যায় এই ভয়ে আমি লঙ্গিচিউড-ল্যাটিচিউডের ঠিক হিসাব তাতে টুকে রাখিনি। ইচ্ছে করে কিছু ভুল রেখেছিলাম। ইউনান সেই ভুল হিসাব ধরে সীমান্ত নির্ণয় করে নিজেই ঠকেছে।"

pathagar.net

ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস

বেলা প্রায় আটটা।

আমার দাড়িকামান, স্নানকরা, চা খাওয়া সব শেষ হয়েছে, খবরের কাগজটা আষ্টেপৃষ্ঠে—মায় বিজ্ঞাপনগুলো পর্যন্ত—পড়ে ফেলেছি, তবু মামাবাবুর দেখা নেই! অথচ কাল থেকে ঠিক হয়ে আছে সকাল সাড়ে আটটায় আমরা নিশ্চিত বেরুব। কলকাতার বাইরে মাইল দশেকের মধ্যে একটা চমৎকার দিঘিওয়ালা বাগান বিক্রী আছে। মামাবাবু সেটি কিনবেন বলে মনে করেছেন। সেটি দেখবার জন্যেই আমাদের যাবার কথা। মাছ ধরবার একটা কায়েমী সুবিধে হবে বলে আমার উৎসাহ এ-ব্যাপারে একটু বেশী।

ঘড়ির কাঁটা আরো মিনিট পনের এগিয়ে গেল। এবার আমি সত্যি একটু অধৈর্য হয়ে পড়লাম। যা রাখতে পারবে না, সে রকম কথা দেওয়া কেন বাপু? এই সকালটা একটু সুইমিং করেও ত আসতে পারতাম। মামাবাবুকে ত চিনতে আমার বাকী নেই! এমন গেঁতো আলসে লোক বাঙালীর ভিতরও দুটি আছে কি না সন্দেহ। কোনোরকমে নিখিল-ভারত-নিদ্রা-প্রতিযোগিতায় একটা ব্যবস্থা করলে মামাবাবু আর সকলকে অনায়াসে যে সাতরাত্রি পেছনে ফেলে যেতে পারবেন, এ-বিষয়ে আমি বাজী ধরতে পারি।

হ্যাঁ, ঘুম বটে! স্বয়ং কুম্ভকর্ণকে নাক ডাকার দু-একটা প্যাঁচ মামাবাবু শিখিয়ে দিতে পারেন। নিদ্রাটাকে এমন একটা চারুকলা হিসেবে আর কেউ বোধহয় কখনো চর্চা করেনি। সকাল, বিকেল, দুপুর, রাত্রি, সময়ের বাছ-বিচার নেই, শয্যার তারতম্য নেই, যে-কোনো অবস্থায়, যে-কোনো স্থানে মামাবাবু সুযোগ পেলেই ঘুমিয়ে পড়তে পারেন ও পড়ে থাকেন। প্রচুর নিদ্রা ও তার সঙ্গে পর্যাপ্ত ভোজ মিললে যা হয় তাই হয়েছে, একে ছোটখাট গোলগাল মানুষ, তার উপর এই রকম প্রশ্রয় পেয়ে চেহারাটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় সমান হয়ে উঠেছে!

এই মামাবাবুই বর্মার সুদূর জঙ্গলে প্রসপেকটার-এর মত কঠিন কায়িক পরিশ্রমের কাজে একদিন চরম কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত।

বর্মায় মামাবাবুর শেষ কর্মস্থল হল মিচিনা। সেখান থেকে গত বছর চাকরী থেকে পেনসন নিয়ে হঠাৎ কি খেয়ালে তিনি আবার বাঙলা দেশে এসেই বাস করছেন। 'হঠাৎ' বললাম এই জন্যে যে, মামাবাবু কখনো যে বাঙলায় ফিরবেন এ-আশা তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কোনোদিন ছিল না। বিলেত থেকে মাইনিং পাস করবার পর যখন সবাই

pathagar.net

আশা করেছিল যে, তিনি দেশে এসে একটা ভালো আয়েসী চাকরী অনায়াসে যোগাড় করে নেবেন, তখন তিনি সাধ করে গিয়েছিলেন বর্মার দুর্গম অঞ্চলে অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের ও তদনুপাতে অত্যন্ত অল্প মাইনের চাকরীতে শুধু যেন বিপদের লোভে। বর্মাকেই একরকম ঘর-বাড়ী করে তোলবার পর আবার সব পাত্তাড়ি গুটিয়ে বাঙলা দেশে তিনি ফিরে আসবেন, কেউ তা ভাবেনি।

কিন্তু বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে সব রকম উৎসাহতেই বোধহয় ভাঁটা পড়ে আসে। তা ছাড়া, মামাবাবুর ভেতর চিরকাল একটা আরামপ্রিয় নিষ্কর্মা জমিদারী মনোভাব লুকিয়ে ছিল বলে আমার ধারণা। বাঙলা দেশে ফেরবার পর এখানকার জোলো হাওয়ায় সে মনোভাবটি বেশ সহজেই বিকশিত হয়ে উঠেছে। খাওয়া আর ঘুম ছাড়া তাঁর কোনো বিষয়ে উৎসাহ আছে বলেই মনে হয় না আর। ওজনে নিয়মিতভাবে বাড়া ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন তাঁর নেই।

ঘড়িতে সাড়ে আটটা!

এবার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলাম। একটা দিনও কি একটু সময়ে উঠতে নেই! মামাবাবুর মগ চাকর মঙপোকে ওপরে মামাবাবুর ঘরের দিক থেকে নেমে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিরে, মামাবাবু এখনো ওঠেননি ঘুম থেকে?"

"বাবু!" মঙপো সরল বাঙলায় জবাব দিলে, "না, তিনি ত এখন জাগাচ্ছেন।"

মঙপো বর্মিজ হলে কি হয়, বাঙলা ভাষার প্রতি তার অসীম অনুরাগ। মামাবাবুর সঙ্গে গত ছয় বছর বর্মায় থাকলেও বাঙলা শেখবার বিশেষ সুবিধে তার হয়নি। এই এক বছর বাঙলা দেশে এসে বাস করেই কিন্তু সে যথাসম্ভব সে-দুঃখ ঘুচিয়ে এ ভাষা দখল করে নিয়েছে। শুধু দখলই সে করেনি, নবীন উৎসাহে বাঙলা ছাড়া আর কিছু সে ব্যবহারই করে না, এবং আমাদের মাঝে মাঝে সে জন্যে কম বিপন্ন হতে হয় না!

আপাততঃ মঙপোর কথার অর্থবোধ অতি সহজ হলেও ব্যাপারটায় আরো বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

'জাগাচ্ছেন' অর্থে মঙপো নিশ্চয় 'জাগ্রত আছেন' বোঝাতে চেয়েছে, কিন্তু মামাবাবুর এ-রকম আচরণের অর্থ তাতে আরো দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে যে!

সব ঠিকঠিক করে এবং সময়মত ঘুম থেকে উঠেও তিনি আমায় এখানে অপেক্ষা করিয়ে রেখে দিব্যি নিজের ঘরে বসে আছেন!

বেশ রাগের সঙ্গেই সিঁড়িটা সশব্দে কাঁপিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। মামাবাবুর ঘরের দরজা খোলা। তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন, কিন্তু এখনো বিছানা ছাড়েননি। বেশ আরাম করে কোমর পর্যন্ত একটা চাদর চাপা দিয়ে একটা নতুন শিকারের মাসিকপত্র পড়ছেন।

আমায় ঢুকতে দেখেও কোনোরকম মুখের বিকার তাঁর দেখা গেল না। আমার দিকে মুখ না ফিরিয়েই, যেন ইংরেজী পত্রিকাটিকেই সম্ভাষণ করে একটু মধুর হেসে বললেন—"কিরে? ঘুম ভাঙল?"

রাগের চোটেই উত্তর আর মুখ দিয়ে প্রথমটা বার হল না।

pathagar.net

কিন্তু চুপ করেই বা কতক্ষণ রাগ করে দাঁড়িয়ে থাকা যায়, সে রাগ যদি কারুর চোখে না পড়ে? মামাবাবু শিকারের পত্রিকায় এমন তন্ময় যে আমার প্রতি কোনো রকম মনোযোগ দেবার লক্ষণই তাঁর নেই।

অগত্যা রাগটা সশব্দে প্রকাশ করতেই হল। বেশ একটু কড়া গলায় আরম্ভ করলাম—"আচ্ছা, মামাবাবু..."

মামাবাবুর কোনো প্রকার পরিবর্তন নেই। কাগজের উপর চোখ রেখেই তিনি বললেন—"ওই ড্রয়ারে বিস্কুটের টিন আছে, বার করে নে। আর এই ট্রেতে চা—"

"চা-বিস্কুট খেতে আমি আসিনি!"

এবার আমার কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় মামাবাবুরও চমক ভাঙল।

আমার দিকে ফিরে একটু অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তবে?"

"তবে! আজ আমাদের কোথায় যাবার কথা!"

"ওঃ!"—মামাবাবু একটু হাসলেন—"সেই বাগানটা দেখতে? সে আজ ত আর হয় না।"

"কেন?"—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি এমন আপনার জরুরী রাজকাজ আছে?"

"কাজ! কাজ একটু রয়েছে যে!"—মামাবাবু একটু কিন্তু হয়েই বললেন—"আজ এই মিস্টার মরগ্যান-এর সঙ্গে দেখা করতেই হবে।"

বেশ একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম—"মিস্টার মরগ্যান আবার কে?"

"মিস্টার মরগ্যান!—এই যে 'সায়ামে শিকার' বলে এই কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন!"

এবার আবার চটে উঠে বললাম—"তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, আপনারও পড়া হয়েছে, তারপর আবার দেখা করবার কি আছে?"

মামাবাবু যেন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন—"বাঃ—দেখা করতে হবে না? এরকম একটা আশ্চর্য ব্যাপার!"

"কি আশ্চর্য ব্যাপার? সায়ামে শিকার করতে যাওয়ার ভিতর আশ্চর্যটা কোথায়। যে-কেউ ত সেখানে যেতে পারে!"

"আহা, শিকারে যাওয়া নয়, মরগ্যান যে একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা লিখেছেন! সায়ামের উত্তরে লুয়ং পাহাড়ের পুবে প্রতি বছর এক জাতের বিগড়ি হাঁস আসে শীতের সময়। আর বছর মরগ্যান একটাও হাঁস সেখানে দেখতে পাননি।"

"সত্যি!" একেবারে অবাক হয়ে বললাম—"তারই জন্য আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবে? এ ত জলের মত সোজা। বিগড়ি হাঁসের পাল এবার হয়ত আসেই নি সেখানে।"

মামাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—"তা হতেই পারে না। যাযাবর হাঁসেদের স্বভাব জানলে অমন কথা বলতিস না। অসাধারণ কোনো কারণ না ঘটলে তারা প্রতি বছর আকাশপথে একই জায়গায় ফিরে আসবেই।"

pathagar.net

"অসাধারণ কারণটা কি হতে পারে তা হলে?"—জিজ্ঞাসা করলাম।

"তা বলব কি করে? মরগ্যান-এর কাছে তা জানবার জন্যেই ত যাচ্ছি। ভালো করে সব বিবরণ নিতে হবে।"

মামাবাবুকে বাগান দেখতে নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম—"মরগ্যান কোথায় থাকেন? এই ভারতবর্ষে কি?"

মামাবাবু এবার একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই কলকাতাতেই আপাতত আছেন। বিলেতের একটা বড় কোম্পানীর এজেন্ট। ব্যাঙককেও তাঁদের অফিস আছে। আর বছর সেখানে থাকবার সময় সায়ামের উত্তর অঞ্চলে শিকার করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তারই কথা এই কাগজে লিখেছেন।"

একবার শেষ চেষ্টা করে বললাম—"বিগড়ি হাঁসের রহস্যটা কি না জানলেই নয়? সুদূর সায়ামের উত্তরে কি হয়েছে না হয়েছে, আমাদের তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ আছে কিছু?"

মামাবাবুকে চুপ করে থাকতে দেখে একটু আশান্বিত হয়ে আবার বললাম—"একবার মধুর চোঙার একটা মৌমাছি থেকে কুহকের দেশের অত বড় রহস্যের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন বলে আপনি কি মনে করেন বারবার তাই হবে? রহস্য অমনি পথেঘাটে ছড়াছড়ি যাচ্ছে!"

মামাবাবু একটু হেসে বললেন—"আচ্ছা, আমি কি তা বলেছি? কিন্তু মরগ্যান-এর সঙ্গে একটু দেখা করে এলে ক্ষতি ত কিছু নেই।"

সেদিন সত্যিই মামাবাবুর সঙ্গে মিস্টার মরগ্যান-এর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হল।

মিস্টার মরগ্যান আলিপুরে একটা বেশ বড় গোছের বাড়ী নিয়ে থাকেন। বাড়ীতে তিনি একা। স্ত্রী-পুত্র আছে, কিন্তু তারা বিলেতেই থাকে।

মামাবাবুর কার্ড পাওয়া মাত্র মিস্টার মরগ্যান অতখানি খাতির করে যে আমাদের অভ্যর্থনা করবেন, তা সত্যি ভাবিনি। দেখলাম—মামাবাবুর নাম শুধু বর্মায় নয়, সায়াম ও ইন্ডো-চায়নার শ্বেতাঙ্গমহলেও বেশ ভালো রকম পরিচিত।

নামটা অত্যন্ত পরিচিত হলেও মামাবাবুকে চাক্ষুষ দেখে মিস্টার মরগ্যান বোধহয় একটু হতাশই হলেন। তাঁর হতাশাটা খুব অসঙ্গতও নয়। লম্বা-চওড়া একজন জোয়ান শিকারীর চেহারা তিনি বোধহয় আশা করেছিলেন। তার জায়গায় গোলগোল নেহাত নিরীহ চেহারার এই ছোট্ট মানুষটি!

মিস্টার মরগ্যান-এর মুখ থেকে আপনা হতেই বেরিয়ে গেল—"আপনি মিস্টার রায়!"

মামাবাবু হেসে বললেন—"কেন? বিশ্বাস করতে পারছেন না নাকি?"

মিস্টার মরগ্যান একটু লজ্জিত হয়ে পড়ে বললেন—"না, না, তা নয়, তবে কি জানেন, মানে আপনার কীর্তিকাহিনী যা শুনেছি তার সঙ্গে আপনার চেহারা ঠিক মেলে না।"

pathagar.net

মামাবাবু আবার হেসে ফেললেন, বললেন—"সেটা আমার কীর্তির দোষ, এমন চেহারার মর্যাদা রাখতে পারলে না।"

দুজনে খানিকক্ষণ এমনি হালকা কথাবার্তার পর আসল বিষয়ের আলোচনা শুরু হল। মরগ্যান তাঁর শিকারের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যা যা বললেন, সায়ামের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে যে জাতের যাযাবর হাঁস প্রতি বৎসর ঝাঁক বেঁধে নামে তাদের বিষয়ে যেসব বৈজ্ঞানিক গবেষণা দুজনের মধ্যে হল, তার অধিকাংশই আমার কাছে নেহাত জোলো ও দুর্বোধ।

দুজনের কথায় শুধু এইটুকুই বুঝলাম যে, এ রকম ঘটনা পক্ষিতত্ত্বের দিক দিয়ে অত্যন্ত অসাধারণ এবং রীতিমত রহস্যজনক। এমন কি, এই সূত্রে যাযাবার পাখীদের সম্বন্ধে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ খানিকটা উল্টে যাবার সম্ভাবনাও নাকি আছে।

বলাই বাহুল্য যে, এ সব তত্ত্বকথায় কিছুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। দুজনের আলোচনা যত দীর্ঘ হয়ে উঠছিল, আমি তত অস্থির হয়ে উঠছিলাম এ প্রসঙ্গে শেষ হবার আশায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরগ্যান-এর কাছে বিদায় নিয়ে আসবার সময় তাঁর একটা কথা আমাকেও একটু কৌতূহলী করে তুলল।

মিস্টার মরগ্যান মামাবাবুকে বলেছিলেন—"দেখুন, আমার এই সামান্য শিকার-কাহিনী এত লোকের নজরে পড়বে বলেই আমি ভাবতে পারিনি।"

"কেন, আমাদের মত আর কেউ এ বিষয়ে খোঁজ নিয়েছে নাকি?"—জিজ্ঞাসা করলেন মামাবাবু।

মিস্টার মরগ্যান মাথা নেড়ে বললেন—"না, ঠিক যাযাবর হাঁসের বিষয়ে আপনাদের মত কেউ খোঁজ করেনি। তবে আমি একটা ভারী মজার চিঠি পেয়েছি কাল!"

মামাবাবু একটু যেন বেশী উদগ্রীব হয়ে বললেন—"কি রকম চিঠি?"

"একরকম চোখ রাঙান চিঠিই বলতে পারেন"—বলে মিস্টার মরগ্যান হাসলেন—তারপর আবার বললেন—"দাঁড়ান, চিঠিটা আপনাদের দেখাই।"

মিস্টার মরগ্যান নিজেই পাশের ঘরে উঠে গিয়ে একটা ফাইল নিয়ে এলেন। তা থেকে যে চিঠিটা বার করে আমাদের দেখালেন, তা পড়ে সত্যিই আমরা অবাক!

সম্বোধন নেই, ঠিকানা-তারিখ নাম-স্বাক্ষর কিছুই নেই, শুধু টাইপ-করা ক'টি লাইন ইংরেজীতে। বাঙলায় তার অর্থ হল—বন্দুক আর কলম চালান এক জিনিস নয়। সকলকে এক সঙ্গে এ দুই সাজে না। আনাড়ীর হাতে বন্দুকের চেয়ে অল্পবুদ্ধির হাতে কলম যে বেশী বিপজ্জনক এ কথা জেনে ভবিষ্যতে শিকার-কাহিনী লিখে বাহাদুরীর চেষ্টা আশা করি করবেন না।

মিস্টার মরগ্যান চিঠিখানি পড়ে নিজেই হেসে বললেন—"এ উদ্ভট রসিকতার অর্থই ত বুঝতে পারছি না। আমার তুচ্ছ শিকার-কাহিনীতে কারুর কোনোরকম চটে উঠবার কারণই ত নেই।"

মামাবাবু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। মিস্টার মরগ্যান তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—"আমার অবশ্য মনে হয়, এ আমার কোনো জানা বন্ধুর বেনামী ঠাট্টা। শিকার আমার বাই বলে, এই রকম তামাশা করেছে।"

pathagar.net

মামাবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন কে জানে? কিন্তু মিস্টার মরগ্যানের এই কথার পর আর কিছু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন না। মিস্টার মরগ্যানের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা যখন বাড়ীতে ফিরলাম তখন বেশ বেলা হয়েছে। স্নানাহারের চেষ্টা না করে মামাবাবুকে সেই অবস্থাতেই লাইব্রেরী ঘরের দিকে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার সমস্যা কি এখনো মিটল না, মামাবাবু?"

মামাবাবু গম্ভীর মুখে শুধু বলে গেলেন—"এই ত শুরু!"

মামাবাবু অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে কথাটা বললেও, মনে মনে তাঁর সন্দেহকে বিশেষ আমল আমি দিইনি।

মরগ্যান-এর সঙ্গে দেখা করে আসবার পর দুদিন একটা মফঃস্বল ফুটবল টীমের হয়ে বাইরে খেলতে যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে মামাবাবুর কাণ্ডকারখানা দেখে আমি অবাক!

"এ সব হচ্ছে কি মামাবাবু?"

"কই, কি আর হচ্ছে! এই চারটে বন্দুক, একটা ছোট কোল্যাপসিবল তাঁবু, একটা ওষুধের বাক্স, একটা দূরবীন, গোটা কতক..."

মামাবাবুর ফিরিস্তিতে বাধা দিয়ে বললাম—"তা ত বুঝলাম, কিন্তু এসব কেন?"

মামাবাবু যেন অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বললেন—"একটু বেরুতে হবে যে!"

"বেরুতে হবে? কোথায়?"

নেহাত যেন লিলুয়া যাওয়া হচ্ছে এই ভাব করে মামাবাবু বললেন—"এই প্রথমতঃ, ব্যাঙকক, তারপর সেখান থেকে রেলে উত্তরাদিত, তারপর সেখান থেকে নৌকোয় পার হয়ে হাঁটা-পথে লুয়ং পাহাড়ের পুবে..."

"আপনি যাবেন সেই পাণ্ডববর্জিত জঙ্গলপাহাড়ের দেশে?"

মামাবাবু একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন—"বাঃ, না গেলে চলে কি করে!"

"না গেলে চলে না মানে? ক'টা বিগড়ি হাঁসের উড়ো খবরের জন্যে সেই সায়ামের জঙ্গলে যাবেন? আপনার কি মাথা খারাপ নাকি!"

মামাবাবু তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর না দিয়ে পাশের টেবিল থেকে একটা খবরের কাগজ তুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন—"বিগড়ি হাঁসের রহস্যটা এত সোজা মনে কোরো না। পড়ে দেখ!"

কাগজটা আগের দিনের।

মফঃস্বলে ফুটবলে মেতে থাকবার দরুণ আমি মনোযোগ দিয়ে কাগজটা পড়েই দেখিনি। দেখলাম—কাগজের একটা জায়গা লাল কালিতে দাগ দেওয়া।

দাগ দেওয়া সংবাদটি পড়ে সত্যি স্তম্ভিত হলাম।

আমরা দেখা করে আসবার দিনই মিস্টার মরগ্যানকে তাঁর বাড়িতে কোনো অজানা আততায়ী রাত্রে আক্রমণ করে। মিস্টার মরগ্যান বাড়িতে একাই থাকেন। তাঁর চাকরবাকররা থাকে আলাদা। তারা এ আক্রমণের কিছুই জানতে পারেনি। পরের দিন

pathagar.net

সকালে তাঁর খাস বেয়ারা তাঁর শোবার ঘরে একেবারে অজ্ঞান অবস্থায় মিস্টার মরগ্যানকে দেখতে পায়। মিস্টার মরগ্যান হয়ত প্রাণে বাঁচবেন, কিন্তু হাসপাতালে তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। এখনো তাঁর জ্ঞান হয়নি। খবরটা পড়ে অত্যন্ত বিস্মিতভাবে মামাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"খবরটা খুব দুঃখের, কিন্তু এর সঙ্গে আপনার বিগড়ি হাঁসের কি সম্বন্ধ তা জানতে পারলাম না। এ ত পুলিশের তদন্তের ব্যাপার। তাদের কাছে খোঁজ নিয়েছেন?"

"নিয়েছি।"

"কি বলে তারা?"

মামাবাবু অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন—"তারা মরগ্যান-এর একজন বাবুর্চির তল্লাস করছে। ক'দিন আগে চুরি করার জন্যে মরগ্যান তাকে গাল মন্দ করে তাড়িয়ে দেন। পুলিশের বিশ্বাস—সে-ই রাগের প্রতিশোধ নেবার জন্যে এই রকমভাবে মরগ্যানকে আক্রমণ করেছে।"

"তা হলে ত গোল চুকেই গেল। আর আমাদের এ নিয়ে ভাবনার কি আছে?"

মামাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "পুলিশের এ-ব্যাখ্যা আমার বিশ্বাস হয় না।"

অবাক হয়ে বললাম—"বিশ্বাস হয় না? না বিশ্বাস হবার কি আছে? আক্রোশের বশে এ রকম আক্রমণের কথা ত হরদম শোনা যায়। তা ছাড়া যদি অন্য কোনো রকম সন্দেহ থাকে, তা হলে তার মীমাংসা ত এই কলকাতাতেই হওয়া সম্ভব।"

মামাবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন—"না, এ রহস্যের সূত্র সেই সুদূর সায়ামে আছে বলে আমার ধারণা এবং আমায় যেতেই হবে।"

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে যখন বুঝলাম, মামাবাবুর এ সঙ্কল্প টলবার নয়, তখন জোর গলায় হাঁক দিয়ে মঙপোকে ডাকতেই হল।

মঙপো এসে দাঁড়াতেই বললাম—"আমার বিছানা পত্রও গুছিয়ে নে, মঙপো।"

মামাবাবু অবাক হয়ে বললেন—"সেকি! তুই সেই জঙ্গলে কোথায় যাবি? আমি এবার একাই যাব ঠিক করেছি যে!"

একটু রাগের সঙ্গেই বললাম—"হ্যাঁ, আপনাকে একা আমি যেতে দিচ্ছি। এই আয়েসী অথর্ব শরীর নিয়ে আপনি যে ফ্যাসাদ বাধাবেন তা ত বুঝতে পারছি, সঙ্গে থাকলে তবু সামলাতে পারব।"

মামাবাবু একটু হেসে বললেন—"বেশ, চ'ল তা হলে।"

তারপর মঙপোকে আদেশ দিলেন—"যা, ছোটবাবুর বিছানাপত্রও বেঁধে দে, আর একটা মশারী আর বন্দুকও দিবি।"

মঙপোর তবু নড়বার নাম নেই। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি হল, কি রে। দাঁড়িয়ে আছিস যে?"

মঙপো গম্ভীরভাবে বললে—"আমি গেলাম!"

"অ্যাঁ! গেলাম কি রে! কি হল হঠাৎ?"

মঙপো বেশ জোরের সঙ্গে বললে—"হ্যাঁ, আমি খুব গেলাম।"

pathagar.net

এবার তার কথার মানেটা বুঝে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলাম। মামাবাবু কোনোরকমে হাসি চেপে বললেন—"বুঝেছি। ভেবেছিলাম এ যাত্রায় সঙ্গী আর কাউকে করব না। তা আর হল না! আচ্ছা, তুইও চল।"

মঙপো দাঁত বার করে হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জাহাজে কালাপানি পার হয়ে ও সিঙ্গাপুর ঘুরে ব্যাঙকক পৌঁছে যেদিন উত্তরাদিত যাবার টানা রেলপথে ট্রেনে উঠে বসলাম, তখনো সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে নেহাত ছেলেমানুষী বলে মনে হচ্ছে।

ইংরেজীতে 'ওয়াইলড গুজ চেস' বলে যে কথা আছে আমরা একেবারে সত্যিসত্যিই অক্ষরে অক্ষরে তাই করতে চলেছি বলে আমার ধারণা।

কোথায় একটা তুচ্ছ শিকারের কাহিনীতে কি বাজে খবর বেরুল ক'টা বুনো হাঁস নিয়ে, আর আমরা তার পেছনে ছুটলাম হন্তদন্ত হয়ে—এ রকম পাগলামির কোনো মানে হয়!

নেহাত দেশভ্রমণটাই লাভ!

ব্যাঙকক থেকে উত্তরাদিত রেলে বারো ঘণ্টার পথ। ট্রেনে যেতে যেতে দিগন্ত-বিস্তৃত ধানের ক্ষেত দেখলে যেন বাঙলা দেশের ভেতর দিয়েই যাচ্ছি মনে হয়। মাঝে মাঝে চাষাদের কুটীরের একটু আলাদা চেহারা ও তাদের নতুন ধরনের পোশাক না দেখলে বুঝতেই পারতাম না যে অন্য কোনো দেশে এসেছি।

উত্তরাদিতে নেমে এবার নৌকায় নান নামে জনপদের দিকে রওনা হলাম। এইবার প্রাকৃতিক দৃশ্য একটু বদলাতে শুরু করেছে। ধানের চাষই এখানকার লোকেদের প্রধান অবলম্বন, কিন্তু তার সঙ্গে জংলী কাঠের কারবার আছে। সেগুন আবলুশ প্রভৃতি দামী কাঠের ওটি একটি বড় কেন্দ্র।

উত্তরাদিত থেকে নান একশ মাইলের সামান্য কিছু বেশী। বর্ষাকালে বন্যার সময় স্টীমার পর্যন্ত এ পথে চলে।

এখন শীতের গোড়ার জল কমে যাওয়ার দরুণ এই পথটুকু পার হতেই আমাদের দিন দশেক লেগে গেল।

নানকে ঠিক শহর বলা যায় না, গ্রামও ঠিক নয়। সায়ামের বিখ্যাত লাও সর্দারদের এটি একটি প্রধান রাজধানী হলেও এখনো শহরের পর্যায়ে ওঠেনি।

লাও সর্দারদের অবস্থা আজকাল খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু আগেকার জাঁকজমক একেবারে যায়নি। কুবলাই খাঁর দ্বারা বিতাড়িত হবার আগে তারা যে এককালে চীনের অধীশ্বর ছিল, সে গৌরব তারা ভোলেনি।

সরকারী সুপারিশপত্র থাকার দরুন আমাদের খাতির-যত্ন খুব ভালো রকমই হল।

বিশেষ করে অছথামা নামে একজন তরুণ লাও সর্দার আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে এক রকম দিন রাতের সঙ্গীই হয়ে উঠল।

pathagar.net

অছথামা, আসলে অশ্বত্থামা শব্দের অপভ্রংশ। এখানকার বড় বড় সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকদের চেহারা একেবারে মোঙ্গলীয় হয়েও নামের ভেতর এই রকম প্রাচীন হিন্দু সংস্পর্শের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। মহাভারতের অনেক বড় বড় নাম ভাঙা-চোরা অবস্থায় এদের মধ্যে এখনো প্রচলিত। অছথামা বেশ চটপটে চালাক ও মিশুক ছেলে। ব্যাঙককে ইউরোপীয় স্কুলে সে পড়াশুনা করেছে, ফরাসী ভাষা বেশ ভালোই বলতে পারে, ইংরেজীও কাজ-চালান গোছের। জমিদারী দেখবার জন্যে তাকে এখানে একরকম নির্বাসনে থাকতে হয়। আমাদের সঙ্গ পেয়ে সে যেন ধন্য হয়ে গেছে!

কিন্তু আমাদের অভিযান সম্বন্ধে তার কিছুমাত্র উৎসাহ নেই। বরং প্রাণপণে সে যেন আমাদের নিরস্ত করতে চায়।

শিকার করবার কি আর জায়গা নেই? লুয়ং পাহাড়ের পুবে কি এমন শিকার পাবেন? চলুন না, তার চেয়ে ঢের ভাল জায়গায় আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি। বাঘ হাতী থেকে যত রকমের পাখী চান, সব আশ মিটিয়ে শিকার করবেন—এই হল তার বক্তব্য।

তবু লুয়ং পাহাড়ের পুবের উপত্যকায় ছাড়া আমরা আর কোথাও যেতে চাই না জেনে সে রীতিমত বিচলিত হয়ে ওঠে।

"কেন এ রকম বেয়াড়া জেদ আপনাদের বলুন ত? আমি বলছি সেখানে কোনো শিকার আপনারা পাবেন না।"

"কেন বলুন ত?"—মামাবাবুর চোখের দৃষ্টি যেন একটু তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

"কেন?"—অছথামা কেমন যেন একটু বিব্রত হয়ে বলে—"কেন, তা আর না-ই শুনলেন। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করুন। সেখানে কোনো শিকার পাবেন না। লোকজনের সঙ্গে বুনো শুয়োর পর্যন্ত সে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।"

এবার অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠে আমি জিজ্ঞাসা করি—"কি! বলছেন কি! সেখানকার লোকেরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে মানে! পালাবেই বা কেন?"

অছথামা একটু ইতস্ততঃ করে বলে—"দেখুন, আপনারা আজকালকার শিক্ষা-পাওয়া লোক, যা আপনাদের বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলে না তা কুসংস্কার বলেই হেসে উড়িয়ে দেন। আপনাদের তাই আমি কিছু বলে হাস্যাস্পদ হতে চাই না। তবে আমার আন্তরিক অনুরোধ—আপনারা ওখানে যাবেন না।"

একটু থেমে সে আবার বলে—"গেলে কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না।"

মামাবাবু একটু হেসে বলেন—"বেশ ত, আপনি ত এখানকার একজন বড় লোক। আপনি চলুন না আমাদের রক্ষাকর্তা হয়ে।"

"আমি!"—হঠাৎ অছথামার চোখে যে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ফুটে ওঠে তা সত্যি বিস্ময়কর।—"না, না, আমার যাওয়া অসম্ভব।"—বলে সে ঘর থেকেই বেরিয়ে যায়।

আমরা বিমূঢ় ভাবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাই।

আমাদের কোনোক্রমে এ অভিযান থেকে নিরস্ত করতে না পেরে বিশেষ দুঃখিত হলেও অছথামা আমাদের সাহায্যের ত্রুটি করলে না।

pathagar.net

নান থেকে লুয়ং পাহাড়ের পথ অপেক্ষাকৃত দুর্গম। কোনোরকম যানবাহন সেখানে চলে না, টাট্টু ঘোড়াই একমাত্র অবলম্বন।

অছথামা আমাদের ভালো তিনটি টাট্টু ত যোগাড় করে দিলেই, তার সঙ্গে বেশ প্রচুর রসদ। তার দৃঢ় বিশ্বাস—লুয়ং-এর অভিশপ্ত উপত্যকায় আমরা খাবার সংগ্রহ করা বিষয়েও বিপদে পড়ব।

যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ। বাইরে টাট্টু ও বাহকেরা তৈরী। অছথামা তখনো একেবারে হাল ছাড়েনি কিন্তু।

আসল বিপদটা যে কি তা কিছুতেই স্পষ্ট করে বলতে রাজী না হলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের নানাভাবে ঘুরিয়ে সে যা বোঝাতে চেষ্টা করলে তা এই যে, সে উপত্যকায় গেলে আর কেউ ফেরে না। ডিকসন নামে একজন খনিতত্ত্ববিদ সাহেব এই বৎসরই গোঁয়ার্তুমি করে লোকলস্কর নিয়ে সেখানে গিয়ে কি অবস্থায় পড়েছেন তার বিবরণও সে বলতে ভুলল না। ডিকসন সাহেব ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে আরো কয়েকবার নাকি যাতায়াত করেছেন। এ ধারে ধোঁয়াহীন কয়লার খনি পাওয়া যেতে পারে বলে তাঁর ধারণাবশে অনেক ঘোরাঘুরি করে এ পর্যন্ত তিনি কোনো ফল পাননি। এবার লোকলস্কর নিয়ে সেই সন্ধানে যাবার সময় অনেকেই তাঁকে বারণ করে, কিন্তু তিনি কারুর কথা না শুনে অগ্রসর হন। কিছুদিন বাদেই তাঁর সঙ্গের লোকদের প্রায় সকলেই সেখান থেকে ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে। তিনি এখনো প্রাণে বেঁচে আছেন কি না এবং থাকলেও তাঁর যে কি অবস্থা হয়েছে তা কেউ জানে না।

অছথামার বিবরণ শুনে মামাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"লুয়ং উপত্যকা চিরদিন কি এই রকম অভিশপ্ত?"

"চিরদিন কেন হবে? দু বছর আগেও এ উপত্যকা চাষীদের স্বর্গ ছিল বললেই হয়। প্রতি দশ মাইল অন্তর জাপানী আড়তদারেরা তখন ধান কেনবার কুঠি বসিয়েছে। কারণ এ-দিকের মত উঁচুদরের ভালো চাল সমস্ত সায়ামে হয় কি না সন্দেহ। তারপর আচম্বিতে এই সর্বনাশ!"

মামাবাবু অছথামার কথায় বাধা দিয়ে বললেন—"এখানকার চাল—জাপানেই বেশী চালান যায়?"

"সমস্ত সায়ামের চালই ত বলতে গেলে জাপানে যায়।"

মামাবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"আড়তদারেরা সব এখন কোথায়?"

"কোথায় আর!—লোকদের সঙ্গে, চাষ-আবাদ নষ্ট হয়ে যেতে তারাও একে একে সরে পড়েছে। সমস্ত লুয়ং উপত্যকায় মানুষ অধিবাসীদের মধ্যে দু-একটা জাপানী আড়তদারই টাকার লোভে এখনো হয়ত পড়ে আছে। তাদের দাদন দেওয়া ফসল এই শীতে নিজেরাই যথাসম্ভব কেটে সরে পড়তে পারলে তারা বাঁচে।"

মামাবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে খানিক চুপ করে থেকে বললেন—"সায়ামের গভর্নমেন্ট এ-বিষয়ে কি করছেন? এত বড় একটা জায়গা—যে কারণেই হোক, এ রকম জনশূন্য হয়ে যাওয়া সম্বন্ধে তাঁরা কি একেবারে উদাসীন?"

pathagar.net

"উদাসীন ঠিক বলা যায় না। কিন্তু জানেন ত এই সুদূর সীমান্তপ্রদেশের খবর, প্রথমতঃ সহজে সেখানে পৌঁছায় না, দ্বিতীয়তঃ, সরকারী কলের চাকা চিরদিনই ঘোরে অতি আস্তে। এ ব্যাপারটার সরকারী টনক এখনো ঠিকভাবে নড়েনি। তা ছাড়া ব্যাপারটা সরকারী মহলও এখনো আজগুবী কল্পনা বলেই উড়িয়ে দিতে চায়।"

মামাবাবু এবার একটু হেসে বললেন—"আজগুবী কল্পনা বলে মনে ত হতেই পারে, অছথামা! এই বিংশ শতাব্দীতে আগুনের নিঃশ্বাস-ফেলা জীবন্ত বিরাট ড্র্যাগনের অস্তিত্ব কেমন করে সহজে বিশ্বাস করা যায় বলুন!"

কথাটা শুনে আমি ত চমকে উঠলামই, অছথামা যেন আরো অবাক হয়ে গেছে মনে হল।

খানিক চুপ করে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে সে বললে—"আপনি তা হলে শুনেছেন?"

মামাবাবু শান্তভাবে বললেন—"হ্যাঁ, শুনেছি। কুসংস্কার নিয়ে হাস্যাস্পদ হবার ভয় আপনার মত সকলের ত নেই। কাল আপনার কাছে আভাস পেয়েই আমি আর পাঁচজনের কাছে এ বিষয়ে খোঁজ করি। সঙ্কোচ করা দূরে থাক, অত্যন্ত উৎসাহ ভরেই সবাই যথাসম্ভব রঙ ফলিয়ে ড্র্যাগনের কাহিনী আমায় জানিয়েছে। অবশ্য আমার তাতে এ অভিযানের উৎসাহ আরো বেড়ে গেছে।"

"আপনি ভুল করছেন, মিস্টার রায়! এসব ব্যাপার লোকে একটু রঙ ফলিয়ে বলেই থাকে বটে, তবু এর ভেতর কোনো সত্য নেই তা মনে করবেন না। আপনি যখন সব জেনেই ফেলেছেন তখন বলি শুনুন—এ ড্র্যাগনের আবির্ভাব আমাদের কাছে নেহাত আকস্মিক নয়। আজ পাঁচশ বছর ধরে লাওদের মধ্যে এই বিশ্বাস চলে আসছে যে, সায়ামের উত্তরের পাহাড়ে দেবতা রূপে যেদিন ড্র্যাগন দেখা দেবে সেইদিন থেকেই পৃথিবীতে নতুন যুগের সূত্রপাত। আজ ড্র্যাগনেব আবির্ভাব তাই আমরা সহজেই বিশ্বাস করতে পেরেছি।"

একটু থেমে আমাদের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অছথামা আবার শুরু করলে— "পশ্চিমের শিক্ষা আপনাদের মত আমিও কিছু পেয়েছি, মিস্টার রায়! কিন্তু আমার প্রাচ্য মন তার কাছে একেবারে দাসত্ব স্বীকার করেনি। আমি এখনো বিশ্বাস করি যে, পশ্চিমের বিজ্ঞান যা কল্পনাও করতে পারে না এমন অনেক রহস্য এখনো পৃথিবীতে আছে। যত আজগুবীই মনে হোক, আমি জানি এ ড্র্যাগনের কথা মিথ্যা নয়। তা ছাড়া, ড্র্যাগনের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইচ্ছে করলে এখনি আপনারা দেখতে পারেন।"

অছথামা অত্যন্ত শান্তভাবে কথাগুলো বললেও মামাবাবু পর্যন্ত এবার চমকে উঠলেন।

"প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি রকম?"

"হ্যাঁ, প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলতে পারেন। কাল রাত্রে একজন চীনে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় নান এসে পৌঁছেছে লুয়ং পাহাড় থেকে। তার একটা কাঁধ ও হাত একেবারে আগুনে ঝলসান। আপাততঃ সে অজ্ঞান অবস্থায় আমার এই অতিথিশালাতে আছে। জ্ঞান হারাবার আগে মাত্র দুটি কথা সে বলতে পেরেছিল।"

pathagar.net

উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কথা দুটি কি?"

অছথামা গম্ভীরভাবে বললে—"ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস।"

মামাবাবু ভিতরে ভিতরে আমারই মত উত্তেজিত হয়ে উঠলেও বাইরে তেমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ করেননি। এখনো বেশ শান্তভাবেই বললেন—"আমরা অভিযানে বেরুবার আগে তাকে একবার দেখতে পারি কি?"

"নিশ্চয়"—বলে অছথামা উঠে পড়ল।

অছথামার অতিথিশালার যে ঘরটিতে আমাদের থাকবার জায়গা হয়েছিল, তারই পাশের লম্বা বারান্দা দিয়ে অছথামা খানিক দূর আমাদের নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে হাজির করলে।

ঘরের মাঝখানে একটি বিছানার চার ধারে বেশ ভীড় জমে গেছে ইতিমধ্যেই। অছথামাকে আমাদের সঙ্গে আসতে দেখে তারা সরে গেল এক পাশে। চীনে লোকটি এখনো অজ্ঞান অবস্থায় এক পাশ ফিরে শুয়ে আছে। ডান কাঁধ ও পিঠটা আগুনে ঝলসে এমন একটা চেহারা হয়েছে যে তাকাতে ভয় হয়। পোড়া ঘায়ের উপর স্থানীয় কোনো মলম লাগানো হয়েছে।

লোকটার আগুনে ঝলসান পিঠ দেখেই হয়ত ফিরে আসতাম। হঠাৎ অজ্ঞান অবস্থাতেই যন্ত্রণায় কাতরে লোকটা চিত হবার চেষ্টা করলে। সেই মুহূর্তে তার মুখ দেখতে পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

এ যে লি-সিন!

আমাদের 'কুহকের দেশে'র সেই ভয়ঙ্কর অভিযানের সঙ্গী ও সহায়, ভুলক্রমে সন্দেহ করে আমি যার প্রতি একদিন চরম অবিচার করেছিলাম।

নিয়তির কি আশ্চর্য সংঘটন! লি-সিন হঠাৎ আমাদের এই নতুন অভিযানের পথে এই অবস্থায় উদয় হবে কে ভাবতে পেরেছিল?

মামাবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি না হলে আমি হয়ত মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেই ফেলতাম, কিন্তু মামাবাবুর চোখের ইসারায় বুঝলাম, লি-সিনকে যে আমরা চিনি এ কথা প্রকাশ করতেই তিনি চান না।

মামাবাবুর এই অদ্ভুত খেয়ালে অত্যন্ত বিস্মিত হলেও নিঃশব্দে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

মামাবাবু সোজা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তৎক্ষণাৎ টাট্টুতে চেপে লুয়ং পাহাড়ে রওনা হবেন, এটা কিন্তু ভাবতে পারিনি। লি-সিনের শুশ্রূষার চেষ্টা না হয় না-ই করা গেল, তার জন্যে লোকের অভাব হবে না বলে মনে হয়, কিন্তু লি-সিনের কাছে ড্র্যাগনের রহস্য জানবার জন্যে তার জ্ঞান হবার অপেক্ষায় থাকা আমাদের উচিত ছিল না কি?

তাছাড়া ড্র্যাগনের রহস্য যাই হোক, লি-সনের মত আমদের বিশ্বস্ত অনুচরের কাছে ওই অঞ্চলের কিছু সংবাদ ত পাওয়া যেত। এই সংবাদ সংগ্রহের সুযোগে অবহেলা করার সত্যি কোনো মানেই খুঁজে পেলাম না।

pathagar.net

কলকাতা থেকে বুনো হাঁসের রহস্য সন্ধানের নামে যখন বেরিয়েছিলাম, তখন সত্যিই এই অভিযান এমন সাংঘাতিক রূপ নেবে ভাবিনি। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে ছেলেখেলা বলেই মনে হয়েছিল।

মিস্টার মরগ্যান তখন অজানা আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় আছেন সত্য, কিন্তু তাঁর দুর্ঘটনাটার সঙ্গে আমাদের অভিযানের কোনো সম্পর্ক আছে বলে সত্যিই তখন ভাবিনি।

এখন কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম, মরগ্যান-এর উপর আক্রমণ, লি-সিনের আগুনে ঝলসে নান জনপদে এসে আশ্রয় নেওয়া, জীবন্ত ড্রাগন সম্বন্ধে এ-অঞ্চলের গুজব—কোনোওটাই অবান্তর ঘটনা নয়। কি একটা জটিল দুর্বোধ্য যোগসূত্র এ সবের মধ্যে আছে!

কি সে যোগসূত্র? এ সমস্ত রহস্যের আসল মূল কি?

মামাবাবুকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। এই কয়দিন তিনি যেন আর এক মানুষ হয়ে গেছেন। অবিরাম অক্লান্তভাবে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো দিকে লক্ষ তাঁর নেই। লুয়ং পাহাড়ই এখন তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই।

কলকাতা থেকে এ অভিযানে বার হবার সময় থেকেই তাঁর এই অসাধারণ একাগ্রতা অবশ্য আমার লক্ষ করা উচিত ছিল। কোনো নিষেধ-বাধা তিনি মানেননি, কোনো কিছু তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। মিস্টার মরগ্যান যখন হাসপাতালে মুমূর্ষু তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা পর্যন্ত তিনি করেননি, পরম বিশ্বস্ত অনুচর লি-সিনকে এতদিন বাদে এমন বিপন্ন অবস্থায় দেখেও তাকে না দেখার ভান করে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন! কোনোমতে বিলম্ব যেন তাঁর সইছে না!

কি তিনি মনে মনে ভেবেছেন কে জানে! কিন্তু তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমার ও মণ্ডপোর অবস্থা ত কাহিল। মামাবাবু যেন অন্য মানুষ! ওই আয়েসী দেহে এত শক্তি ও সহিষ্ণুতা কোথায় যে লুকিয়ে ছিল কে জানে! কোথায় গেছে তাঁর ঘুম আর বিশ্রাম আর খাওয়াদাওয়া! শুধু এগিয়ে চল আর এগিয়ে চল।

সে এগিয়ে চলার রীতিও আবার তাঁর খেয়াল অনুযায়ী!

অছথামা যে টাট্টু ও লোকজন সঙ্গে দিয়েছিল, দু'দিন দু'রাত্রি তাই নিয়ে অগ্রসর হবার পর, হঠাৎ একদিন ভোর রাত্রে মামাবাবু গায়ে হাত দিয়ে নিঃশব্দে আমাদের জাগিয়ে তুললেন।

শীতকাল তখন শুরু হয়ে গেছে। যে পাহাড়ের অঞ্চলে আপাতত আমরা এসে পড়েছি, সেখানে ভোরের ঠাণ্ডাটা মারাত্মক রকমের।

এই শীতে মোটা কম্বলের তলায় আরামের শয্যা ছেড়ে ওঠা যে কি কষ্টকর তা বোঝাবার প্রয়োজন নেই, তবু মামাবাবুর আদেশে উঠতেই হল।

pathagar.net

অন্যান্য অনুচরেরা তখন ঘুমোচ্ছে। তাদের কিছু না জানিয়ে, নিতান্ত দরকারী কয়েকটি জিনিষ ও যথাসম্ভব কম কম্বল টাট্টুর পিঠে চাপিয়ে মামাবাবুর ইঙ্গিতে বেরিয়ে পড়লাম।

খানিক দূর গিয়েই মামাবাবু সোজা ও বাঁধা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের পথ ধরলেন।

এতক্ষণ কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করিনি। এবার কৌতূহল আর দমন করতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—"এ রকম করে লুকিয়ে পালিয়ে এলে কেন বল ত?"

মামাবাবু সংক্ষেপে বললেন—"যে কারণে লুকিয়ে পালাতে হয়!"

কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম—"কেন? আমাদের কোনো বিপদের সম্ভাবনা ছিল নাকি? এই এতখানি রাস্তায় কোনো বিপদ ত হয়নি!"

"হয়নি বলেই হবে না এমন কোনো মানে আছে?"

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—"তোমার দার্শনিকতা রেখে দাও। হঠাৎ এতকাল পরে আমাদের বিপদ ঘটাতে চাইবে কে?"

তেমনি সংক্ষেপে জবাব এল—"যারা আমাদের এতকাল পরে বিপজ্জনক বলে মনে করছে।"

মামাবাবুর কাছে আপাতত কোনো কথাই বার করা যাবে না বুঝে একটু রাগ করেই টাট্টুটাকে সবেগে চালিয়ে এগিয়ে গেলাম।

রীতিমত পাহাড়ের দেশে এবার এসে পড়েছি। উপত্যকাটি যেন বিশাল ধাপে ধাপে ক্রমশ বিরাট পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে। এই রকম ধাপে ধাপে না উঠলে এ উপত্যকা কখনো চাষের উপযোগী হত না। প্রকৃতির আসল রূপ এখানে কঠোর, কিন্তু মানুষ নিজের জোরে যেন তার কাছে অনিচ্ছার দান আদায় করে নিচ্ছে।

যত এগিয়ে চলছিলাম ততই সমস্ত দেশটার উপর একটা ভয়ঙ্কর অভিশাপের ছায়া যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম।

বিশাল দিগন্ত-বিস্তৃত ধানের ক্ষেত—কিন্তু অযত্নে অবহেলায় পড়ে আছে। এক-একটা গ্রাম চোখে পড়ছে। কিন্তু সে গ্রামে মানুষজন নেই। চাষীরা যা কিছু আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে নামহীন আতঙ্কে যেন হঠাৎ পালিয়ে গেছে দেশ ছেড়ে!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই জনশূন্য অভিশপ্ত দেশের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে দিনের আলোতেও যেন নামহীন একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা মনের ভেতর জাগতে থাকে।

চার ধারে বিরাট যে অভ্রভেদী পাহাড়গুলি এ উপত্যকাকে ঘিরে আছে, মনে হয় সেগুলি যেন মূর্তিমান নিষেধের প্রাচীর। দেবতার কোপ যে এই উপত্যকার উপর পড়েছে, ভ্রূকুটি-ভীষণ পাহাড়গুলিতে তারই যেন নির্দেশ!

সারাদিন অক্লান্তভাবে পথহীন মাঠ বনের ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম। মাঝে শুধু একটু আহার করবার মত অবসর মামাবাবু আমাদের দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, এতখানি পথের মধ্যে দু-একটি পাখী ছাড়া কোনো জনপ্রাণী আমাদের চোখে পড়েনি।

সন্ধ্যায় উপত্যকার দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছে আমাদের যাত্রা থামল। উপত্যকার দ্বিতীয় স্তরটি খুব বেশী চওড়া নয়। অত্যন্ত বন্ধুর হলেও এখানেও ধানের চাষ হয়। নীচের স্তর থেকে দু

হাজার ফুট উঁচু বলে এখান থেকে সমস্ত নীচের উপত্যকাটি ছবির মত বেশ ভালো রকম দেখা যায়।

দ্বিতীয় স্তরের পরই পাহাড় প্রায় খাড়াভাবে মেঘলোকে উঠে গেছে। ছোট-বড় পাথরের স্তূপ ও টিবি দ্বিতীয় স্তরটিতে বড় কম নেই।

এই রকম একটি পাথরের স্তূপের পাশে আমাদের রাতের মত ডেরা বাঁধবার ব্যবস্থা করে, মামাবাবু হঠাৎ আর একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলেন।

মঙপো আমাদের তিনটি টাট্টুকে দড়ি সমেত কয়েকটা পাথরের সঙ্গে বাঁধতে যাচ্ছিল। মামাবাবু তাকে নিষেধ করে হঠাৎ গলার দড়ি খুলে এক এক করে তিনটি টাট্টুকে পেছনে চাবুক মেরে ছেড়ে দিলেন।

টাট্টুগুলোও যেন প্রথমে এই ব্যাপারে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় চাবুক পড়বার পর আর তাদের কিছু বলতে হল না। পাথরের পথে খটাখট খুরের শব্দে নিস্তব্ধ উপত্যকা কাঁপিয়ে তারা সবেগে নীচের দিকে নামতে নামতে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশে গেল।

আমি হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"করলে কি মামাবাবু? এই বিপদের দেশে ওই বাহন ক'টিই যে আমাদের ভরসা।"

মামাবাবু একটু হেসে বললেন—"ক'টা টাট্টুর ভরসায় কি এই বিপদের দেশে এসেছি বলতে চাস?"

"কিন্তু তা বলে ওদের ছেড়ে দেবার কি মানে হয়!"

"ছেড়ে দিলাম ওরা নিজেদের ঘর চিনে ঠিক ফিরে যাবে বলে!"

আরো বিস্মিত হয়ে বললাম—"তারপর? অছুথামা আর তার লোকেরা কি ভাববে! তারা নিশ্চয় মনে করবে আমাদের কোনো সাংঘাতিক বিপদ হয়েছে!

"তাই মনে করাতেই ত আমি চাই।"

"তার মানে?"

"তার মানে এখন থেকে আমাদের অজ্ঞাতবাস শুরু। আমরা যে বেঁচে আছি, এ কথা কাউকে জানাতে চাই না।"

"তাও কি দরকার?"

মামাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—"আমার ত তাই ধারণা।"

"তা হলে আপনি ড্র্যাগনের কিংবদন্তীর ভেতর একটু সত্য আছে বলে বিশ্বাস করেন?"

মামাবাবু আমায় একেবারে অবাক করে বললেন—"কিছু না, আমি তার সবটাই সত্যি বলে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস, ড্র্যাগন আমরা শীগগিরই দেখতে পাব।"

আমার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বার হল না। বিংশ শতাব্দীতে মামাবাবুর মত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের লোক জীবন্ত ড্র্যাগনে বিশ্বাস করে এই অসম্ভব কথা শুনে আরো কতক্ষণ আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম বলতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ আমাদের পেছনে মঙপো চেঁচিয়ে উঠল—"জ্বালা করছে! জ্বালা করছে!"

জ্বালা করছে কি? বিষাক্ত কিছু কামড়াল নাকি?

pathagar.net

সভয়ে আমরা তার কাছে ছুটে গেলাম। মামাবাবু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় জ্বালা করছে? কি কামড়াল দেখেছিস?"

মঙপো উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে বললে—"কামড়ে না, কামড়ে না! জ্বালা করছে, ওই পাহাড় জ্বালা করছে।"

"পাহাড় জ্বালা করছে!" অবাক হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে মামাবাবু হেসে ফেলে বললেন—"তাই বল হতভাগা, পাহাড়ের এক জায়গায় আগুন জ্বলছে।"

মঙপো অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে—"হ্যাঁ, আমি ত বলি আগুন জ্বালা করছে।"

"তোমার মুণ্ডু জ্বলছে হতভাগা!" মামাবাবু ধমকে উঠলেন—"ফের যদি তুই বাঙলা বলেছিস ত দেখবি!"

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—"আগুনটা কিন্তু কেমন রহস্যজনক মনে হচ্ছে। জঙ্গলের আপনা হতে জ্বলা আগুন এ নয়, সুতরাং একটু সন্ধান নিতে হবে।"

মঙপোকে আমাদের ডেরায় পাহারায় রেখে দুজনে একটি করে বন্দুক নিয়ে সন্তর্পণে এবার সেই আগুন লক্ষ করে এগুতে লাগলাম।

খুব বেশী দূরে নয়। আমাদের ডেরার আধ মাইলের মধ্যেই একটা ছোট পাহাড়ের পাশে সেটি জ্বলছে। কাছাকাছি আসার পর সেই আগুনের আলোতেই একটি মেটে বাড়ির খানিকটা অংশ ও একটি বিশাল ধানের মরাই দেখা গেল। বুঝলাম—এটি কোনো আড়তদারের কুঠী। আর সকলের মত এই আড়তদার এখনো বোধ হয় কুঠীতে মজুদ শস্যের মায়া ছেড়ে যেতে পারেনি।"

আমি সোজাসুজি কুঠীর ভেতরে যাবারই উদ্যোগ করছিলাম।

মামাবাবু আমায় নিষেধ করে বললেন—"দাঁড়া, একটু দেখাই যাক না আগে।"

আরো কাছে সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে বহুক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করার পরও কোনো কিছু আমরা দেখতে পেলাম না। লোকজনের কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। নিস্তব্ধ—নীরব রাত! মাঝে মাঝে জ্বলতে জ্বলতে পোড়া কাঠ ফেটে যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কিছু আমরা শুনতে পাচ্ছি না।

না, কথাটা ঠিক হল না। যে উঠোনে এই আগুন জ্বলছিল তার সামনের একটি ঘর থেকে মাঝে মাঝে কি একটা অস্ফুট আওয়াজ আসছে না?

মামাবাবুরও সে শব্দের প্রতি মনোযোগ পড়েছে বুঝলাম।

আরো খানিকক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকবার পর, দুজনে আমরা আঙিনা পেরিয়ে সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম।

ঘরের দরজা খোলা।

ভেতরে পা দেবার আগেই কিন্তু চমকে উঠতে হল।

মুখ থেকে পা পর্যন্ত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা একটি লোক সেখানে পড়ে আছে। মুখের বাঁধনের ভেতর দিয়ে এই লোকটিরই অস্ফুট গোঙানি নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম।

লোকটা কে এবং কেন এ অবস্থায় বাঁধা, সে সব কথা বিচার করবার এখন সময় নয়।

pathagar.net

তার কাতর দৃষ্টির মিনতি না দেখতে পেলেও আমরা এ সময়ে কোনো প্রকার দ্বিধা নিশ্চয় করতাম না।

মামাবাবু ও আমি দুজনে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে এক এক করে তার সমস্ত বাঁধন খুলে দিলাম।

কতক্ষণ সে এই অবস্থায় পড়ে ছিল কে জানে! আমাদের দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রথমেই সে বললে—"একটু জল।"

পাশেই একটি জলের কলসী রয়েছে দেখলাম। সেখান থেকে এক পাত্র জল তাকে দেওয়া মাত্র ব্যাকুলভাবে সেটি নিঃশেষ করে সে ধীরে ধীরে ক্ষীণ স্বরে ভাঙা ইংরেজীতে বললে—"আপনারা কে জানি না, কিন্তু আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কি বলে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছি না।"

লোকটিকে এতক্ষণ আমরা বেশ ভালো করেই পর্যবেক্ষণ করেছি। সে যে জাপানী, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। সম্ভবত এটা তারই ধানের কুঠী।

কিন্তু তার নিজের কুঠীতে কে তাকে এমন করে কি উদ্দেশ্যে বেঁধে রেখেছিল?

এই প্রশ্নই তাকে করতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় উত্তরটা আপনা হতেই মিলে গেল!

দরজার দিকে আমরা এতক্ষণে পেছন ফিরে ছিলাম। জাপানী লোকটির মুখ ছিল দরজার দিকে।

হঠাৎ তার চোখে মুখে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পেছন থেকে শুনলাম—"হিরোতার ইতিমধ্যে নতুন বন্ধু জুটে গেছে দেখছি!"

চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সমস্ত দরজা জুড়ে বিশাল চেহারার এক জোয়ান সাহেব নিষ্ঠুরভাবে আমাদের দিকে বন্দুক তুলে ধরে আছে!

কয়েকটা মুহূর্ত!

তার মধ্যে কত কি যে হয়ে গেল ভাবা যায় না। হিরোতার ভীত চীৎকার শুনতে পেলাম— "ডিকসন! এই সেই শয়তান, আমায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে এসেছে।"

আমার অবশ্য হাতটা মেঝেয় রাখা বন্দুকটার দিকে কিছুতেই যেন এগুচ্ছে না মনে হল।

সেই সঙ্গে মামাবাবুর সেই বিশাল দেহ বিদ্যুতের মত আমার সামনে দিয়ে যেন ছিটকে গেল মনে হল। তারপর একটা সজোরে পতনের শব্দ। খানিকটা ধস্তাধস্তি। তার পরেই দেখা গেল, সেই বিশালকায় শ্বেতাঙ্গকে মেঝেতে চিত করে ফেলে, মামাবাবু তার বুকের ওপর চেপে বসে বলছেন— "শীগগির দড়ি দিয়ে বাঁধ।"

আমাদের কি তখন আর দুবার বলতে হয়! হিরোতা ও আমি চক্ষের নিমেষে ডিকসনকে পিছমোড়া করে বাঁধতে লেগে গেলাম।

হিরোতার উৎসাহ দেখে কে! এক-একটা করে বাঁধন দেয় আর বলে—"শয়তান। আমায় না পুড়িয়ে মারবার জন্যে আগুন জ্বেলেছিলি! আমারই কুঠীতে? আজ তোকেই তোর নিজের জ্বালা আগুনে পুড়িয়ে মারব।"

pathagar.net

ডিকসন-এর মুখ অপমানে যন্ত্রণায় তখন রাঙা হয়ে উঠেছে কিন্তু তবু তেজ তার কমেনি। হিরোতার প্রতি কথার উত্তরে সে শুধু ইংরেজীতে একটা কথা বলে—"শূয়ার!"

ডিকসনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাগের চোটে হিরোতা তাকে সত্যিই তখুনি আগুনের কাছে টেনে নিয়ে যায় আর কি!

মামাবাবু তখন হেসে বাধা দিয়ে বললেন—"দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্যাপারটা কি সব শুনি আগে।"

হিরোতা উত্তেজিত হয়ে বললে—"শোনবার কিছুই নেই! এ শয়তানকে যত তাড়াতাড়ি নিকেশ করে দেওয়া যায় ততই ভালো। জানেন, ও আজ আমায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবার জন্যে ওই আগুন জ্বেলেছিল!"

মামাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কিন্তু কেন? তোমার ওপরই বা ওর এত আক্রোশ কিসের?"

"আক্রোশ? আক্রোশ টাকার জন্যে!" হিরোতা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল।—"আপনারা জানেন না, এদেশের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে আমার মত কত নিরীহ জাপানী কুঠীওয়ালার ও সর্বনাশ করেছে! ভয় দেখিয়ে, দরকার হলে খুন করে, ও টাকা লুঠ করেছে—এই ওর পেশা। নইলে এই নির্জন দেশে ও কিজন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে করেন?"

"কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম, ডিকসন নামে একজন খনিতত্ত্ববিদ এ অঞ্চলে ছিলেন!"

"হ্যাঁ, এই সেই ডিকসন! কিন্তু ওর খনি হল আমার মত কুঠীওয়ালাদের গুপ্তধনের খনি। আমাকে আজ সেই জন্যেই ও বেঁধে পোড়াতে যাচ্ছিল। আমার অনেক কষ্টে জমান ব্যবসার টাকা ও ত সব নিয়েছেই, তার ওপর ওর ধারণা—আমার কোথাও টাকা লুকোন আছে। সেই লুকোন টাকার সন্ধান বার করবার জন্যে ও আমায় জ্যান্ত পোড়াবার আয়োজন করেছে। এবার নিজের দাওয়াই ও একবার নিজেই চেখে দেখুক।"

মামাবাবু হিরোতার উত্তেজনায় আবার হেসে ফেলে বললেন—"আচ্ছা, সে ব্যবস্থা ত যখন হোক করলেই হবে। আপাতত দিন-কতক ওকে এই অবস্থায় বেঁধে রাখা যাক। আমার মনে হয়, ওর এই লুঠ-করা পেশার সঙ্গে আরো কিছু রহস্য জড়ান আছে। সেগুলো আমাদের জানা দরকার।"

হিরোতা একটু হতাশভাবে বললে—"রহস্য ত সব জলের মত পরিষ্কার! খুনে ডাকাতের আবার রহস্য কি?"

মামাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—"না, যত খারাপই হোক, একজন ইংরেজ এই দূর দুর্গম দেশে শুধু শুধু ডাকাতি করতে আসবে আমার বিশ্বাস হয় না।"

"ইংরেজ!"—হিরোতা আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। "ইংরেজ আপনি কোথায় দেখলেন? ও ত রুশ! জাপানীদের চিরকালের শত্রু। ওর আসল নাম হল ডিনিস্কি। ও নাম ভাঁড়িয়ে ডিকসন বলে পরিচয় দেয়।"

মামাবাবু এবার ডিকসনের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার এ সমস্ত অভিযোগ সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে?"

pathagar.net

মনে হল চাপা রাগে ডিকসন-এর মুখ দিয়ে যেন কথাই বেরুতে চাইছে না। আমাদের দিকে আগুনের মত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে অতি কষ্টে যেন বললে—"তোমাদের মত পশুদের আমি উত্তর দিতে ঘৃণা বোধ করি!"

মামাবাবু হেসে বললেন, "তা হলে বাধ্য হয়েই তোমাকে আমাদের বন্দী করে রাখতে হবে।"

হিরোতা একবার শেষ চেষ্টা করে বললে, "আপনারা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, সুতরাং আপনাদের উপর আমি কথা কইতে চাই না। কিন্তু ও শয়তান ঠিক ফাঁকি দিয়ে পালাবে দেখবেন!"

হিরোতার কথা ক'দিনের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে কে জানত।

কিন্তু তার আগেই কয়েকটি ঘটনা ঘটল, যার কাছে ও ব্যাপারও নিতান্ত তুচ্ছ।

সেই রাত্রি থেকেই হিরোতার আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমরা সময় মত এসে না পড়লে ডিকসন যে তাকে পীড়ন করে খবর বার করবার জন্যে সত্যি পুড়িয়ে মারত, এ বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই। তাই আমাদের কি করে খুশী করবে, সে যেন ভেবে পায় না। আমাদের কোনো রকম ওজর-আপত্তি না শুনে, সে আমাদের জোর করেই তার কুঠিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। সে নিজেও এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে চলে যাবে। আর সব লোক ভয়ে এ দেশ ছেড়ে যাবার পর দুটি মাত্র শান চাকর তার সঙ্গে ছিল। দুজনকে সে নান থেকে যে কোনোরকম বাহন যোগাড় করে আনতে পাঠিয়েছে। তারা বাহন নিয়ে ফিরে এলেই, সে তার যা কিছু সম্পত্তি নিয়ে এই অভিশপ্ত দেশ ছেড়ে সরে পড়বে। আমরা যখন খেয়ালের বশে এখানে এসেই পড়েছি, তখন যে-ক'দিন সম্ভব সে যেন আমাদের সেবা করতে পায়—এই হল তার বক্তব্য।

আমাদেরও এ অভিশপ্ত দেশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেড়ে চলে যাবার জন্য সে অনুরোধ বড় কম করেনি। কোনোমতে আমাদের রাজী করাতে না পেরে অবাক হয়ে শেষে জিজ্ঞাসা করলে—"কি জন্যে আপনারা এই সর্বনাশের জায়গায় এসেছেন বলতে পারেন? যদি বলেন শিকারের জন্যে, তা হলে বলব এখানে একটা বুনো হাঁসের দেখাও ত পাবেন না।"

মামাবাবু একটু হেসে বললেন—"আমাদের এখানে আসবার আসল কারণ তুমি ধরে ফেলেছ!"

হিরোতা অবাক হয়ে বললে—"কি রকম?"

মামাবাবু তারপর আমাদের অভিযানের প্রথম সূত্রপাত কি করে হয় তা বর্ণনা করে বলেছেন— "যাযাবর হাঁস পর্যন্ত কেন এখানে নামে না, তাই সন্ধান করতেই আমাদের এখানে আসা।"

খানিক অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে হিরোতা বলেছে—"বলিহারী আপনার কৌতূহল আর দুঃসাহস! কিন্তু আপনারা কি কিছুই জানেন না? কেন এ দেশ আজ জনশূন্য, কেন

Pathagar.net

আমার মত অসংখ্য হতভাগ্যকে সর্বস্ব ফেলে চলে যেতে হচ্ছে, কেন আকাশের পাখী পর্যন্ত এ উপত্যকার ওপর দিয়ে সভয়ে উড়ে যায়, তার কি কিছুই শোনেন নি?"

মামাবাবু বলেছেন—"শুনেছি, নান-এ এসেই শুনেছি। কিন্তু যে ড্র্যাগনের ভয়ে সমস্ত দেশের লোক পলাতক, এ কয়দিনে আমরা ত তার চিহ্নও দেখতে পেলাম না!"

হিরোতা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছে—"দেখতে যে পাননি, সেটা আপনাদের সৌভাগ্য মনে করুন। তবে এ সৌভাগ্য বেশী দিন নাও থাকতে পারে, তাও বলে দিচ্ছি।"

মামাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছেন—"তুমি কি স্বচক্ষে কখনো দেখেছ?"

হিরোতার স্বর আতঙ্কে সহসা রুদ্ধ হয়ে গেছে—"দেখেছি।"

তারপর যেন এ প্রসঙ্গ অসহ্য বলেই সে হঠাৎ সেখান থেকে উঠে গেছে।

মামাবাবু খানিক নিস্তব্ধ হয়ে থাকার পর অনেকটা নিজের মনেই বলেছেন—"একটা ব্যাপার কিছুতে আমি বুঝতে পারছি না।"

আমি উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করেছি—"কেমন করে এ যুগে ড্র্যাগনের অস্তিত্ব সম্ভব—তাই ত?"

মামাবাবু মাথা নেড়ে বলেছেন—"না, আমি বুঝতে পারছি না ডিকসন-এর আসল রহস্যটা কি?"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি—"ড্র্যাগনের চেয়ে তোমার চোখে ডিকসন-এর রহস্যটাই বড় হল? তারই জন্যেই বুঝি রোজ তার খাবার নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা কর। কিন্তু এতদিন বন্দী হয়েও তার তেজ ত দেখি কিছুমাত্র কমেনি।"

"না, তার কোনো লক্ষণ দেখছি না"—বলে মামাবাবু কি ভাবনায় এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন যে, তাঁকে আর বিরক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয় বলে আমি হিরোতার খোঁজে বেরিয়ে গেছি।

দুজনে প্রায় সমবয়সী বলে হিরোতার সঙ্গে এ কয়দিনেই আমার বেশ বন্ধুত্বই হয়ে গেছে বলা চলে। হিরোতা নেহাত অশিক্ষিত মুর্খ ধানের আড়তদার নয়। নিজেই সে কথা গর্ব করে বলে—"এই বিদেশে চালের কুঠিতে পড়ে থাকি বলে আমায় মুখ্খু ভেবো না, ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি দস্তুরমত পড়াশুনা করেছি। তোমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথের কবিতাও আমার পড়া। অবশ্য আমাদের নোগুচি ঢের ভালো লেখেন।"

আমি হেসে বলি—"তা হলে রবীন্দ্রনাথ পড়ে ত তুমি সব বুঝেছ! তোমাদের জাপানীদের একটা মহৎ দোষ কি জান? অবশ্য সেটা তোমাদের উন্নতিরও কারণ!"

হিরোতা তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বলে—"কী?"

"নিজেদের অন্ধ স্তুতি। নিজেদের দোষ তোমরা দেখতে পাও না।"

"কী আমাদের দোষ, একটা দেখাও"—ও প্রায় উগ্রভাবে বলে।

"দোষ তোমাদের কি কিছু নেই?"—আমি হেসে বলি—"দুর্বল পেয়ে এই চীনের উপর চড়াও হওয়াটা খুব একটা মহত্ত্ব বোধ হয়?"

pathagar.net

হিরোতা খানিক আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলে—"জাপানের চীন আক্রমণ তা হলে তুমিও অন্যায় মনে কর?"

"নিশ্চয় করি! কি অধিকারে আরেকটা জাতির স্বাধীনতা তোমরা কেড়ে নিতে চাও?"

হিরোতা মাথা নীচু করে বলে—"সত্যি ভাই, নিজের দেশের এই কলঙ্কে আমি যে কতখানি লজ্জিত, তা বলতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কি, পাছে নিরীহ নিরপরাধ চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেতে হয় বলেই আমি এই দুর্গম প্রবাসে অত্যন্ত ছোট কাজ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

হিরোতাকে তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দিয়ে আমি বলি—"না, না, তুমি আমার কথায় কিছু মনে কোরো না। জাপানীদের সবাই যে সাম্রাজ্যলোলুপতায় অন্ধ নয়, তা আমি জানি। জাপানী জঙ্গীনেতাদের এই আচরণে জাপানের অনেকেই মনে মনে দুঃখিত।"

হিরোতা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গাঢ় বেদনার স্বরে বলে—"জাপানীরা যে সত্যি কত বড় জাত, তা আশা করি তোমায় দেখাবার সৌভাগ্য একদিন হবে।"

আপাততঃ হিরোতার খোঁজে বেরিয়ে তাকে কাছাকাছি কোথাও দেখতে পেলাম না। কুঠীর কোণের দিকের মজবুত একটি ঘরে ডিকসনকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। মঙপো ঘরের বাইরে পাহারায় থাকে। তাকে জিজ্ঞাসা করেও হিরোতার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। হিরোতা কোন দিকে গেছে সে দেখেনি।

হিরোতা হঠাৎ গেল কোথায়? আমাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় তাকে একটু বেশী রকম উত্তেজিত মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু কুঠীর এলাকা ছাড়িয়ে কোনো কারণেই কোথাও যাবার লোক সে ত নয়! স্বভাবতঃ তাকে একটু ভীরু বলেই আমার মনে হয়েছে। নেহাত ব্যবসার দায়ে সে এই বিপজ্জনক জায়গায়, তার অনুচরদের নান থেকে ফেরার আশায় এ কয়দিন পড়ে আছে। পারতপক্ষে কুঠীর এলাকা ছেড়ে সে বেরুতে চায় না এটা আগেও লক্ষ করেছি।

মঙপোর কাছে হিরোতার কোনো খোঁজ না পেয়ে অন্য দিকে তাকে সন্ধান করতে যাচ্ছি, এমন সময় ডিকসনের ঘরের দরজায় পর পর কয়েকটা ধাক্কার আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালাম।

"ব্যাপার কি, মঙপো?"

মঙপো সভয়ে বললে যে, সারাদিন ডিকসন থেকে থেকে ওই রকম পাগলের মত দরজায় ধাক্কা দেয়, জানলা ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করে।

কৌতূহলভরে জানলার কাছে গিয়ে এবার ভেতরে তাকালাম। দেখলাম, ডিকসনের হাতের বাঁধন ছাড়া আর সবই খুলে দেওয়া হয়েছে। বিশাল দুষমনের মত চেহারা নিয়ে, সে হিংস্র শ্বাপদের মত যে রকম অস্থিরভাবে ঘরের ভেতর পায়চারি করে বেড়াচ্ছে তাতে সত্যি ভয় হয়। এ ঘরের দরজা-জানলা অত্যন্ত মজবুত সন্দেহ নেই, কিন্তু ওই অসুরকে তবুও বিশ্বাস কি! আমি জানলায় যাবামাত্র যে রকম হিংস্র অবজ্ঞার দৃষ্টি নিয়ে সে আমার

দিকে তাকাল, তাতে মনে হল একবার ছাড়া পেলে সে বোধ হয় আমাদের ছিঁড়ে ফেলতে পারে।

তৎক্ষণাৎ ঠিক করলাম ডিকসনের বাঁধন আরো শক্ত করার কথা মামাবাবুকে অবিলম্বে জানাতে হবে। শুধু হাতের বাঁধনের ওপর নির্ভর করে তাকে এভাবে ছেড়ে রাখা যে নিরাপদ নয়, সে বিষয়ে মামাবাবুকে সাবধান না করলেই নয়।

কিন্তু পর পর আরো উত্তেজনাময় কয়েকটি ঘটনায় মামাবাবুকে এ কথা জানাবার অবসর আর পেলাম কোথায়?

যে পাথুরে ঢিবির গায়ে ধানের কুঠীটি অবস্থিত, হিরোতার সন্ধানে তার চারধারে ঘুরে তখন ফিরছি, হঠাৎ একটা ভেঙে-পড়া জীর্ণ ঘরের দিকে নজর পড়তে থমকে দাঁড়ালাম। ঘরটি এককালে গোলা হিসেবেই ব্যবহার করা হত বলে মনে হয়। তারপর বহুদিনের অযত্নে, অব্যহারে সেটি সকল কাজের বার হয়ে গেছে।

এই ধ্বসে-পড়া পরিত্যক্ত ঘরের ভেতর থেকে কি যেন নড়াচাড়ার শব্দ পেয়ে অবাক হয়ে কাছে এগিয়ে গেলাম।

ভাঙা দরজাটা হাট করে খোলা হলেও ভেতরের অন্ধকারে কিছু ভালো করে দেখা গেল না। কিন্তু সেখানে কেউ যে আছে, এটা বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারলাম।

"ভেতরে কে?"—জিজ্ঞাসা করলাম কড়া গলায়।

কোনো সাড়াশব্দ নেই। গলা আরো চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কে ভেতরে?"

হঠাৎ ভেতর থেকে হিরোতার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"কে? মিস্টার সেন! শীগগির ভেতরে আসুন। একটা আশ্চর্য জিনিষ আবিষ্কার করেছি।"

এবার ভেতরে ঢুকে পড়ে দেখলাম, ছোট একটা হাতবাক্সের মত জিনিষ হিরোতা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে। আমি কাছে আসতেই সে উত্তেজিতভাবে বললে—"এটা কি বুঝতে পারছেন?"

যন্ত্রটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে বললাম—"পোর্টেবল ট্রান্সমিটার বলেই ত মনে হচ্ছে। বেতারবার্তা পাঠাবার এ যন্ত্র এখানে এল কি করে?"

"তাই ভেবেই ত অবাক হচ্ছি। এ ঘরটায় বহুকাল ধরে কেউ পা দেয় না, এককালে শাবল কোদাল প্রভৃতি রাখা হত। আজকাল তাও হয় না। চলে যাবার আগে কোনো দরকারী জিনিষ ফেলে যাচ্ছি কি না দেখবার জন্য নেহাত খেয়াল ভরেই ঢুকেছিলাম। ঢুকেই দেখি সামনে এই যন্ত্রটি!"—হিরোতার গলা তখনো উত্তেজনায় কাঁপছে।

"এখানে এ রকম যন্ত্র লুকিয়ে রাখতে পারে কে? রাখার মানেই বা কি?"

হিরোতা গম্ভীর হয়ে খানিক চুপ করে থেকে বললে—"এ যন্ত্র রাখার মানেটা এখনো কিছু বুঝতে পারছি না, কিন্তু কে যে রেখেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।"

একটু চিন্তা করে বললাম—"তোমার কি ডিকসনকে সন্দেহ হয়?"

"নিশ্চয়! সে ছাড়া আর কে! আপনার মামাবাবু ঠিকই বলেছিলেন। শুধু জাতিই তার পেশা নয় বলে এখন মনে হচ্ছে। তার চেয়ে গভীর কোনো শয়তানীর মধ্যে সে আছে। কিন্তু সেটা যে কি, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না।"

pathagar.net

ওই পোর্টেবল ট্রান্সমিটারটি নিয়েই সেদিন সন্ধ্যের কিছু পরে হিরোতার কুঠির একটি ঘরে বসে আমাদের আলোচনা চলছিল। সারাদিন এই যন্ত্রটাই আমাদের উত্তেজনার খোরাক জুটিয়েছে। মামাবাবুকে যন্ত্রটা এনে দেখাবার পর তিনি মন্তব্য কিছু করেননি বটে, কিন্তু সেই থেকে যে রকম গম্ভীর হয়ে গেছেন, তাতে বেশ বোঝা যায় যে আপাততঃ রহস্যকে আরো জটিল করে তুললেও, আমাদের মত তিনিও এই জিনিসটিকে অত্যন্ত মূল্যবান একটি সূত্র বলে মনে করেন।

সন্ধ্যার পরেই আমাদের প্রতিদিনকার মত খাওয়াদাওয়া শেষ হয়ে গেছে। কুঠীর সবচেয়ে প্রশস্ত ঘরটিতে একটি উজ্জ্বল লাইটের চারধারে বসে আমরা আলাপ করছিলাম। আলাপটা অবশ্য আমার ও হিরোতার মধ্যেই হচ্ছিল।

মামাবাবু আজ যেন অতিমাত্রায় নিস্তব্ধ হয়ে গেছেন। আমাদের আলোচনায় একবারও যোগ দিতে তাঁকে দেখিনি।

কতকটা তাঁর এই মৌনব্রত ভাঙাবার জন্যেই আমি এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা, এই ট্রান্সমিটার সম্বন্ধে ডিকসনকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবেন?"

মামাবাবু হেসে বললেন—"জিজ্ঞাসা করলেই কি সে সব বলে দেবে?"

কথাটা নেহাত নির্বোধের মত বলে ফেলেছি বুঝে চুপ করে গেলাম। হিরোতা কিন্তু আমাকে সমর্থন করে বললে—"সে বলতে হয়ত কিছুই চাইবে না, কিন্তু তবু হঠাৎ ট্রান্সমিটারের কথা তুললে মুখের ভাবে সে হয়ত ধরা দিতে পারো।"

"তাতেও আমাদের কি লাভ? ট্রান্সমিটারটি তারই, একথা জেনেও—"

মামাবাবু আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কথা আর তাঁর শেষ করা হল না। দরজা ঠেলে ঝড়ের মত মঙপো এসে ঘরে ঢুকে মামাবাবুর চেয়ারের পাশে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। তাঁর মুখ চোখের অবস্থা দেখে আমরা সত্যি অবাক। নিদারুণ একটা আকস্মিক আতঙ্কে সে একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে কথা পর্যন্ত বেরুচ্ছে না। মামাবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি, হয়েছে কি মঙপো?"

মঙপোর শুকনো গলা দিয়ে অনেক কষ্টে যেন বেরুল—"ড্র্যাগন!"

"ড্র্যাগন! কোথায় ড্র্যাগন?" আমরা উত্তেজিতভাবে তখন দাঁড়িয়ে উঠেছি।

মঙপো কিছু না বলে শুধু বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে। তিনজনে এবার সবেগে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু কোথায় ড্র্যাগন! এই গাঢ় অন্ধকার রাত্রে তা দেখাই বা যাবে কি করে?

কুঠীর বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ে সেই কথাই বলতে যাচ্ছি, এমন সময় হিরোতা আমার হাতে টান দিয়ে বললে—"আমার সঙ্গে এস। কোথায় মঙপো ড্র্যাগন দেখেছে, আমি জানি।"

তিনজনে হোঁচট খেতে খেতে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। একটা ঝোপ পর্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে আনবার কথা মনে হয়নি।

pathagar.net

হিরোতার সঙ্গে যেখানে এসে দাঁড়ালাম, সেটা উপত্যকার দ্বিতীয় ধাপের এক প্রান্তে। দিনের বেলায় এইখান থেকে সমস্ত নীচের উপত্যকাটা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে এখন সব একাকার!

মঙপো তখন নেহাত একা থাকবার ভয়েই বোধ হয় আমাদের পিছুপিছু এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। মামাবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ভীতজড়িত গলায় সে জানালে যে, ডিকসনের ঘরের কাছে পাহারা দিতে দিতে সে হঠাৎ দূরে নীচের উপত্যকায় যেন একটা আগুনের হলকা দেখতে পায়। কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে সে এই দিকে এগিয়ে আসে। তারপর অন্ধকারে দ্বিতীয় একটি আগুনের হলকার সঙ্গে, সে নীচের উপত্যকায় স্পষ্ট এক বিরাট ড্র্যাগন দেখেছে।

ড্র্যাগনের ব্যাপারটা তখন গাঁজাখুরি বলেই আমার ধারণা। অন্ধ কুসংস্কারের বশে মঙপো কি দেখতে কি দেখেছে মনে করে আমি তাকে ধমকে বললাম—"ড্র্যাগন দেখেছিস! ড্র্যাগন কাকে বলে তুই জানিস?"

মঙপোকে আর উত্তর দিতে হল না।

সেই মুহূর্তে নীচের উপত্যকার একটি জায়গা থেকে তীব্র আগুনের হলকা যেন হঠাৎ বিরাট পিচকারীর মুখ থেকে ছুটে এল এবং সেই হলকার আলোয় যা দেখলাম, তাতে মনে হল আমার সমস্ত শরীর অবশ করে দিয়ে শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে একটা হিমশীতল ধারা নেমে যাচ্ছে!

এই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে এমন ব্যাপার সম্ভব বলে মন কখনো মানতে চায় না, কিন্তু নিজের চোখকেই বা অবিশ্বাস করি কি করে!

নীচে যে প্রাণীটিকে দেখলাম, ড্র্যাগনের পুঁথিগত বর্ণনার সঙ্গে তা মেলে কি না জানি না, কিন্তু ভয়াবহতায় কাল্পনিক ড্র্যাগনের চেয়ে তা কোনো অংশে কম নয়। আকৃতিতে আদিম যুগের বিরাট সরীসৃপের সঙ্গে তার বোধ হয় খানিকটা মিল আছে। তেমনি বুকেহাঁটা, লম্বা, কদাকার, অতিকায় কুমিরের মত তার চেহারা! শুধু তার সারা অঙ্গ মাছের আঁশের মত উজ্জ্বল পাতে ঢাকা। সব চেয়ে ভয়ঙ্কর তার মুখ এবং সেখানেই সরীসৃপ বা কোনো জানিত প্রাণীর সঙ্গেই তার মিল নেই, শিঙওয়ালা শামুকের মুখ যদি কোনো রকমে হাজার গুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায় তা হলে এ মুখের বীভৎসতার খানিকটা আদল বোধ হয় তাতে আসে। সেই মুখ দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে যে আগুনের হলকার মত নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে—তাতেই প্রাণীটিকে সাধারণ বলে আর ভাবা যায় না, অলৌকিক কোনো বিভীষিকা বলে মনে হয়।

আগ্নেয় প্রশ্বাস ছেড়ে একবার আমাদের দেখা দিয়েই ড্র্যাগনটি যখন তার কুৎসিত বিশাল দেহটি টেনে নীচের ছোট একটি ঢিবির আড়ালে চলে গেল আমরা তখন ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। মামাবাবুই প্রথম সে স্তব্ধতা ভেঙে প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলেন—"ডিকসন! ডিকসন! ডিকসনের কাছে এখুনি যাওয়া দরকার!"

মামাবাবুকে এতখানি উত্তেজিত হতে সহজে দেখা যায় না! কিন্তু তাঁর এই অবাস্তব কথায় অবাক হয়ে বললাম—"কি বলছেন, মামাবাবু? এখুনি ডিকসনের কাছে যাওয়ার কি দরকার পড়ল?"

pathagar.net

মামাবাবু ইতিমধ্যেই মণ্ডপোকে নিয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন, সেখান থেকেই ব্যস্তভাবে ফিরে বললেন—"না, না, ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে। আমায় যেতেই হবে এক্ষুনি। তোমরা পরে এসো।"

মামাবাবু ও মণ্ডপো অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর হিরোতা ও আমি হতভম্ব হয়েই খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। মামাবাবুর হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! ডিকসনকে এ রকম একলা ছেড়ে আসা অন্যায় হয়েছে বটে কিন্তু সে ত একেবারে মুণ্ড নয়। তা ছাড়া, যে বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে এখনো আমরা অভিভূত হয়ে আছি তা থেকে হঠাৎ ডিকসনের কথা মনে হওয়াই নিতান্ত অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর নয় কি?

ব্যাপারটা যতই অস্বাভাবিকই হোক, মামাবাবুর আশঙ্কা যে অমূলক নয় খানিক পরেই তার শোচনীয় প্রমাণ পাওয়া গেল।

ড্রাগনের দেখা আর একবার পাবার আশায় আমরা আরো মিনিট পনেরো বোধ হয় সেখানে অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে নীচের সেই পাহাড়ের আড়ালে সেই যে সে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর তার দেখা পাওয়া গেল না।

মামাবাবুর জন্যে খানিকটা উদ্বিগ্ন থাকার দরুন আর সেখানে অপেক্ষা করতে পারলাম না, কিন্তু কুঠিতে যখন ফিরলাম, তার আগেই সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে।

কুঠিতে ঢুকেই দেখলাম, মামাবাবু গুরুতরভাবে আহত হয়ে বাইরের উঠানে পড়ে আছেন। মণ্ডপো তাঁর মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে।

ব্যাকুল হয়ে দুজনে কাছে ছুটে গেলাম। মামাবাবুর জ্ঞান নেই। মণ্ডপো এলোমেলোভাবে যা বললে তাতে শুধু এইটুকু বুঝলাম যে, ডিকসন কেমন করে আগে থাকতেই হাতের বাঁধন খুলে ফেলে দরজা ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল। মামাবাবুর সঙ্গে সে যখন কুঠীতে এসে পড়ে তখন ডিকসন রেডিও- ট্রান্সমিটারটি নিয়ে পালাবার উপক্রম করেছে।

মামাবাবু তাকে বাধা দিতে গিয়েই এই দুর্দশা। মামাবাবুর মাথায় সজোরে একটি লোহার ডাণ্ডা মেরে সে ট্রান্সমিটারটি নিয়ে পালিয়েছে।

এই অন্ধকার রাত্রে তার অনুসরণ করা শুধু নিষ্ফল নয়, বিপজ্জনক। মামাবাবুকে ধরাধরি করে আমরা তাঁর বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলাম। মাথার আঘাতটা অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়েছে বলেই মনে হল। মাথার পুরু ব্যান্ডেজটা রক্তে লাল। কোনো রকম চেতনা তাঁর নেই।

একদিন একদিন করে তিনদিন কেটে যাবার পরেও যখন মামাবাবুর জ্ঞান হল না তখন এক সঙ্গে আমার আশঙ্কা ও আপসোসের সীমা রইল না। ডিকসনের বাঁধন আরো শক্ত করার কথা মনে হলেও, কেন আমি মামাবাবুকে তা জানাই নি? তাহলে ত এমন বিপদ ঘটতে পারত না।

pathagar.net

মামাবাবুর চিকিৎসার ব্যবস্থাই বা কি করা যায়? এই সুদূর জঙ্গলে কোনো উপায়ই ত নেই! হিরোতার অনুচরেরা ফিরে এলে যেমন করে হোক মামাবাবুকে নান পর্যন্ত নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু তাদের ত কোনো পাত্তাই নেই! শেষে এই অজানা পাহাড়ে মামাবাবুর কি বেঘোরে প্রাণ যাবে!

সারাদিন আমি হিরোতার সঙ্গে সেই নির্জন অভিশপ্ত উপত্যকার দিকে তাকিয়ে হতাশ প্রতীক্ষায় কাটাই। দুঃখে, আপসোসে মামাবাবুর ঘর পর্যন্ত মাড়াতে আমার ইচ্ছে করে না। সেখানে যাবার উপায়ও নেই।

প্রভুভক্ত মঙপো সারাদিন হিংস্র বাঘিনীর মত সে ঘরের পাহারায় থাকে। আমাদের মামাবাবুকে ছুঁতে পর্যন্ত সে দেয় না। সেদিন আমরা মামাবাবুর সঙ্গে ফিরে এলে এ বিপদ ঘটত না, এই বিশ্বাসেই সে বোধহয় আমাদের উপর একেবারে আগুন হয়ে আছে। তার সেবা অবশ্যই একটা প্রশংসা করবার জিনিস। কি করে এই অজ্ঞান অসাড় রোগীকে সে যে খাওয়ায়, তা আমরা ভাবতেও পারি না। সে না থাকলে এই রকম রোগীর সেবা আমরা করতে পারতাম কি না সন্দেহ।

চতুর্থ দিনেও যখন মামাবাবুর জ্ঞান হল না, তখন সত্যি একেবারে হতাশ হয়ে গেলাম। মঙপোর কাছে যা শুনলাম, তাতে মনে হল মামাবাবুকে এক রাত্রের বেশী আর বোধহয় রাখা যাবে না। হিরোতার অনুচরেরা এখন এসে পড়লেও আর কোনো লাভ নেই। মামাবাবুকে এ অবস্থায় কোথাও সরান আর সম্ভব নয়। এইখানেই তাঁর শেষ শয্যা তৈরী করতে হবে।

মঙপোর বাধা সত্ত্বেও ভেতরে ঢুকে মামাবাবুর গায়ে হাত দিলাম। গা ঠান্ডা হয়ে আসছে। এ কয়দিন তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখিনি। বুঝলাম জ্বরের অসহ্য উত্তাপ এইবার মৃত্যুর শীতলতায় নেমে যাচ্ছে। এই ঠান্ডা হওয়াটা শেষের পূর্ব লক্ষণ।

ধরা গলায় একবার ডাকলাম—"মামাবাবু!"

কোনো সাড়া নেই।

কোনো রকমে কান্না চেপে একেবারে মরীয়া হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বন্দুকটা তুলে নিলাম। হিরোতা এতক্ষণ সঙ্গেই ছিল। সে অবাক হয়ে বললে—"করছ কি?"

যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বললাম—"মামাবাবু আর বাঁচবেন না তা বুঝতে পারছি। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি প্রাণ দিলেন, তা ব্যর্থ হতে আমি দেব না। এই উপত্যকার সমস্ত রহস্য আমি উদ্ধার না করে ফিরব না।"

"কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়?"

"যেখানে সেদিন ড্র্যাগন অদৃশ্য হয়েছিল সেই পাহাড়ে!"

হিরোতা ব্যাকুলভাবে বললে—"তুমি পাগল হয়েছ! এই ত সন্ধ্যা হয়-হয়। এমন সময় পাগল না হলে কেউ সেখানে যায়?"

"আমায় পাগলই তুমি ভাবতে পার"—বলে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

হিরোতা বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

pathagar.net

পাহাড়ের পথে অনেক দূর নেমে যাবার পর হঠাৎ পেছনে দ্রুত পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে ফিরে তাকালাম। দেখি, হিরোতা দূর থেকে ছুটে আসছে।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে আসবার পর আবার সামনে অগ্রসর হয়ে বললাম—"তুমি যে বড় এলে?"

হিরোতা বললে—"তোমাকে একা ছেড়ে দিই কি করে বল!"

"যাক, ভালোই হয়েছে। কিন্তু আমি সত্যি ভেবেছিলাম অতটা সাহস তোমার হবে না।"

হিরোতা রুখে উঠে বললে—"জাপানীদের তুমি ভীরু মনে কর?"

"না, ভীরু মনে করব কেন? তবে অকারণ বিপদ কে-ই বা সাধ করে ঘাড়ে করতে চায়!"

হিরোতা হেসে ফেলে বললে—"তোমার যদি কারণ থাকে ত আমারও থাকতে পারে।"

যে পাহাড়ের আড়ালে ড্রাগনকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছিলাম তার উত্তর দিক দিয়ে নীচের উপত্যকায় আমরা যখন নামলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অনেক ওপর থেকে ঠিক ধারণা করতে না পারলেও এখানে নেমে দেখলাম, এ-উপত্যকাটি বেশ বন্ধুর। উঁচু থেকে ছোট টিবি বলে যা মনে হয়েছিল, সেগুলি দেখলাম বেশ বিরাট পাহাড়।

এই উঁচু-নিচু পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে ওঠানামা করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় পৌঁছে একটি সোজা সমতল রাস্তা পেয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম! রাস্তাটির একটি বিশেষত্ব সবচেয়ে বিস্ময়কর। রাস্তার বদলে চওড়া একটি গভীর পরিখাই তাকে বলা যেতে পারে। যেন গোপন রাখবার জন্যই মাটি কেটে সেটি নীচু করে তৈরী হয়েছে।

রাস্তাটিতে নেমে অবাক হয়ে হিরোতাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"ব্যাপার কি! এখানে এ রকম একটা রাস্তা আছে, জানতে?"

হিরোতা আমার মতই বোধহয় বিস্মিত হয়েছিল, ধীরে ধীরে বললে—"এই পাঁচ বছরে ত কোনোদিন জানতে পারিনি।"

সন্ধ্যার আলোতেও আরেকটি ব্যাপার তৎক্ষণাৎ নজরে পড়ায় নীচু হয়ে পড়ে উত্তেজিতভাবে বললাম—"দেখেছ? স্পষ্ট মোটর টায়ারের দাগ। এ রাস্তা দিয়ে মোটর-লরি যাতয়াত করে, খুব সম্প্রতি করেছে।"

"দাগ দেখে ত তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপার ত আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!"

"হয়ত খানিক পরেই পারব"—বলে দুজনে এবার সেই রাস্তা ধরেই দ্রুতপদে এগিয়ে চললাম। উত্তেজনায়, মুমূর্ষু মামাবাবুর কথাও তখন মন থেকে মুছে গেছে।

রাস্তাটি ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর খাদে নেমে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে। সে পথে পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছাবার আগেই অন্ধকার নেমে এল। গভীর খাদের ভেতর সে অন্ধকার কালির মত গাঢ়। টর্চ না-জ্বেলে আর পথ দেখা যায় না।

হিরোতা হঠাৎ এক জায়গায় বসে পড়ে বললে—"সত্যি কি তুমি আজ এ রাস্তার শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়বে না?"

একটু বিরক্ত স্বরেই বললাম—"বল কি! এমন একটা রহস্যের সূত্র পেয়েও ফেলে চলে যাব! তোমার যদি ভয় করে ত ফিরে যেতে পার।"

হিরোতা আর কিছু না বলে মনে হল লজ্জিত হয়েই দ্রুতপদে এগিয়ে চলল। আমি তাকে ধরে ফেলে বললাম—"কিছু মনে কোরো না ভাই! নিজের জন্য নয়, মামাবাবুর সম্মানের জন্যই আজ আমার ফেরবার উপায় নেই।"

হিরোতা গম্ভীর মুখে বললে—"বেশ! ফিরতে তোমায় হবে না।"

বেশীদূর তারপর আর যেতে হল না। খাদের রাস্তাটি এইবার দেখা গেল দুটি ভাগ হয়ে গেছে। একটি সুড়ঙ্গ পথে সোজা সেই পাহাড়ের ভেতরেই ঢুকে গেছে, আরেকটি বাঁ-দিক দিয়ে পাহাড়টিকে প্রদক্ষিণ করেছে বলেই মনে হল। কোন পথটিতে আগে যাব ভাবছি, এমন সময় স্পষ্ট মোটর-লরির ভারী চাকার আওয়াজে চমকে উঠলাম। যেদিক থেকে আমরা এসেছি, সেই দিক থেকেই লরির আওয়াজ আসছে।

সেখানে পাহাড়ের একটি অন্ধকার ঘুপচি কোণ খুঁজে নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দ্রুতবেগে তিনটি বিরাট লরি আমাদের সামনে দিয়ে পর পর সুড়ঙ্গপথে ঢুকে গেল। লরিগুলিতে আলো নেই বললেই হয়। যা দুটি আলো মিট মিট করে সামনে জ্বলছে, তারও ওপরের দিক ঢাকা যাতে ওপরের কোথাও থেকে তা দেখা না যায়। এই সামান্য আলোতেও লরিগুলির আসল স্বরূপ আমি তখন বুঝে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। সাধারণ মাল-বওয়া লরি সেগুলি নয়, সেগুলি যুদ্ধের সশস্ত্র মোটরযান!

হিরোতা আমার মতই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তাকে একটু ঠেলা দিয়ে বললাম—"ব্যাপার কি মনে হচ্ছে? এখন কি করবে বল দেখি?"

"এখন?"—হিরোতা অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বললে—"এখন সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?"

সুড়ঙ্গপথের ভিতরে কিন্তু আর পৌঁছাতে হল না। অন্ধকারে সন্তর্পণে তার মুখ পর্যন্ত এসেছি, এমন সময় পিঠে একটা শক্ত নলের খোঁচা অনুভব করার সঙ্গে রূঢ় গলায় শুনতে পেলাম—"তোমার বন্দুকটা দাও।"

প্রথমটা একটু চমকে গেলেও হেসে বললাম—"কি রসিকতা হচ্ছে, হিরোতা? এটা কি রসিকতার সময়?"

হাত বাড়িয়ে আমার কাছ থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে হিরোতা বললে—"আমাদের রসিকতা একটু বেয়াড়াই হয়ে থাকে। ওটাও আমাদের জাতের একটা দোষ!"

হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ায় ও তার গলার স্বরের অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় এবার সন্দিগ্ধ হয়ে বললাম—"কি, বলছ কি, হিরোতা? তুমি তা হলে কি..."

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই সে অবজ্ঞাভরে হেসে উঠে বললে—"হ্যাঁ, আমি ঠিক নিরীহ চালের কুঠীওয়ালা নই। জাপানীরা এই জঙ্গলের দেশে শুধু চালের কারবার করতে পড়ে থাকে না!"

"সে কথা আমরা আগেই অনুমান করেছিলাম!"—অন্ধকারে যেন দৈববাণীর মত কে বলে উঠল!

pathagar.net

চমকে আমি অন্ধকারে চারদিকে তাকালাম। একি ভৌতিক ব্যাপার! মামাবাবুর কণ্ঠস্বর এখানে কেমন করে শোনা গেল?

হিরোতা আমারই মত টর্চ জ্বেলে এবার চারিদিকে ঘোরাতেই দেখা গেল, আমাদের অদূরে মণ্ডপোকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে মামাবাবু হাসছেন। কোথায় তাঁর সে অজ্ঞান মুমূর্ষু অবস্থা! মাথায় ব্যান্ডেজ দূরে থাক, কোনো আঘাতের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। হাতে তাঁর কোনো অস্ত্রও অবশ্য নেই, শুধু একটি ছোট বাক্স।

হিরোতার টর্চের আলোতে তিনি এবার এগিয়ে এলেন।

হিরোতা তাঁর দিকে তৎক্ষণাৎ পিস্তল তুলে বললে—"সাবধান, মিস্টার রায়, কোনো চালাকীর চেষ্টা করবেন না।"

মামাবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—"চালাকী? না, বন্দুকের বিরুদ্ধে চালাকী করবার মত আহাম্মক আমি নই। তা ছাড়া দেখতেই ত পাচ্ছ, এই বাক্সটি ছাড়া কোনো অস্ত্র আমার নেই।"

হিরোতা তীক্ষ্ণ তিক্ত স্বরে বলে উঠল—"এ ট্রান্সমিটার তা হলে আপনিই লুকিয়ে রেখেছিলেন? ডিকসন নিয়ে পালায়নি?"

মামাবাবু হেসে বললেন—"না, বোধ হয় পালাবার আগ্রহে অত খেয়াল ছিল না!"

হিরোতা আবার বিদ্রূপের স্বরে বললে—"মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে অজ্ঞান হয়ে থাকার ভান করে আমায় খুব ঠকিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না, মিস্টার রায়!"

"কেন বল তো!"—মামাবাবু অত্যন্ত সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে এসে কিছু ভুল করেছি নাকি?"

"তা একটু করেছেন বইকি! এবার ড্রাগনের সুড়ঙ্গে আপনাকে ঢুকতে হবেই যে!"

"তা নয় ঢুকলাম!" মামাবাবু হেসে বললেন—"এত কষ্ট করে গোপনে আপনারা এই দূর দুর্গম দেশে এত বড় গড় তৈরী করেছেন, এত যুদ্ধের মাল জড়ো করেছেন—এসব একবার দেখে যাওয়া উচিত নয় কি?"

"নিশ্চয় উচিত! কিন্তু এ দেখে আর যাওয়া যে কোথাও হবে না, মিস্টার রায়। ড্রাগনের সুড়ঙ্গে একবার ঢুকলে যে আর বার হওয়া যায় না।"

"তা হলে আমাদের গিয়ে কাজ নেই"—মামাবাবু এমন ভঙ্গি করে বললেন যে এই বিপদের মুহূর্তেও না হেসে পারলাম না।

হিরোতা হঠাৎ বিদ্রূপ ছেড়ে রূঢ় স্বরে বলে উঠল—"যথেষ্ট রসিকতা হয়েছে, মিস্টার রায়! এবার চলুন।"

"যদি না যাই?"

"যদি না যান!"—হিরোতা হঠাৎ পকেট থেকে একটা হুইসল বার করে তাতে ফুঁ দিলে। পরমুহূর্তে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ হাজার বাতিতে একেবারে দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠল। তার গুপ্ত অসংখ্য দ্বার থেকে প্রায় পঞ্চাশ জন প্রহরী বেরিয়ে এল সশস্ত্র।

pathagar.net

হিরোতা কিছু বলবার আগেই মামাবাবু তাদের দিকে চেয়ে হেসে বললেন—"হ্যাঁ, এবার সসম্মানে যাওয়া যেতে পারে!"

সুড়ঙ্গপথের ভেতর দিয়ে কিছুদূর গিয়েই মাথার ওপরে আকাশের তারা দেখে বুঝলাম খোলা কোনো জায়গায় এবার এসে পড়েছি। পেয়ালার তলার মত জায়গাটি চারিদিকে খাড়া পাহাড় দিয়ে ঘেরা বলে বাইরে থেকে কিছুই তার দেখা যায় না। জায়গাটিতে আলোর অভাব নেই। কিন্তু প্রত্যেক আলোর মাথার দিক সযত্নে আবৃত। এই আলোয় যুদ্ধের উপকরণসংগ্রহ ও গড়-নির্মাণের যেটুকু আভাস পেলাম, তাতেই বিস্মিত হতে হয়। যারা এই দূর দুর্গম প্রদেশে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে গোপনে এত বড় আয়োজন করা সম্ভব করেছে, তাদের ক্ষমতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

ভেতরের পাহাড়ের গায়ে একটি বাড়ীর বেশ প্রকাণ্ড একটি কুঠুরীতে কয়েকজন প্রহরীর জিম্মায় আমাদের রেখে হিরোতা একটি দরজা দিয়ে কাকে যেন আহ্বান করতে গেল। মনে মনে বুঝলাম, আমাদের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা এখুনি এরা স্থির করে ফেলতে চায়। কিন্তু খানিক বাদে যে লোকটির সঙ্গে হিরোতা আবার ঘরে ঢুকল, তাকে সত্যি আমি এখানে দেখবার কল্পনাও করিনি।

মামাবাবু কিন্তু নিতান্ত সহজভাবেই প্রথম তাকে সম্ভাষণ করে বললেন—"এই যে অছথামা! আপনাকেই আশা করছিলাম।"

"আমাকে আশা করছিলেন!"—অছথামা আমারই মত সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে।

"হ্যাঁ, তা করব না! আপনি যে রকম অতিরিক্ত উৎসাহ-ভরে ড্রাগনের ভয় দেখিয়েছিলেন, তাতে ও রকম আশা করাই স্বাভাবিক নয় কি? যাই হোক, দ্বিতীয়বার আপনার আতিথ্য গ্রহণ করে সুখী হলাম।"

"আমি কিন্তু হলাম না"—অছথামা গম্ভীরভাবে বললে—"সেই জন্যেই আপনাদের গোড়া থেকে সাবধান করতে চেয়েছিলাম। আপনি নিশ্চয় জানেন যে, অতিথি বেশী দিনের হলে তার সম্মান সব সময়ে রাখা যায় না।"

"বেশী দিনের!" মামাবাবু যেন আকাশ থেকে পড়ে বললেন—"বেশীদিন কোথায়, আমাদের আট ঘণ্টার মধ্যেই এ দেশ ছেড়ে যেতে হবে যে!"

অছথামা ও হিরোতা দুজনেই এবার উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। অছথামা বললে—"আটঘণ্টা কি বলছেন? আট বছরে এ গড় থেকে বেরুতে পারলে ধন্য মনে করবেন।"

"না, না, লাও-সর্দার"—মামাবাবু গম্ভীর ব্যঙ্গের স্বরে বললেন—"তা কি হয়! ভোরের মধ্যে আমার লুয়ং প্রাবাং না পৌঁছালেই নয়।"

অত্যন্ত রেগে উঠে অছথামা এবার ধমক দিয়ে বললে—"চুপ করুন, মিস্টার রায়! আপনি ভুলে যাচ্ছেন, কোথায় আপনি আছেন!"

মামাবাবু কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে প্রশান্ত স্বরে বললেন—"আপনারাও আমার হাতের বাক্সটার কথা যে ভুলে যাচ্ছেন।"

pathagar.net

"হাতের বাক্স!"—হিরোতা হঠাৎ চমকে উঠল। তারপর ব্যাপারটা যেন উপলব্ধি করে রাগে চীৎকার করে বললে—"শয়তান। তুমি বেতারে এই গড়ের কথা তা হলে কোথাও জানিয়েছ।"

"উঁহুঃ—উঁহুঃ—এত বোকা আমি নই, হিরোতা! আমার এখনো প্রাণের মায়া আছে। ইন্ডো-চায়না বা বর্মার গভর্নমেন্ট আমার কথায় এখানে এই গড়ের খোঁজ নিতে লোক পাঠালে আমার মাথাটা যে ধড়ে থাকবে না, এটা আমি বিলক্ষণ জানি। তাই আমি যন্ত্রটির সাহায্যে নিজেদের নিরাপদ করবার ব্যবস্থা করেছি। কোনো গোপন খবর এখনো কারুকে জানাই নি।"

"কি আপনার ব্যবস্থা, শুনি?"—অছথামা উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

মামাবাবু শান্তভাবে বললেন—"আমি শুধু আনাম-সরকারকে আমার জন্যে মেকং নদীর ধারে লুয়ং প্রাবাং-এ একটি এরোপ্লেন কাল ভোর পর্যন্ত রাখতে বলেছি। আনামের সরকারী মহলে আমার কিছু সুনাম আছে। সুতরাং এরোপ্লেন একটি সেখানে থাকবে বলে বিশ্বাস করতে পারেন।"

"সে এরোপ্লেন বৃথাই আপনার জন্য অপেক্ষা করবে!"—হিরোতা গর্জে উঠল।

মামাবাবু অবিচলিত ভাবে বললেন—"ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমার দেখা না পেলে তাদের এই উপত্যকায় আমায় খুঁজতে আসতেও বলে দিয়েছি।"

হিরোতা আবার রাগে উন্মত্ত হয়ে বললে—"শয়তান! তা হলে তোমাদের গুলি করে মারব। কুকুর দিয়ে সকলকে খাওয়াব।"

"তাতে বিশেষ কোনো লাভ হবে কি? এধারে আমার খোঁজে ফরাসী প্লেন তা হলে আসবেই, এবং এ গড়ও তাদের কাছে লুকান থাকবে না। তার চেয়ে আমায় ভোরের আগে লুয়ং প্রাবাং পৌঁছে দেওয়াই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে সব দিক এখনো রক্ষা হতে পারে।"—অত্যন্ত ধীরে ধীরে কথাগুলি বলে মামাবাবু মৃদু হেসে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

হিরোতা ও অছথামা এবার আর রেগে উঠতে পারলে না। দুজনে দূরে সরে গিয়ে খানিক মৃদুস্বরে কি পরামর্শ করে এসে বললে—"আপনাকে বিশ্বাস কি? আপনি একবার ছাড়া পেলে যে এ গড়ের কথা কাউকে পরে জানাবেন না, তা আমরা কি করে বিশ্বাস করব?"

"বিশ্বাস করবেন, আমি কথা দিচ্ছি বলে। তা ছাড়া, বিশ্বাস করা ছাড়া আপনাদের উপায় ত কিছু নেই। বিশ্বাস করলে হয়ত লাভ হতে পারে, কিন্তু আমায় অবিশ্বাস করে ধরে রাখলে আপনাদের যে সমূহ বিপদ!"

হিরোতা রাগে কি একটা বলতে গিয়ে অছথামার ইঙ্গিতে নিজেকে সামলে নিলে। অছথামা বললে—"বিশ্বাস করলেও লুয়ং প্রাবাং-এ আপনাকে ভোরের আগে পৌঁছে দেওয়া যে অসম্ভব, তা কি ভেবে দেখেছেন? ভোরের আর মাত্র ঘণ্টা আষ্টেক বাকি। এই আট ঘণ্টায় এখান থেকে আশি মাইল লুয়ং প্রাবাং কি করে যাওয়া যাবে? এখান থেকে লুয়ং প্রাবাং-এর দিকে কোনো রাস্তা যে নেই তা আপনি নিশ্চয় জানেন। রাস্তা থাকলে মোটর-লরিতে অনায়াসে অবশ্য যেতে পারতেন।"

"রাস্তা না থাকলেও এই আশি মাইল আট ঘণ্টায় অনায়াসে যাওয়া যাবে।"

"কি করে? উড়ে নাকি?"—হিরোতা আর নিজেকে সামলাতে পারলে না।

"না উড়ে নয়, ড্র্যাগনের পিঠে চড়ে।"

"ড্র্যাগনের পিঠে চড়ে!" শুধু হিরোতা আর অছথামা নয়, আমরা পর্যন্ত মামাবাবুর কথায় তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছি।

মামাবাবু আমাদের বিস্ময়টা একটু উপভোগ করেই ধীরে ধীরে বললেন—"হ্যাঁ, ড্র্যাগন সাজিয়ে যাকে দিয়ে সমস্ত উপত্যকার লোককে আপনারা আতঙ্কে দেশছাড়া করেছেন, সেই যুদ্ধের ট্যাঙ্কটি, পথঘাট না থাকলেও অনায়াসে যে-কোনো বন্ধুর মাঠের ওপর দিয়ে ঘণ্টায় বিশ মাইল যেতে পারে।"

পিঠে না হোক, ড্র্যাগনের মত করে সাজানো একটি বিশাল ট্যাঙ্কের ভেতরে বসে তারপর সত্যিই আমরা লুয়ং প্রাবাং রওনা হলাম। ক্যাটারপিলার হুইল অর্থাৎ গুটিপোকার মত ফিতে-চাকার দরুন এ ট্যাঙ্কের কাছে প্রায় কোনো স্থানই অগম্য নয়। ভোরের আগেই আশি মাইল অনায়াসে পার হয়ে মেকং নদীর ধারে লুয়ং প্রাবাং-এর এপারে আমরা পৌঁছে গেলাম। পথে ট্যাঙ্ক থেকে তরল আগুনের পিচকারী ছুঁড়ে কেমন করে ড্র্যাগনের আগ্নেয় নিঃশ্বাস তৈরী হয়, তাও আমরা দেখলাম।

লুয়ং প্রাবাং-এ একটি এরোপ্লেন যথার্থই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে এরোপ্লেনে লি-সিনকে উপস্থিত থাকতে দেখে আমি ত অবাক! তার পোড়া ঘা তখনো ভালো করে সারেনি। কিন্তু আমাদের দেখতে পাওয়ার আনন্দে তাতে তার ভ্রূক্ষেপও নেই।

মামাবাবু আমার বিস্ময় লক্ষ করে হেসে বললেন—"খুব অবাক হচ্ছিস, না? কিন্তু কলকাতা থেকে আমি সবার আগে ওকেই লুয়ং প্রাবাং উপত্যকার রহস্যের সন্ধান নিতে তার করেছিলাম। আমরা যত দিনে কলকাতা থেকে জাহাজে ব্যাঙকক পৌঁচেছি, ও তার মধ্যেই ড্র্যাগনের রহস্যের সন্ধান করে ফেলেছে। কিন্তু দুঃসাহস একটু বেশী দেখাতে গিয়ে তার আগুনের হলকায় প্রাণটা প্রায় দিতে বসেছিল! নেহাত বেয়াড়াভাবে অছথামার বাড়ীতে ওর সঙ্গে দেখা হয় বলেই কোনো পরিচয় যে আমাদের আছে, তা না জানিয়ে আমি চলে যাই। অছথামাকে তখন থেকেই আমি সন্দেহ করি। তবে লি-সিনের শুশ্রূষার অভাব যে হবে না তা জানতাম।"

এরোপ্লেনে সাইগনের পথে যেতে যেতে তারপর মামাবাবুর কাছে আগাগোড়া সব কিছুর ব্যাখ্যাই আমি শুনলাম। যাযাবর হাঁসের রহস্যটা তেমন কিছু গুরুতর না হলেও মিস্টার মরগ্যানকে অজানা আততায়ী আক্রমণ করা থেকে কেমন করে তাঁর প্রথম সন্দেহ জাগে, অছথামার কাছে ড্র্যাগনের আজগুবি গল্প শুনে কি করে এই সন্দেহ আরো সুদৃঢ় হয় যে সব ব্যাপারের পেছনে গভীর কোনো চক্রান্ত আছে, হিরোতাকে গোড়ায় বিশ্বাস করলেও বেতার-সেটটি আবিষ্কারের পর থেকেই কি করে তিনি বুঝতে পারেন যে, ওই

যন্ত্রটি তারই এবং এই যন্ত্রের দ্বারাই আমাদের ড্র্যাগন দেখিয়ে ভয় পাওয়াবার কথা সে তাদের গোপন গড়ের লোকদের জানায়, আমার কাছে সেই সময়ে ধরা পড়ে কি ভাবে ডিকসনের নামে দোষ চাপিয়ে সে সাধু সাজে এবং তারপর আমি নেহাত ড্র্যাগনের রহস্য-সন্ধানে বদ্ধপরিকর জেনে সে কি ভাবে আমায় বন্দী করবার জন্যেই আমার সঙ্গ নেয়, সব রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তুচ্ছ মনে হলেও যাযাবার হাঁসের রহস্যটা যে সমস্ত অভিযানের মূল, এ কথাও বুঝলাম। গোপন দুর্গ তৈরীর দরুন মানুষ ও মোটর-লরি প্রভৃতির আনাগোনায় হাঁসেরা এ উপত্যকা পরিত্যাগ না করলে মিস্টার মরগ্যান তাঁর শিকারের প্রবন্ধে কোনো প্রশ্ন তুলতেন না এবং লুয়ং উপত্যকা এখনো সবার অজ্ঞাতে গোপন শত্রুর চক্রান্তে সত্যিই অভিশপ্ত হয়ে থাকত।

একটি প্রশ্নই এর পর আমার করবার ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি কি আপনার প্রতিশ্রুতি সত্যিই রাখবেন? এই গোপন গড়ের কথা কাউকে জানাবেন না?"

"কথা যখন দিয়েছি, তখন আর তা খেলাপ করি কি করে?"

"বলেন কি! এতবড় একটা শয়তানী চক্রান্তের কথা জেনেও আপনি চুপ করে থাকবেন? সায়াম, ইন্ডো-চায়না এমন কি বর্মারও সর্বনাশের উদ্দেশ্যে জাপান নির্বিবাদে এই গোপন কেল্লা গড়ে তুলবে?"

"তা কেমন করে তুলবে? আমি ছাড়া আর কি বাধা দেবার লোক নেই?"

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কে আবার আছে?"

মামাবাবু হেসে বললেন—"কেন, ডিকসন? সে ত আর কাউকে কোনো কথা দেয়নি!"

"ডিকসন?"

"হ্যাঁ, ডিকসন! সে আমাদের ফরাসী সরকারের গুপ্তচর হিসেবে আমাদের আগেই এ উপত্যকার রহস্য ভেদ করেছে। হিরোতা কি ভেবে শেষ মুহূর্তে তার উপর সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে! নিরাপদে ফরাসী সীমান্তে পৌঁছবার আগে পাছে হিরোতা মাঝপথে তাকে বাধা দেয়, এই ভয়ে সে হিরোতাকে যখন তার কুঠীতে বেঁধে রেখে চলে যাবার উদ্যোগ করছে, সে সময়েই আমরা তাকে ভুল করে বন্দী করি। তারপর ধীরে ধীরে আমার সন্দেহ জাগতে থাকে। আমি তার সঙ্গে ভাব করে সমস্ত কথা জেনে নিই এবং ড্র্যাগন যেদিন দেখা দেয় সেদিনই তার সমস্ত কথা সত্য বুঝে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে গিয়ে মুক্ত করে দিই। মাথায় আঘাতের ভান আমি তখন দুটো কারণে করেছিলাম। প্রথমতঃ, ডিকসনকে যে আমিই ছেড়ে দিয়েছি, সে সন্দেহ নিবারণের জন্যে—দ্বিতীয়তঃ, হিরোতা আমায় মুমূর্ষু জেনে কি করে তাই দেখবার জন্যে। অবশ্য মঙপোর সাহায্য না পেলে এ অভিনয় আমার সফল হত না।"

"সবই বুঝলাম, কিন্তু ডিকসন কি জন্যে হিরোতার কুঠীর উঠোনে আগুন জ্বেলেছিল বলতে পারেন?"

"আমি যতদূর জানি, গোটাকতক গোপন কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলবার জন্যে—তবে ডিকসনকেই জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারিস।"

"ডিকসন! কোথায় সে?"

pathagar.net

মামাবাবু উত্তর না দিয়ে প্লেনের স্পিকিং টিউব অর্থাৎ কথা বলবার নলে এরোপ্লেন-চালককে কি যেন বললেন।

এরোপ্লেন-চালক আমাদের দিকে ফিরে হেসে তার চোখের গগ্‌লসটা একবার খুলে ফেললে।

চালক আর কেউ নয়—ডিকসন!

সাইগন থেকে জাহাজে কলকাতা ফেরার তিনদিন পরের কথা। কলকাতা এসেই একটা ক্রিকেট ম্যাচে বাইরে ক'দিন খেলতে যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে বেলা প্রায় বারোটার সময় মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এই সময়টা সাধারণত তাঁকে লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়, কারণ এইটেই তাঁর প্রাতঃকাল।

কিন্তু কোথায় মামাবাবু! লাইব্রেরী ও বাইরের ঘর খুঁজে ওপরে যাবার পথে মঙপোর সঙ্গে দেখা। এক গাদা জামা-কাপড়ের বান্ডিল নিয়ে সে নীচে নামছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"মামাবাবু কোথা রে? কি করছেন?"

"বাবু?" মঙপো অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললে—"বাবু গুম!"

হতভম্ব হয়ে বললাম—"গুম কিরে?"

মঙপো আরো জোর দিয়ে বললে—"হ্যাঁ গুম—গুম কাটা!"

"গুম কাটা!"—হঠাৎ আতঙ্কে আমার বুক কেঁপে উঠল। মঙপোর অপরূপ বাঙলায় গুম খুনই কি সে গুম কাটা বলে বোঝাতে চাচ্ছে। লুয়ং উপত্যকার শত্রু কি তা হলে এতদূর পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে! এই ভাবে কি তারা শেষ পর্যন্ত প্রতিশোধ নিলে!

সভয়ে কম্পিত পদে উপরে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় সিঁড়ির ওপর থেকেই মামাবাবুর গলা পাওয়া গেল—"মঙপো! হতভাগা! ফের তুই বাঙলা বলছিস?"

তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে উঠে গিয়ে বললাম—"ব্যাপার কি মামাবাবু? গুম কাটা শুনে আমার ত আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছল!"

মামাবাবু হেসে বললেন, "আর বলিস কেন। ব্যাটা হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরার শখ। উনি বাঙলা ইডিয়ম ব্যবহার করছিলেন—'গুম কাটা মানে হল, ঘুমিয়ে কাদা'!"

অনেকক্ষণ পরে অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু তুমি সত্যি এই বেলা দুপুর পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিলে?"

মামাবাবু অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বললেন—"আর কি করি বল!"

pathagar.net

৭

মামাবাবুর প্রতিদান

খাতাপত্র, পুরোন ডায়েরী আবার ঘাঁটতে হল।

স্মরণশক্তি আমার তেমন জোরালো কোনো দিনই নয়। স্কুলে পড়বার সময় সংস্কৃতে ধাতুরূপ শব্দরূপগুলো মুখস্থ করতে না পারার জন্যেই সব চেয়ে বিপদে পড়তাম। এখন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে স্মৃতিশক্তির উন্নতি অন্ততঃ হয়নি।

কিন্তু হঠাৎ স্মৃতিশক্তিকে উসকে দেবার জন্যে পুরোন খাতা ডায়েরীর দরকারই হল কেন?

দরকার হল 'আশ্চর্য' কাগজের সম্পাদক মশাইয়ের জন্যে।

হঠাৎ সেদিন সকালবেলায় আশ্চর্য ব্যাপার!

ভেতর থেকে শুনতে পেলাম বাইরের দরজায় কে 'গণপতিবাবু', 'গণপতিবাবু', বলে ডাকছেন।

প্রথমটা যেমন হকচকিয়ে গেছলাম তেমনি বিরক্তও হয়েছিলাম একটু। গণপতি আবার কে? না জেনেশুনে এ বাড়ীতে এসে গণপতিকে খোঁজবার মানে কি? গণপতি আমার নাম নয়, এ বাড়ীতে কস্মিনকালে কারুর নাম গণপতি ছিল না।

বেশ একটু রুক্ষ মেজাজ নিয়ে ভদ্রলোককে সেকথা বলবার জন্যে দরজা খুলতে যেতে যেতেই স্মৃতিটা হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তির বদলে একটু লজ্জাই অনুভব করলাম। তবে বিস্ময়টা সমানই রইল।

গণপতি আমার নাম নয়, তবে একসময়ে এই ছদ্মনামটা ব্যবহার করেছি। ব্যাসদেবের অনুলেখক গণেশের নামটাই এ ছদ্মনামের অনুপ্রেরণা। গণেশ ব্যাসদেবের ভাষণ লিখে গেছেন। আর আমি লিখছি মামাবাবুর কীর্তিকাহিনী। ঠিক অনুলেখক না হলেও লিপিকার হিসেবে গণেশের বদলে গণপতি নামটা নিয়েছিলাম। সেই নামেই পত্র-পত্রিকায় ও প্রকাশকের কাছে চিঠিপত্র লেখা ও পাণ্ডুলিপি পাঠানর কাজ করেছি।

কিন্তু এখন হঠাৎ সে নাম কে ধরে কে খোঁজ করতে এল? কারণই বা কি? দরজা খোলার পরই রহস্যটা পরিষ্কার হল।

এসেছেন আর কেউ নয়। 'আশ্চর্য' কাগজের সম্পাদক। কোনো প্রকাশকের কাছ থেকে গণপতি হাজরার ঠিকানা জেনে নিয়ে সরাসরি চলে এসেছেন, মামাবাবু কেন নীরব সেই খোঁজ করতে।

pathagar.net

'আশ্চর্য' কাগজের সম্পাদককে কিছুতেই দমান গেল না। ঘণ্টা দুই বসে তার সঙ্গে আলাপ করে অকাট্য যুক্তিতে মামাবাবুর কীর্তিকাহিনী প্রকাশের ব্যবস্থা করতে রাজী হতেই হল।

সেই জন্যেই খাতাপত্র পুরোন ডায়েরী ইত্যাদি ঘাঁটা।

পুরোনর বদলে নতুন কিছু লেখা যায় না এমন নয়। গণপতি হাজরার লেখাই বন্ধ হয়েছে, মামাবাবুর কীর্তিকলাপ ত ফুরিয়ে যায়নি। তবু শুরু যখন করা হল তখন আগেকার কাহিনীগুলোকে বাদ দিলে অন্যায়ই হবে।

বছর কয়েক আগেকার এমন শীতের দিনের একটি সকাল থেকেই শুরু করা যাক।

সবে তার আগের দিন সন্ধ্যায় দিল্লী থেকে ফিরছি। দিল্লীর হাড় ভাঙা শীতের পরে কলকাতার শীতে কাবু হবার কিছু নেই। কিন্তু কাবু হয়েছি কলকাতার ধোঁয়া ধুলো মেশান বিদঘুটে কুয়াশায়।

আগের রাত্রে ফিরে আর মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাই নি। পরেরদিন সকালেই বার হলাম সেই উদ্দেশ্যে।

ইচ্ছে করে একটু বেলা করেই বেরিয়েছিলাম। মামাবাবুর হালচাল ত আর জানতে বাকী নেই। এমনিতেই বেলা আটটার আগে তাঁর ঘুম ভাঙে না। আর এই শীতের দিনে লেপ কম্বল ছেড়ে কি আর উঠবেন!

ন'টার একটু আগেই অবশ্য এসেছিলাম। এখনো জেগে না থাকলে ঠেলেঠুলে বিছানা থেকে তুলব এই অভিপ্রায়ে।

. কিন্তু বাড়ীর কাছে এসে তাজ্জব হয়ে গেলাম। ভোরের গাঢ় কুয়াশা তখনো কাটেনি। একটু ফিকে হয়েছে মাত্র, সেই কুয়াশার মধ্যে মামাবাবুর বাড়ীর সামনে প্রথমেই এক পুলিশ খাড়া পাহারায় দাঁড়িয়ে।

কুয়াশায় দৃষ্টি বিভ্রম হয়েছে কি না প্রথমটা সেই সন্দেহ-ই হল।

কিন্তু দেখার ভুল নয়, সত্যিই জলজ্যান্ত পুলিশ বাড়ীর চারিধারে!

বেশ একটু হাঙ্গামা হল পরিচয় দিয়ে ভেতরে ঢুকতে। সেখানে গিয়েও দেখি, জন দুই অফিসার নীচের বাইরের ঘরে মামাবাবুর সঙ্গে আলাপ করছেন। বাড়ীর নীচে-ওপরেও পুলিশ দু'চারজনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল।

ব্যাপার কি?

পুলিশ অফিসারদের আলাপ থেকে তেমন কিছুই বোঝা গেল না। আমি ঘরে ঢোকবার পর প্রথম পরিচয়ের শেষে একজন আগের কোনো কথার খেই ধরেই নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করলেন—"তা হলে আপনি কিছুই টের পাননি-বলছেন? বলছেন, আপনার ঘরের—সমস্ত বাড়ীর কিছুই চুরি যায় নি?"

"না।"

মামাবাবুর সংক্ষিপ্ত উত্তরে ক্লান্ত অসহায় ভাবের সঙ্গে একটু বিরক্তিও যেন মেশান।

pathagar.net

দ্বিতীয় অফিসার সেটুকু বোধ হয় লক্ষ করেই বললেন—"আপনাকে একটু বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমরা দুঃখিত, কিন্তু আপনার বিপদের কথা ভেবেই এ হাঙ্গামা করতে হচ্ছে, এটুকু আশা করি বুঝেছেন। একটা মানুষ এই বন্ধ বাড়ীর ভেতর থেকে সত্যি হাওয়ায় ত আর মিলিয়ে যেতে পারে না।"

"কিন্তু তাকে ত আর খুঁজে পেলেন না"—মামাবাবুর গলায় যেন ক্লান্ত অনুযোগ।

"সেইটেই ত আশ্চর্য, আশ্চর্য কেন, প্রায় আজগুবী!"—প্রথম অফিসার বললেন।

"ব্যাপারটা কি একটু জানতে পারি?"—এবার না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না।

প্রথম পুলিশ অফিসার আমার দিকে একটু ভ্রূকুটিভরেই চাইলেন। আমার এ অনধিকার চর্চাটা পছন্দ নয়।

দ্বিতীয় অফিসার একটু উদার—তাঁর কাছে সংক্ষেপে যা জানা গেল তা সত্যিই অদ্ভুত। ভোরের কিছু আগে মামাবাবুর এক প্রতিবেশী মিঃ ভোরা তাঁর গ্যারেজ থেকে মোটর বার করতে বেরিয়ে হঠাৎ একজন লোককে ঝোলান দড়ি বেয়ে মামাবাবুর ঘরের জানলায় উঠতে দেখেন। গাঢ় কুয়াশার দরুণ প্রথমটা তাঁর নিজের চোখের দৃষ্টির ওপরই সন্দেহ হয়। কিন্তু পরে আরো একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে জানলার একটা গরাদ সরিয়ে স্পষ্ট ভেতরে ঢুকতে দেখে মিঃ ভোরা চীৎকার করে মামাবাবুকে ডাকবার চেষ্টা করেন। সে চীৎকারে তাঁর নিজের বাড়ীর ড্রাইভার, চাকর বেরিয়ে এলেও মামাবাবুর বাড়ী থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। লোকটা তখন ভেতরে ঢুকে দড়িটাও টেনে তুলে নিয়েছে। মিঃ ভোরা এবার ড্রাইভার ও চাকরকে জানলার নীচে পাহারায় রেখে অন্য দিকে মামাবাবুর বাড়ীর দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করেন। কিছুক্ষণ বাদে মামাবাবুর নতুন অনুচর রঘুবীর জেগে দরজা খোলার পরও মামাবাবুর ঘুম ভাঙাতে বেশ সময় লাগে। মামাবাবু অবশ্য অসময়ে ঘুম ভাঙার দরুণ আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রথমটা কিছু বুঝতেই পারেন না। তাঁর ঘরের মধ্যে পড়ে-থাকা দড়িটা দেখিয়ে মিঃ ভোরাকে ব্যাপারটার গুরুত্ব তাঁকে বোঝাতে হয়। তা সত্ত্বেও মামাবাবুর বিশেষ উৎসাহ না দেখে মিঃ ভোরা তখন পুলিশকে ব্যাপারটা জানান। পুলিশ এসে তন্ন তন্ন করে সমস্ত বাড়ী ঘর খোঁজ করেও কোথাও কাউকে পায়নি। যে লোকটাকে মিঃ ভোরা স্পষ্ট দড়ি বেয়ে উঠে জানলার গরাদ সরিয়ে মামাবাবুর ঘরে ঢুকতে দেখেছেন, সে লোকটা তা হলে গেল কোথায়?

মামাবাবু একটি চাকর নিয়ে একলাই এ বাড়ীতে থাকলেও বাড়ীটি নেহাত ছোট নয়। আসলে একটি মিউজিয়াম, লাইব্রেরী আর ল্যাবরেটরীর সমাবেশ। নীচের কয়েকটা ঘর শুধু বইয়ে বোঝাই। কীটপতঙ্গ আর বিরল জন্তু-জানোয়ারের মরা নমুনা দুটি ঘরে কাঁচের ঢাকনা দেওয়া নানা আকারের আলমারী বাক্সে সাজানো। দোতলায় মামাবাবুর নিজের ব্যবহার্য ঘরগুলি ছাড়া আপাতত সবই ল্যাবরেটরী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মামাবাবুর পুরোন চাকর মঙপো থাকলে ওপরের ল্যাবরেটরীর পাশের একটি ছোট ঘরে শোয়, মাসখানেক হল সে ছুটি নিয়ে গেছে বলে নতুন দারোয়ান রঘুবীর নীচের একটি ঘরে থাকে।

রঘুবীর তাঁর ডাকে দরজা খোলবার পর মিঃ ভোরা নিজে দরজা আবার বন্ধ করে মামাবাবুকে ওপরে ডাকতে পাঠিয়েছেন। বাইরের যে জানলা দিয়ে লোকটা ঢুকেছিল তার নীচেও মিঃ ভোরার চাকর ঠায় পাহারায় দাঁড়িয়ে। বাড়ী থেকে বেরুবার আর কোনো রাস্তাই নেই কোনোখানে। মামাবাবুর না হয় কুম্ভকর্ণের নিদ্রা। লোকটার ঘরে ঢোকা তিনি টেরও পাননি। কিন্তু লোকটা এই বন্ধ বাড়ীর ভেতর থেকে উধাও হয়ে গেল কি করে, এই হল সমস্যা।

অফিসার তাঁর বিবরণ শেষ করবার পর আমার মনে যে প্রশ্নটা উঠেছিল, তিনি নিজেই সেটা প্রকাশ করে তার উত্তর দিলেন। বললেন—"সমস্ত ব্যাপারটা মিঃ ভোরার দৃষ্টিভ্রম ভাবতে পারতাম, কিন্তু জানলার ভাঙা একটা গরাদে আর ঘরের মেঝের ওপরকার ফেলে যাওয়া দড়িটা ত আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"তা হলে সে এখানেই কোথাও আছে মনে করুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না।"—মামাবাবুর গলাটা খুব প্রসন্ন মনে হল না। একটু বিদ্রূপও তাতে যেন মেশান।

"আপনি বিরক্ত হয়ে বিদ্রূপ করছেন বুঝতে পারছি।"—প্রথম অফিসার একটু হেসে বললেন— "কিন্তু এ ব্যাপারে অদৃশ্য মানুষের মত আজগুবী ব্যাখ্যা ত সত্যি মেনে নিতে পারি না।"

দ্বিতীয় অফিসার হঠাৎ উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, আপনার বাড়ীতে লুকোন কোনো চোরা দরজা বা কুঠুরী গোছের কিছু নেই ত?"

"না, মশাই।"—এবার মামাবাবুই হেসে উঠলেন—"আমি রোমাঞ্চ কাহিনীর গোয়েন্দা কি পাপিষ্ঠ নই যে, বাড়ীতে ওই সব প্যাঁচ রাখব। আমার বাড়ীতে যা আছে চোখেই দেখা যায়। দেখলেনও ত সব।"

"দেখুন!"—প্রথম অফিসারের গলায় এবার একটু আহত অভিমানের সুরই শোনা গেল—"আমরা যেন আপনাকে সাহায্য করতে এসে অপরাধ করেছি মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার মত লোকের বাড়ীতে সন্দেহজনক কিছু ঘটলে আর মিঃ ভোরার মত সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে তার খবর পেলে কর্তব্য হিসেবে আমাদের যা করবার করতে আসতেই হয়। আমাদের সাধারণভাবে যা করবার করেছি। মিঃ সেন ফিঙ্গার প্রিন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আঙুল-টাঙুলের ছাপ কিছু পান কি না দেখতে এসেছিলেন। চোর বা খুনে যেই এ বাড়ীতে ঢুকে থাকুক, লোকটা অত্যন্ত হুঁশিয়ার। ঢোকবার পর গরাদ জানলা সমস্ত এমনভাবে মুছে দিয়েছে যে, চাকর-বাকরের হাতের ছাপ পর্যন্ত কোথাও মিঃ সেন পাননি, সারা বাড়ীতে ওই দড়িগাছাটা আর ভাঙা গরাদ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাইনি আমিও। তবু রহস্যটা অলৌকিক কিছু বলে ছেড়ে দিতে পারছি না। আপনাকে সেই আগেকার প্রশ্নটা আবার তাই করছি। আপনি সব দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে এখনো বলছেন যে, কিছুই আপনার বাড়ীর কোথাও থেকে চুরি যায়নি? সব যেমন ছিল ঠিক আছে?"

"নিশ্চিত হয়ে চুরি যায়নি এই কথাই বলছি।"—মামাবাবু রীতিমত গম্ভীর মুখে বললেন—"কিন্তু সব যেমন ছিল ঠিক আছে তা ত বলিনি!"

pathagar.net

"তার মানে?"—অফিসার দুজনের চোখই কপালে উঠল।

"এ আবার কি হেঁয়ালি?"—আমিও জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম।

"হেঁয়ালি কিছু নয়,"—মামাবাবু আগের মতই গম্ভীরভাবে বললেন,—"চুরি যাবার বদলে বাড়ীতে বাড়তি কোনো জিনিষ যদি এসে যায়, তা হলে সব ঠিক আছে ত আর বলা যায় না।"

"চুরি যাবার বদলে বাড়ীতে বাড়তি জিনিষ এসেছে!"—অফিসার দুজনেই বেশ হতভম্ব ও সেই সঙ্গে একটু বিরক্ত—"কই, এ কথা ত আগে বলেন নি!"

"আপনারা ত জিজ্ঞাসা করেন নি।"—মামাবাবু সরলভাবে জবাব দিলেন—"আপনারা চুরির কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"

মামাবাবুর সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তর্কে যাওয়া নিষ্ফল বুঝে অফিসার মিঃ সেন একটু অধৈর্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাড়তি জিনিষটা কি?"

"একটা ছোট পিপে বলতে পারেন। আমার পোকামাকড় প্রভৃতির নমুনা যে ঘরে থাকে সেই ঘরেই সেটা এখন আছে, আগে ছিল না।"

"আশ্চর্য ত! কিসের পিপে তা হলে দেখতে হয়।"—মিঃ সেন উঠে দাঁড়িয়ে অন্য অফিসারকেও ডাকলেন—"আসুন মিঃ ধর।"

"কিসের পিপে জানবার জন্য উঠে গিয়ে দেখতে হবে না।"—মামাবাবু মিঃ সেনকে থামালেন—"ও পিপের মধ্যে কি আছে আমি বলতে পারি।"

"আপনি বলতে পারেন?"—প্রথম অফিসার মিঃ ধর অবাক হয়ে মামাবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন করে?"

"অনুমানে!"—মামাবাবু এবার একটু হাসলেন—"আর আমার অনুমান নির্ভুল বলেই ধরে নিতে পারেন।"

অফিসার দুজনের মুখেই একটু বিরক্তির ভ্রূকুটি যেন ফুটে উঠল। মিঃ সেন জিজ্ঞাসা করলেন— "আপনার অনুমানটা তা হলে শুনি, কি আছে ও পিপেয়?"

"এপিল্যাক্না বোরিয়ালিস।"

"কি—?"

অফিসার দুজনের সঙ্গে আমিও একরকম হতভম্ব।

মিঃ সেনই প্রথম বেশ অবসন্ন সুরে বললেন—"এ সময়ে আপনার রসিকতাটা ঠিক তারিফ করতে পারছি না।"

"রসিকতা আমি করছি না!"—মামাবাবুর গলা এবার বেশ গম্ভীর—"ও পিপের মধ্যে এপিল্যাক্না বোরিয়ালিস আছে নিশ্চয়। আর একটা-আধটা নয়, প্রায় এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার বলে মনে করি।"

একটু চুপ করে থেকে বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে মিঃ ধর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন— "এপিল্যাক্না বোরিয়ালিস মানে একরকম পোকা?"

pathagar.net

"হ্যাঁ, কক্‌সিনেল্লিডি বংশের পোকা। বৈজ্ঞানিক নামটা দাঁত ভাঙা হলেও একটা সোজা নাম আছে। ইংরেজীতে বলে লেডীবার্ড। আমাদের দেশে বিদঘুটে বদগন্ধ পোকা বলেই আমরা জানি।"

"কিন্তু ওই পোকা ভরা পিপে আপনার বাড়ীতে রেখে যাওয়ার মানে কি?"—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ সেন।—"শেষ রাত্রে দোতলার জানলা ভেঙে চোর ঢোকার সঙ্গেই বা এর সম্পর্ক কি?"

মামাবাবু একটু যেন দুঃখের সঙ্গেই বললেন—"এসব প্রশ্নের জবাব আপনাদেরই খুঁজে বার করা উচিত নয় কি?"

"হ্যাঁ, তাই করব।"—মিঃ ধর একটু রাগের স্বরেই বললেন—"আপনার একটু অসুবিধে করার জন্য মাফ চাইছি, এ বাড়ীর ভেতর এখনো কাউকে পাওয়া যায়নি। ভেতরের অনুসন্ধান এখন বন্ধ থাকলেও বাইরে পুলিশ পাহারা তাই থাকবে। আর আপনাকে ও মিঃ ভোরাকে হয়ত একবার কষ্ট করে লাল বাজারে যেতে হতে পারে। আপনার চাকরকে এখন একটু নিয়ে যেতে পারি?"

"দরকার বোধ করলে নিশ্চই নিয়ে যাবেন।"—মামাবাবু একটু যেন অনিচ্ছার সঙ্গে সম্মতি দিলেন—"কিন্তু ও ত সারারাত বাড়ীর ভেতরেই ছিল, ভেতর থেকে বাড়ীর দরজা বন্ধ ছিল, তারও ত প্রমাণ আপনারা পেয়েছেন।"

"তা পেয়েছি, তবু দু'চারটে প্রশ্ন করে ওর জবানবন্দীটা নিতে চাই। এ চাকর ত আপনার বিশ্বাসী পুরোন লোক?"—জিজ্ঞেস করলেন মিঃ ধর।

"অবিশ্বাসের কোনো কারণ ত এখনো পাইনি।"—মামাবাবু জানালেন—"তবে পুরোন লোক নয়, আমার আগেকার চাকর ছুটি নিয়ে চলে যাওয়ায় একমাস হল কাজ করছে।"—মিঃ ধর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন—"একমাসে একটা লোককে কি চেনা যায়?"

"একমাসে যেমন যায় না তেমনি কখনো কখনো সারাজীবনেও নয়।"—মামাবাবু হেসে বললেন —"তবে একমাসের মধ্যে সন্দেহ করবার মত কিছু পাইনি সেই কথাই জানাচ্ছি। তা ছাড়া আজকের যে ব্যাপার নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাচ্ছেন তার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক আছে ভাবতে আজগুবী বলে মনে হয়। প্রথমতঃ, ওই দু'মণি বপু নিয়ে রঘুবীরের দড়ি বেয়ে দোতলার জানলায় ওঠাই অসম্ভব, দ্বিতীয়তঃ, আমার ঘরে একটা অদ্ভুত পোকা ভরা পিপে এনে রাখবার মত মানুষ ওকে মনে হয় কি?"

"হুঁ।"—বলে গম্ভীরভাবে খানিক চুপ করে থেকে মিঃ ধর তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে নমস্কার করে বেশ যেন একটু অপ্রসন্ন মেজাজেই চলে গেলেন।

"এ সব কি ব্যাপার মামাবাবু?"—অফিসাররা চলে যাবার পর ভর্ৎসনার সুরে এবার বললাম— "দু'মাস মাত্র বাইরে গেছি, এর মধ্যে এ সব কি বিদঘুটে কাণ্ড বাধিয়ে বসেছ? মণ্ডপো বাড়ীতে থাকলেও এ সব কাণ্ড বোধহয় হতে পারত না। সে ছুটি নিয়ে গেছে শুনেই

pathagar.net

ত অবাক লাগছে। এতকাল তোমার কাছে আছে। মণ্ডপোকে ত একদিনের জন্যেও ছুটি নিতে দেখিনি!"

"কখনো যা হয়নি তা আর হবে না এমন কোনো কথা আছে কি?"—মামাবাবু হাসলেন—"আমার দোতলার ঘরের জানলা বেয়ে কাউকে কোনো দিন ঢুকতে কেউ এর আগে দেখেছ কি? না, আমার ঘরে আচমকা অদ্ভুত পোকার পিপে পাওয়া গেছে?"

"সত্যি সমস্ত ব্যাপারটা ত আজগুবী বলে মনে হয়। দড়ি বেয়ে জানলা দিয়ে একটা লোক ঢুকল অথচ বাড়ী থেকে বেরুল না। কোথা থেকে একটা অদ্ভুত পোকার পিপে তোমার ঘরে রাখা। এ সব রহস্যের কোনো মানে থাকতে পারে তাই ত ভাবতে পারছি না।"

"রহস্য যত গভীরই হোক, একটা মানে নিশ্চয়ই আছে।"—মামাবাবু যেন দার্শনিক মন্তব্য করলেন।

"মানে কিছু খুঁজে পেয়েছ?"—সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম।

"মানেটা যথাসময়ে আপনা থেকে প্রকাশ পাবে। সেই অপেক্ষাতেই আছি। আসুন, আসুন, মিঃ ভোরা।"

মামাবাবুর অসংলগ্ন কথাগুলোতে প্রথম একটু হতভম্ব হলেও পেছনে চেয়ে মামাবাবুর হঠাৎ অভ্যর্থিত মানুষটিকে দেখতে পেলাম।

মাঝবয়সী বেশ লম্বা-চওড়া এক ভদ্রলোক, পরনে দামী সাহেবী স্যুট। মাথায় শুধু দেশী গোল টুপি। চেহারায় পোশাকে সমৃদ্ধির স্পষ্ট ছাপ।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে এগিয়ে এসে তিনি বললেন—"বিশেষ জরুরী কাজে সেই সময়টাতেই বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। চেষ্টা করেও তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলাম না। পুলিশ কিছু হদিস পেয়েছে কি?"

"পেয়ে থাকলেও আমায় অন্ততঃ জানায়নি।"—মামাবাবু একটু হেসে বললেন—"শুধু আমার চাকরটিকে থানায় নিয়ে গিয়ে আমায় অসহায় করে গেছে। আপনাকে এক কাপ কফিও খাওয়াতে পারব না।"

"না, না, কফির আমার দরকার নেই।"—মিঃ ভোরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—"কিন্তু আপনার চাকর মানে রঘুবীরকে থানায় নিয়ে যাওয়ার মানে? সে ত নেহাত ভালো মানুষ ও নিরীহ! বন্ধ করে বাড়ীর ভেতরেই সে ছিল তারও প্রমাণ আছে।"

"কিন্তু সে প্রমাণেও ত ফাঁকি থাকতে পারে।"—মিঃ ভোরার সঙ্গে পরিচিত না হলেও অনাহুতভাবেই না বলে পারলাম না।

"কি ফাঁকি?"—মিঃ ভোরা একটু ভ্রূকুটিভরে আমার দিকে চাইলেন।

"দোতলার জানালা দিয়ে যে ঢুকেছিল তাকে রঘুবীরই নীচের দরজা খুলে প্রথমে বার করে দিয়ে তারপর দরজা বন্ধ করে রেখেছে এ রকম হওয়া ত সম্ভব।"—আমার সংশয়টা খুলে বললাম।

pathagar.net

"না, তা সম্ভব নয়।"—মামাবাবু আমার কথাটা তাচ্ছিল্যভরেই উড়িয়ে দিয়ে বললেন—"প্রথমতঃ, কোনো লোক যদি সত্যি ঢুকে থাকে তা হলে পেছনের জানলা দিয়ে তাকে ঢুকতে দেখে মিঃ ভোরার সামনের দরজায় আসতে যেটুকু সময় লেগেছে তার মধ্যে ওপর থেকে গরাদেতে বাঁধা দড়ি খুলে তুলে রেখে নীচে নেমে এসে বেরিয়ে যাওয়া কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, রঘুবীরকে ওরকম অবিশ্বাস করাই যায় না। রঘুবীর মিঃ ভোরার বহুদিনের বিশ্বাসী চাকর। মঙপো ছুটিতে চলে যাওয়ায় মিঃ ভোরাই রঘুবীরকে আমায় দিয়েছে।"

মিঃ ভোরা একটু কুণ্ঠিতভাবে বললেন—"দেখুন, মানুষ সম্বন্ধে কিছুই অবশ্য বলা যায় না। কিন্তু আমার কাছে বহুদিনের বিশ্বাস রেখে কাজ করেছে বলেই রঘুবীরকে নিশ্চিন্ত মনে আপনাকে দিয়েছিলাম, আমার বাগানে প্রায় দশ বছর ধরে ও দারওয়ানী করছে।"

"হ্যাঁ, বাগান বলতে মনে পড়ল মিঃ ভোরা।"—মামাবাবু যেন ইচ্ছা করেই আমার বেয়াদবীটা ভোলাবার জন্যে অন্য কথা তুললেন—"আমার বন্ধু চালিহার কাল আবার একটা চিঠি পেয়েছি, এখন ত সে তার সমস্ত বাগান বিক্রী করতেই চায়, আপনি যে দাম দিতে চেয়েছিলেন তাইতেই রাজী।"

"কিন্তু আমি যে আর রাজী হতে পারছি না,"—মিঃ ভোরা মুখখানা কেমন করুণ করে বললেন—"বছর বছর ওখানকার বাগানের কি হাল হচ্ছে দেখছেন ত! ফল ধরছেই না, ধরলেও শুকিয়ে যাচ্ছে। এখানে ঘরের পয়সা বার করে নতুন বাগান কেনা মানে ভস্মে ঘি ঢালা নয় কি?"

"ওসব বাগানের দাম আরো তাহলে পড়ে যাবে মনে করেন?"—মামাবাবু চিন্তিতভাবে মিঃ ভোরার দিকে তাকালেন—"কিন্তু বাগানগুলো বাঁচাবার জন্যে আপনি ত অনেক কিছু করছেন শুনছি। বিদেশ থেকে ওষুধপত্র, আরো কত কি আমদানীও করেছেন।"

"তা করেছি, কিন্তু ফল ত কিছু পাচ্ছি না।"—মিঃ ভোরা বিষণ্ণমুখে বললেন—"আপনার বন্ধু মিঃ চালিহাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। আমি যা যা আনিয়েছি তা ত তাঁকেও ব্যবহার করতে দিয়েছি।"

"হ্যাঁ, তা দিয়েছি বটে, চালিহা সেজন্যে কৃতজ্ঞতাই জানিয়েছে।"

মামাবাবু আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এ বাড়ীর দুর্ভেদ্য রহস্যের প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে কোথাকার কোন বাগানের লাভ-লোকসানের জোলো আলোচনায় তখন আমার মেজাজ বিগড়ে গেছে। বিরক্ত হয়ে বাধা দিয়ে বললাম—"তোমাদের বাগানের আলোচনাই তা হলে চলুক, আমি উঠছি।"

"আহা উঠবে কেন এর মধ্যেই?"—মামাবাবু বেশ লজ্জিত হয়ে পড়লেন—"বাগানের আলোচনা আর করব না, তবে কিসের বাগান জানলে অতটা ব্যাজার বোধ হয় হতিস না। এ সব কমলালেবুর বাগান, বুঝেছিস, আসামের সেরা কমলা।"

আমার মুখের ভাবটা লক্ষ করে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে মামাবাবু আবার বললেন—"তা সে কমলা বাগানের কথাও এখন থাক, নিজের চোখেই যখন দু'দিন বাদে দেখতে যাচ্ছিস তখন মুখের আলোচনার দরকারটা কি?"

pathagar.net

বিরক্তি থেকে একেবারে বিমূঢ়তায় পৌঁছে অবাক হয়ে মামাবাবুর দিকে তাকালাম। মিঃ ভোরার অবস্থাও আমারই মত।

তিনিই প্রথম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কি সত্যিই কমলা বাগান দেখতে আসাম যাচ্ছেন নাকি?"

"হ্যাঁ,"—মামাবাবু নেহাত যেন নিরুপায় হয়ে বললেন—"বাগান যখন বিক্রীই হবে না, তখন বন্ধুকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যেও যাওয়া দরকার।"

একটু থেমে ভুলে যাওয়া কর্তব্যটা এতক্ষণ স্মরণ করে মামাবাবু আমায় দেখিয়ে আবার বললেন—"আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ভুলে গেছি, মিঃ ভোরা, এটি আমার ভাগনে, গণপতি হাজরা এই ছদ্মনামেই পরিচিত। ওকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।"

কথা বলব কি, আমার গলায় তখন আব আওয়াজ নেই।

দু'দিন নয়, মামাবাবু নানা অজানা ধান্দায় লালাবাজার থেকে কাস্টমস অফিস পর্যন্ত ঘোরাঘুরির পর, প্রায় দিন সাতেক বাদে সত্যিই ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস করপোরেশনের প্লেনে দমদম থেকে গৌহাটি আর সেখান থেকে সারাদিন মোটর হাঁকিয়ে মামাবাবুর বন্ধু মিঃ চালিহার বিশাল কমলালেবুর বাগানের অফিস-বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

সারাদিনের ধকলের পর যে একটু বিশ্রাম করব তারও সুবিধা হল না। চালিহার কাছে তাঁর প্রতিবেশী মিঃ ভোরাও নিজের বাগানে দু'দিন আগে এসেছেন শুনে মামাবাবুর প্রীতি একেবারে উথলে উঠল। তখুনি মিঃ.ভোরার সঙ্গে দেখা করতে না গেলেই নয়!

নিরুপায় হয়ে মিঃ চালিহার একটি জীপে মামাবাবুর সঙ্গী হতে হল। প্রায় মাইল দশেক পাহাড়ী জীপ চালিয়ে মিঃ ভোরার বাগানে যখন পৌঁছালাম তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

মিঃ ভোরার কাঁটাতার ঘেরা বাগানের গেট বন্ধ।

বিরক্তিটা অনেকক্ষণ ধরেই মনে মনে জমা হচ্ছিল। এবার সেটা আর প্রকাশ না করে পারলাম না, বললাম—"এই পাহাড় জঙ্গলের দেশে এটা কি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে আসার সময়? গেট ত বন্ধ দেখছ—মিঃ ভোরার এখন বোধ হয় অর্ধেক রাত। চল, ফিরে চল।"

মামাবাবু কিন্তু নির্বিকার। জীপের হেডলাইটটা সামনে জ্বেলে রেখে তারস্বরে ইলেকট্রিক হর্ন বাজিয়েই চললেন।

উপায় থাকলে জীপ থেকে রাগের চোটে নেমেই যেতাম। তার বদলে জোর করে ইলেকট্রিক হর্ন থেকে মামাবাবুর হাতটা সরাতে যাচ্ছি। এমন সময় গেটের ওপর থেকে কে যেন বিকট ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করলে—"কে আপনারা? কি চান?"

প্রথমটা চমকে উঠলেও তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝলাম। গেটের ঠিক মাথাতেই একটা লাউডস্পীকারের চোঙা লাগানো। আগে সেটা চোখে পড়েনি। আওয়াজটা তার ভেতর দিয়ে আসছে।

মামাবাবু চীৎকার করে এবার নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন, মিঃ ভোরার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

pathagar.net

খানিকক্ষণ তারপর কোনো সাড়াশব্দ কোথাও না পেয়ে মনে হল মামাবাবুর বাড়াবাড়ির উচিত শিক্ষাই বুঝি হবে। কিন্তু তার পরেই গেটটা আপনা থেকে খুলতে শুরু করল। বোঝা গেল সেটা ইলেকট্রিক তারের সাহায্যে খোলা-বন্ধ হয়। লাউডস্পীকারের চোঙা থেকে একবার শোনা গেল—"গাড়ী নিয়ে ভেতরে আসুন।"

যান্ত্রিক অভ্যর্থনাটা একটু কড়া গোছের হলেও মিঃ ভোরার নিজের অভ্যর্থনাটা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। তাঁর চমৎকার বাংলো বাড়ীর সুসজ্জিত বসবার ঘরে আমাদের সাদরে বসিয়ে তিনি আনন্দে গদগদ হয়ে বললেন—"সত্যিই আপনারা আসবেন আমি ভাবতে পারিনি। এত রাত্রে গেটে হর্নের আওয়াজ পেয়ে আমি প্রথমটা একটু ভড়কে গেছলাম। এত রাত্রে এ অঞ্চলে—"

"হ্যাঁ, আমাদের আসাটা একটু অসময়ে হয়ে গেছে।"—মামাবাবু লজ্জিত ভাবে স্বীকার করলেন— "কিন্তু আপনার জন্যে যে উপহারটা এনেছি সেটা দেবার আগ্রহে সকাল পর্যন্ত আর সবুর করতে পারলাম না।"

"আমার জন্যে উপহার এনেছেন!"—মিঃ ভোরার মুখে আনন্দের চেয়ে বিস্ময় বেশী—"কি উপহার?"

"সেটা খানিক বাদে জানতে পাবেন।" মামাবাবু হাসিমুখে বললেন—"এখন সেটা জীপে রেখে এসেছি।"

মামাবাবুর কথা শুনে আমিও অবশ্য কম বিস্মিত হইনি। জীপে একটি কার্ডবোর্ডের বড় বাক্স মামাবাবু সঙ্গে এনেছেন অবশ্য দেখেছি। এ বাগানের গেট দিয়ে ঢোকবার সময় বাক্সটার ভেতর হাত দিয়ে কি যেন করলেন মনে পড়ছে। প্লেনে আসবার সময়ও বাক্সটি তাঁর কাছেই ছিল। সেটা যে মিঃ ভোরাকে উপহার দেবার জন্যে আনা তা অবশ্য ভাবতে পারিনি। কি সেটা হতে পারে তাও বুঝতে পারলাম না।

আমার চেয়ে মিঃ ভোরার কৌতূহল অরো বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি বেশ একটু অধীর হয়ে বললেন—"উপহার এনে আবার জীপে রেখে এলেন কেন?"

"উপহার দেবার আগে একটু ভনিতা করবার জন্যে, সেই সঙ্গে একটা প্রস্তাব করবার জন্যেও।"—মামাবাবু মধুরভাবে হেসে বললেন—"শুনুন, মিঃ ভোরা, আপনাদের এ অঞ্চলে কমলা বাগানে দুর্দশার কথা শোনার পর থেকেই এ বিষয় নিয়ে আমি ভাবছি। ভেবে ভেবে আর পড়াশুনা করে এ দুর্দশা ঘোচানর একটা উপায় আমি বার করে ফেলেছি।"

"বলেন কি?"—মিঃ ভোরার গলার স্বরে সামান্য একটু যেন বিদ্রূপের আভাস পেলাম, তার জন্যে তাঁকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। এমন বেয়াড়া সময়ে উপহার দেবার নামে এই ভনিতা আমারও তখন খুব ভালো লাগছে না।

মামাবাবুর কিন্তু কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের উৎসাহেই বলে চললেন—"হ্যাঁ, মিঃ ভোরা। আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে আজ পৃথিবীর নানা অঞ্চলে যে কমলালেবুর এত আদর

pathagar.net

তার আদি জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ বলেই বৈজ্ঞানিকেরা সন্ধান করে জেনেছেন। যেখান থেকে এ ফল সমস্ত দুনিয়া পেয়েছে সেই ভারতবর্ষেই কমলার চাষ নষ্ট হয়ে যাবে এর চেয়ে লজ্জার কিছু নেই। কমলা গাছের নানারকম শত্রু আছে। এ অঞ্চলে যে শত্রুতে সমস্ত বাগান ছারখার করছে তা প্রধানত হল অ্যাফিড জাতীয় পোকা। পোকা মারার রাসায়নিক ওষুধ দিয়ে তাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু সে সব ব্যবহারে মানুষেরও কিছু আনুষঙ্গিক কুফলের ভয় আছে। ইউরোপ আমেরিকাতে পর্যন্ত কীটপতঙ্গ- নাশক রাসায়নিক ওষুধের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন তাই শুরু হয়ে গেছে। রাসায়নিক ওষুধের চেয়ে অ্যাফিড নির্মূল করবার অনেক সহজ নিরাপদ উপায় কিন্তু আছে। সেই উপায়ের কথাই আপনাকে প্রথম বলব।"

মিঃ ভোরা একটু যে হাই তুললেন তা আমার দৃষ্টি না এড়ালেও মামাবাবুর নজর পড়ল না। তিনি সোৎসাহে বলে চললেন—"সে উপায়কে এক হিসেবে ষাঁড়ের শত্রু বাঘ দিয়ে খাওয়ানো বলা যায়। পোকাদের coleoptera বিভাগের coccinellidae বংশের একটি জাতের পোকা আছে, ইংরেজীতে যার বাহারের নাম লেডীবার্ড। এই লেডীবার্ড পোকা অ্যাফিড জাতীয় পোকার যম। এই লেডীবার্ডেরও অবশ্য প্রায় তিন হাজার শাখা আছে। ফলের বাগানের শত্রু পোকা ধ্বংসের জন্য এই লেডীবার্ড ব্যবহার করে নানা দেশে, বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়াতে, আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে। লেডীবার্ড এখন তাই কোটি কোটি বিক্রী হয়। শীতকালে এ পোকা জড়ভরত হয়ে ঘুমোয়। সে সময়ে এদের সংগ্রহ করে তারপর পিপেয় ভরে খরিদ্দারদের কাছে পাঠান হয়। একটা এক গ্যালন পিপেতে প্রায় এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পোকা ধরে। একজন বিদেশী ব্যবসাদারের কথা জানি যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় চারশ কোটি লেডীবার্ড বিক্রী করেছেন। এই লেডীবার্ডই আপনাদের কমলা বাগানের মুস্কিল আসান। ইনসেক্‌টিসাইড রাসায়নিক ওষুধের বদলে এই লেডীবার্ড কিনে আপনাদের বাগানে ছাড়ুন।"

মিঃ ভোরা এবার স্পষ্টই হাই তুলে বেশ একটু কৌতুকের স্বরে বললেন—"আপনার মুস্কিল আসানের দাওয়াইয়ের জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু দাওয়াইটার কি আপনিই প্রথম সন্ধান পেয়েছেন মনে করেন? তাহলে বলি শুনুন, আজ দু'বছর ধরে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এমন কি আমেরিকা থেকে এই লেডীবার্ডই লক্ষ লক্ষ আমদানী করেছি।"

"তাই নাকি?"—মামাবাবুকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত মনে হল—"আমি মার কাছে মাসীর গল্প করতে এসেছিলাম—ছিঃ ছিঃ আমার উপহার ফালতু হয়ে গেল দেখছি।"

"আপনি কি আমার জন্যে লেডীবার্ডই এনেছিলেন নাকি?"—মিঃ ভোরা এবার হেসে উঠলেন—"তা এনেছেন যখন দিয়ে যান। অধিকন্তু ন দোষায়।"

"হ্যাঁ, এনেছি যখন দিয়ে যেতেই হবে।"—মামাবাবু একটু যেন করুণ সুরে বললেন—"কিন্তু তার আগে যে প্রস্তাবের কথা বলেছিলাম সেটা সেরে নিই।"

"প্রস্তাব আবার কি?"—মিঃ ভোরার মুখে বিদ্রূপ মেশান কৌতুক।

"আপনি আমার বন্ধু চালিহার বাগান আর কিনতে চান না ত?"

মামাবাবু যেন কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

"না, সে কথা ত আগেই বলেছি।"—মিঃ ভোরার গলায় একটু অধৈর্য প্রকাশ পেল—"জলের দরেও বাগান কেনা এখন লোকসান।"

"হুঁ,"—মামাবাবু আবার যেন দ্বিধাভরে বললেন—"তাই আমি চালিহার হয়ে আপনার বাগানটাই কিনতে এসেছি।"

"আমার বাগান! আমার বাগান কিনতে চায় চালিহা!"—মিঃ ভোরার মুখটা কয়েক মুহূর্তের জন্য হিংস্র হয়ে উঠে আবার বিদ্রূপের হাসিতে বাঁকা হয়ে উঠল—"আমার বাগান আমি বিক্রী করব কেন?"

"করবেন, আপনার বাগানেরও জলের দর হতে পারে বলে!"—মামাবাবুর গলা হঠাৎ গম্ভীর।

"মাফ করবেন,"—মিঃ ভোরা তীক্ষ্ণস্বরে বললেন—"রাত অনেক হয়েছে, আপনার প্রলাপ শোনবার আমার সময় নেই।"

"সময় যদি না থাকে তাহলে আমি নাচার,"—মামাবাবু যেন লজ্জিত হয়ে বললেন—"চলুন, আমার উপহারটা তা হলে নেবেন চলুন।"

"আমাকে যেতে হবে না। আমার লোক দিয়েই আনিয়ে নিচ্ছি।"—মিঃ ভোরার গলায় এখন খুব সৌজন্য নেই।

"না, না, তা কি হয়!"—মামাবাবু যেন মিনতি করলেন—"উপহারের মর্যাদাটা অন্ততঃ রাখুন।"

"বেশ চলুন!"—মিঃ ভোরা বিরক্তিভরেই উঠলেন।

ঘর থেকে বারান্দা পেরিয়ে নিচে জীপ থেকে কার্ডবোর্ডের বাক্সটা খুলেই মামাবাবু প্রায় যেন আর্তনাদ করে উঠলেন—"এ কি ব্যাপার।"

গত কয়েক মিনিটের কথাবার্তায় মাথাটা কেমন গুলিয়েই ছিল, মামাবাবুর হঠাৎ এ আর্তনাদে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

"কি হল, কি মামাবাবু?"—জিজ্ঞাসা করলাম দিশেহারা হয়ে।

"ফুটো দিয়ে সব বেরিয়ে গেছে।"—মামাবাবুর হতাশ চেহারা—"অথচ এ বাগানে ঢোকা পর্যন্ত কোথাও ফুটো ছিল না আমি জানি।"

"কি বেরিয়ে গেছে, কি!"—মিঃ ভোরা বিদ্রূপের সুরে হেসে উঠলেন—"কার্ডবোর্ডের বাক্সে ত পোকা রাখবার পিপেই দেখছি। ও থেকে লেডীবার্ডগুলোই বেরিয়ে গেছে ত?"

"হ্যাঁ।"—মামাবাবু কেমন একটু অদ্ভুতভাবে মিঃ ভোরার দিকে তাকালেন।

"তাতে আর হয়েছে কি!"—মিঃ ভোরা ব্যঙ্গ করে বললেন—"ওগুলো বেরিয়ে আমার বাগানেই ছড়িয়ে গেছে এতক্ষণে।"

"তা গেছে। তবু নিজের হাতে আপনাকে দিতে পারলাম না এই

pathagar.net

আফসোস।"—মামাবাবুকে অত্যন্ত দুঃখিত মনে হল—"ওগুলো ঠিক সাধারণ লেডীবোর্ড ত নয়। বিশেষ জাতের।"

"বিশেষ জাতের।"—মিঃ ভোরার গলায় স্বর হঠাৎ একটু তীব্র হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ,"—মামাবাবু যেন কাতরভাবে বললেন—"আমেরিকা থেকে স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে আনিয়ে আপনার প্রতিবেশী মিঃ চালিহাকে তার বাগানে ছাড়বার জন্যে যা আপনি উদারভাবে সরবরাহ করেছেন গত এক বছরে. এ সেই বিশেষ জাতের লেডীবার্ড, এপিল্যাক্না বোরিয়ালিস্!"

"আপনি!—আপনি!"—মিঃ ভোরার মুখ দিয়ে যেন ফেনা উঠছে মনে হল—"আপনি আমার বাগানে ওই পোকা ছেড়েছেন! ইচ্ছে করে পিপের গায়ে ফুটো করে এনেছেন ওই পোকা ছাড়বার জন্য!"

"আজ্ঞে, উপকারের প্রতিদান ত দিতে হয়!"—মামাবাবু বিনয়ের অবতার—"আমার বন্ধু চালিহার জন্য আপনি যা করেছেন তার একটু শোধ না দিলে চলে? এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আন্দাজ ওই পোকা আপনার বাগানে এতক্ষণ ছড়িয়ে পড়েছে। লক্ষ থেকে কোটি হতে ওদের কত আর দেরী হবে? তারপর আপনার এ বাগান জলের দরে নামতে বা কতক্ষণ? লেডীবার্ডের মধ্যে ওই বিশেষ জাতের পোকাই উপকারের বদলে চরম সর্বনাশ করে। ক্যালিফোর্নিয়ার বড় বড় বাগান এক সময়ে ওই পোকার উৎপাতে ছরখার হয়ে গেছল। কিন্তু আপনাকে এ সব বলে আবার মার কাছে মাসীর গল্প করছি। আপনি সব জেনেশুনেই আশপাশের সমস্ত বাগানের দর নামিয়ে সস্তায় কিনে নেবার ফন্দিতেই ত সাহায্যের ছলে ওই পোকা অন্যদের এতদিন বিলিয়েছেন?"

মিঃ ভোরার তখন প্রায় পা খিঁচে ফিট হবার অবস্থা। হিংস্র চীৎকার করে বললেন—"আপনাকে আমি গুলি করব। আমার ও গেট যে বিদ্যুতের সাহায্য ছাড়া খোলে না, বন্ধ হয় না, তা দেখেছেন। বেরুবার উপায় আপনার নেই। আমার বাগানে চুরি করে ঢুকেছেন বলে আমি আপনাকে গুলি করে মারব।"

"না, না, ওসব হাঙ্গামায় যাবেন না।"—মামাবাবুর গলা স্নিগ্ধ, শান্ত—"আহাম্মকের মত নেহাত অসহায়ভাবে কি আপনার বাগানে ঢুকেছি মনে করেন? লালবাজার মারফত আসাম পুলিশকে সব জানিয়ে তবে এখানে ঢুকেছি। গেটের বাইরে চেয়ে দেখুন, পুলিশ হেডলাইট জ্বেলে তা হলে দেখতে পাবেন! আচ্ছা, নমস্কার। সুবোধ ছেলের মত গেটটা খোলার ব্যবস্থা করুন গিয়ে।"

মামাবাবুর সঙ্গে জীপে চালিহার বাগানে ফিরতে ফিরতে হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"আর সবই ত বুঝলাম। কিন্তু ওই এপিল্যাক্না বোরিয়ালিস্ পোকার পিপে তোমার নীচের ঘরে কোথা থেকে এল? আনলেই বা কে?"

"এল আর কোথা থেকে?"—মামাবাবু হাসলেন—"ওই মিঃ ভোরার বাড়ীরই গোপন গোডাউন থেকে।"

pathagar.net

"তার মানে তোমার জানলার দড়ি বেয়ে যে উঠেছিল সে-ই ওই পিপেটা চুরি করেছিল। কিন্তু সে কে? সে বন্ধ বাড়ী থেকে উধাও হলই বা কেমন করে?"

"শক্ত মানের বদলে সোজা মানেটা খুঁজলেই বুঝবি।"

"যেমন?"—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"যেমন সে লোকটা বাইরের কেউ নয়, বাড়ীরই লোক। তাই উধাও সে হয় নি, বাড়ীতেই ছিল।"

"তার মানে?"—সবিস্ময়ে বলে উঠলাম—"তার মানে রঘুবীর যখন হতে পারে না, তখন তুমিই পিপেটা চুরি করে জানলা দিয়ে ঢুকেছিলে! দরজা দিয়ে ঢুকলে কি হত?"

"ঢুকলে রঘুবীর জানতে পারত। সে ভোরার চর। আমি চালিহার বাগানের ব্যাপারে মনোযোগ দিয়েছি জেনে ভোরা আমার ওপর পাহারা রাখতে চেয়েছিল। আমি ইচ্ছে করেই তাই মঙপোকে বুঝিয়ে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে দিয়ে ভোরার দেওয়া লোক নিয়েছিলাম তার বিশ্বাস জাগাবার জন্য।"

এর পর আমার পক্ষে নির্বাক হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি?

pathagar.net

আবার সেই মেয়েটি

আবার সেই মেয়েটিকে দেখলাম।

রাত তখন ঠিক বারোটাই হবে।

ওপরের ডেকে এতক্ষণ রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে ভারত সমুদ্রের নৈশ শোভা দেখছিলেন।

মিড্‌ল ওয়াচ অর্থাৎ জাহাজের মালের পাহারা শুরু হয় ঠিক রাত বারোটায়।

মিড্‌ল ওয়াচের ঘণ্টা তখনো বাজেনি। তবু বারোটা বাজতে বড় জোর আর যে মিনিটখানেক আছে সেকেন্ড মেট অগডেনকে ডেকের ওপর আসতে দেখেই নির্ভুলভাবে তা বুঝতে পেরেছি।

সেকেন্ড মেট হিসেবে অগডেনের ওপরই মিড্‌ল ওয়াচের ভার। লোকটি মানুষ নয়, যেন যন্ত্র! ঘড়ির কাঁটার মত তার সবকিছু নড়াচড়া। শুধু নড়াচড়াই ঘড়ির কাঁটার মত নয়, জাহাজের নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারে তিনি একে বারে জীবন্ত বিশ্বকোষ অথবা গণিতশাস্ত্র বললেই হয়। সমুদ্র যখন ঘন কুয়াশায় ঢাকা, আকাশে একটি তারাও দেখা যায় না, তখন তিনি জাহাজের গতি অবস্থান ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউড ধরে একেবারে নির্ভুল বলে দিতে পারেন। ভারতের সমুদ্রে জাহাজে ভাসতে ভাসতেই সুদূর চীনের সাংহাইতে কখন চাঁদ উঠছে আর উত্তর মেরু অঞ্চলের স্পিটবার্জনের সমুদ্র কখন থেকে জমে যায় তিনি বলে দেবেন। এমনিতে অগডেন একেবারে মাটির মানুষ, শুধু একটি ব্যাপারে তাঁর ক্ষিপ্ত রুদ্র মূর্তি কখনো-সখনো নাকি দেখা যায়। জাহাজের কম্পাসের ধারে কাছে নাবিকদের কেউ ভুলে ছুরি কাঁচি গোছের লোহার কিছু যদি ফেলে যায়, তা হলে আর তার রক্ষা নেই। অগডেনের সেই আগুনের মত জ্বলে ওঠা চেহারা দেখার সঙ্গে একটা দুর্ভেদ্য রহস্যের সমাধান জানবার ভাগ্য এ যাত্রায় আমার হবে ভাবতেও পারিনি।

অগডেন আমায় গুডনাইট জানিয়ে সামনে চলে যাবার পর কেবিনে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ালাম।

ওপরের ডেক থেকে কেবিনে যাবার সিঁড়ির কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল। সিঁড়িটা নীচের ডেকের করিডরে গিয়ে নেমেছে। সেই করিডরের পাশেই আমাদের কেবিন। করিডরটা তখন প্রায় অন্ধকার। সেই আবছা আলোতেই মেয়েটিকে দ্রুতপদে করিডরের অন্য প্রান্তে চলে যেতে দেখলাম।

pathagar.net

থমকে দাঁড়িয়েছিলাম মুহূর্তের জন্যে, তার পরই পড়ি-কি-মরি অবস্থায় নীচে নেমে গেলাম।

কিন্তু কোথায় সেই নারীমূর্তি! সমস্ত করিডরটা একবার ঘুরে এলাম। এ ডেকে দুটি মাত্র প্রথম শ্রেণীর কেবিন। তার একটিতে আমরা, আর একটিতে স্বয়ং ক্যাপটেন থাকেন। করিডরটা শেষ হয়েছে গিয়ে নীচে জাহাজের খোলে যাবার সিঁড়িতে। সেখানেই মালপত্র বোঝাইয়ের গুদাম থেকে ইঞ্জিন ঘর ও নাবিকদের থাকবার জায়গা। কোনো মহিলার সেখানে লুকিয়ে থাকা ত অসম্ভব।

অথচ লুকিয়ে না থাকলে এ নারীমূর্তি এ জাহাজে উপস্থিত থাকে কি করে! দু'দিন আগে বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়বার পরই সেদিন এমনি গভীর রাত্রে মেয়েটিকে প্রথম ওই নীচের করিডরেই দেখতে পাই। সেদিন ওপরের ডেক থেকে নীচে নামছিলাম না, রাত্রে ঘুম না আসায় ওপরের ডেকে যাবার জন্যে কেবিন থেকে বার হচ্ছিলাম। দরজা খুলতেই করিডরের অন্য প্রান্তে মেয়েটিকে দেখতে পাই। আমায় দেখতে পেয়েই মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে নীচের খোলে নেমে যায়।

এ জাহাজে তখন প্রথম উঠেছি। যাত্রী আর কে আছে না-আছে, তা জানি না, তাই সেরকম কিছু বিচলিত না হলেও একটু অবাক বোধহয় হয়েছিলাম। জাহাজটা নেহাতই মাল বওয়া ট্র্যাম্প স্টীমার। যাত্রী সাধারণত জাহাজে থাকে না বললেই হয়। বন্দর থেকে জাহাজে ওঠার সময় কোনো মহিলা যাত্রীকে অন্ততঃ দেখিনি।

পরের দুপুরে খাবার টেবিলে বসেই কথাটা তুলেছিলাম। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী বলে ক্যাপটেনের সঙ্গে এক টেবিলে আমাদের খেতে বসবার ব্যবস্থা। যাঁকে দেখেছি তিনি আমাদের মত যাত্রী হলে তাঁরও জায়গা এই টেবিলে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁকে খাবার টেবিলে ত নয়ই, স্টীমারেও কোথাও দেখিনি।

সেই কথাটা পাড়বার জন্যে ক্যাপটেনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ জাহাজে আর কোনো যাত্রী আছেন কি না।

"আর কোনো যাত্রী!"—ক্যাপটেন ডিগ্‌বি অবাক হয়ে বলেছিলেন—"আর কোনো যাত্রী কোথা থেকে আসবে! এ জাহাজে যাত্রী কেবিন ত মাত্র একটি, যাতে আপনারা আছেন।"

"না,"—একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বলেছিলাম—"এই ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া অন্য ক্লাসের যাত্রী ত থাকতে পারেন।"

"না, মশাই না!"—ডিগ্‌বি বলেছিলেন—"ফার্স্ট সেকেন্ড কোনো ক্লাসের কোনো কেবিন আর নেই। আমাদের এ জাহাজে যাত্রীই নেওয়া হয় না। বড় লাইনের ভালো জাহাজ থাকতে এ রদ্দি জাহাজে যাত্রী হতেই বা চাইবে কে! নেহাত আপনাদের অদ্ভুত সখ আর এ জাহাজের মালিক আফ্রিকা ট্রেডার্সের সঙ্গে মগনলাল ব্রাদার্সের কাজ-কারবার আছে বলে তাদের সুপারিশের চিঠিতে আপনাদের জন্যে এই কেবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নইলে এ কেবিন বেশীর ভাগ খালিই থাকে, কখনো-সখনো কোম্পানীর কর্তাদের কেউ ইনস্পেকশনে এলে ও কেবিনে থাকেন।"

pathagar.net

ক্যাপটেনের কথা শেষ হবার পর নিজের সংশয়টা ব্যক্ত না করে পারিনি।

বলেছি—"তা হলে বুঝতে হবে আমরা আর আপনার জাহাজের ক্রু ছাড়া আর কেউ এ জাহাজে নেই। কিন্তু আমি যে কাল রাত্রে একজন মহিলাকে আমাদের কেবিনের বাইরের করিডরে দেখেছি!"

"একজন মহিলাকে!"

"রাত্রে করিডরে!"

ক্যাপটেন ও মামাবাবু দু'জনেই বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলেন। তারপর মামাবাবুর মুখেই একটু টেপাহাসি দেখা দিয়েছিল। বলেছিলেন—"ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখিস নি ত!"

"স্বপ্ন!"—আমি জ্বলে উঠেছি মামাবাবুর ওপর—"কাল রাত্রে তখনো পর্যন্ত আমার ঘুমই আসেনি। আপনি তখন অবশ্য নাক ডাকাচ্ছেন কুম্ভকর্ণের মত। ওপরের ডেকে যাবার জন্য দরজা খুলতেই ওই মহিলাকে করিডরের প্রান্তে দেখতে পাই। আমায় দেখেই সিঁড়ি দিয়ে তিনি নীচে নেমে যান।"

"কিন্তু তা কি করে সম্ভব, মিঃ হাজরা?"—ডিগ্‌বির গলায় কিন্তু কৌতুকের বদলে উদ্বিগ্ন গাম্ভীর্য— "প্রথমে এ জাহাজে কোনো মহিলা থাকতেই পারে না, সিঁড়ি দিয়ে নীচে তিনি যাবেনই বা কোথায়? নীচে কি আছে আপনাদের ত কাল দেখিয়েই এনেছি। সেখানে একজন মহিলা থাকার জায়গা কোথায়?" একটু চুপ করে থেকে ডিগ্‌বি আবার জিজ্ঞাসা করেছেন—"আচ্ছা, মহিলার চেহারাটা কি রকম বলবেন?"

একটু বিব্রত বোধ করে বলেছি—"চেহারা ওই আবছা অন্ধকারে দূর থেকে কি ভালো দেখতে পেয়েছি! তবে পাতলা, লম্বা, কম বয়সী কেউ বলেই মনে হয়েছে। জ্যাকেট আর স্কার্ট পরা। মাথায় তার সঙ্গে একটা বেরে টুপি ছিল এ বিষয়ে ভুল নেই। প্রথমে হঠাৎ তাই যেন মেয়ে অফিসার-টফিসার বলে ধারণা হয়েছিল।"

"মাথায় বেরে পরা মেয়ে অফিসার!"—বলে এবার ক্যাপটেন হেসে ফেলেছেন—"না মশাই, আমাদের ট্র্যাম্প জাহাজে এখনো মেয়ে অফিসার নেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়নি। কালে কালে হয়ত সবই হবে। তবে তার আগেই আমার জাহাজ ছেড়ে অবসর নেবার সময় হয়ে যাবে, এই বাঁচোয়া।"

হাসি-ঠাট্টায় ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া আমার মনঃপূত হয়নি। একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে বলেছি—"জেগে স্বপ্ন দেখার রোগ কিন্তু আমার নেই, মিঃ ডিগবি। এ রহস্যের একটা কিছু মানে নিশ্চয় আছে। একজন অল্পবয়স্কা ইউরোপীয়ান মহিলাকে কাল যে আমি করিডরে দেখেছি তা আমি আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ করে বলতে পারি।"

"সত্যিই ব্যাপারটা ত তা হলে অদ্ভুত।"—মামাবাবু আমায় একটু যেন সমর্থন করেছেন—"আচ্ছা, জাহাজে অনেক সময়ে বিনা খরচে লুকিয়ে যাবার চেষ্টা ত কেউ কেউ করে। সেই রকম কোনো স্টোঅ্যাওয়ে নয় ত!"

ক্যাপটেন এ কথায় সামান্য যেন চিন্তিত হয়েছেন। ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ সুপের প্লেটটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছেন—"স্টোঅ্যাওয়ে আমার এই মাল জাহাজে! তাও আবার মেয়েছেলে!"

pathagar.net

মামাবাবুর দিকে সোজা এবার মুখ তুলে তাকিয়ে থেকে বলেছেন—"বিশ্বাস করতে মন চায় না, মিঃ রায়। এই স্টীমারে স্টোঅ্যাওয়ে কি সুখে থাকতে চাইবে! আর মিঃ হাজরা যা বর্ণনা দিচ্ছেন সেরকম যুবতী একটি মেয়ে লুকিয়ে থাকবে কোথায়! এ ত আর সমুদ্রে প্রাসাদের মত বিরাট প্যাসেঞ্জার জাহাজ নয়, যার নানা কোণ-কানাচ আছে লুকিয়ে থাকবার। তবু সন্দেহ যখন জেগেছে, তখন ভালো করে একবার তল্লাস করে দেখব।"

প্রসঙ্গটা ওইখানেই শেষ হয়েছিল। রাত্রে ডিনারের সময় ক্যাপটেন আমাদের জানিয়েছেন যে, স্টীমারটা যত দূর সাধ্য তিনি প্রায় তন্ন তন্ন করেই খুঁজিয়েছেন, কোথাও কোনো স্টোঅ্যাওয়ে ত পাওয়া যায়নি। কথাটা মিঃ ডিগবি এমন সুরে বলেছিলেন যে, মামাবাবু ও আমি দুজনেই সন্দিগ্ধভাবে তাঁর দিকে চেয়েছিলাম।

মামাবাবু বলেছিলেন—"আপনার নিজের মনে একটু সন্দেহ জেগেছে, ক্যাপটেন! কিছু যেন চেপে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে!"

"না, চেপে যাইনি।"—ডিগবি একটু ইতস্ততঃ করে বলেছেন—"যে সামান্য ব্যাপারে আমার একটু ধোঁকা লাগছে, সেটা আপনাদের বলব কি না তাই ভাবছিলাম, ব্যাপারটা সত্যিই হয়ত কিছু নয়।"

"কিছু যদি না হয় তা হলেও বলতে দোষ কি!"—আমি কথাটা বার করতে চেয়েছি।

দু'এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ডিগবি বলেছেন—"খোঁজ করে স্টোঅ্যাওয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি, শুধু আমাদের একজন এ বি, দু নম্বর হোল্ডে একটা বেরে টুপি পেয়েছে। বেরে টুপিতে কিছুই অবশ্য প্রমাণ হয় না। ও টুপি সাধারণত পুরুষরাই পরে, আমাদের জাহাজে কাজ করে ত্রিশ জন। তাদের কারুরই ওটা হওয়া সম্ভব।"

শেষের কথাগুলো ডিগবি যেন নিজেকে স্তোক দেবার জন্যেই বলেছেন। তেমন জোর দিয়ে বলতে পারেন নি।

মামাবাবু তাই বোধ হয় বলেছেন—"টুপিটা কার তা কিন্তু জানা যায়নি, কেমন?"

"না, সেইটেই মজা!"—ক্যাপটেন স্বীকার করে নিজের ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন—"খোঁজাখুঁজি দেখে যার টুপি সে বোধ হয় ভড়কেই মালিকানাটা চেপে গেছে।"

ক্যাপটেনের এ কথার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই মামাবাবু বলেছেন—"আচ্ছা টুপিটা কে পেয়েছে বললেন?"

"বিল মার্ফি। একজন এ. বি.,"—বলেছেন ক্যাপটেন।

"এ. বি. মানে এব্‌ল্ সীম্যান ত!"—মামাবাবু নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন —"তার মানে ও. এস. অর্থাৎ অর্ডিনারী সীম্যান হয়ে অন্তত তিন বছর কাজ করেছে, কেমন?"

"ঠিক ধরেছেন,"—হেসে বলেছেন ডিগবি—"আপনি ত জাহাজের খুঁটিনাটি জানেন দেখছি।"

"জানি আর কতটুকু।"—মামাবাবু বিনয় করেছেন—"এই জাহাজে উঠেই কিছু কিছু শিখেছি। সে কথা থাক। এই বিল মার্ফি দু নম্বর হোল্ডের কোথায় টুপিটা কিভাবে পেয়েছে জিজ্ঞেস করেছেন?"

pathagar.net

"করেছি বই কি!"—ডিগবি বলেছেন—"দু নম্বর হোল্ডে এখন বলতে গেলে কিছুই নেই। একধারে গাদা-করা কিছু চটের থলে পড়ে আছে। সেই চটের থলের মধ্যে কারুর লুকিয়ে থাকবার জায়গা নেই। সেখানে খোঁজ করবারও কথা নয়। তবুও নিজে থেকে সে থলেগুলো নাড়তে গিয়ে ওই বেরেটা পায়।"

"মার্ফিকে তাহলে খুব উৎসাহী বলতে হবে"—বলেছেন মামাবাবু।

"হ্যাঁ, তা একটু উৎসাহী!"—স্বীকার করেছেন ক্যাপটেন—"কিন্তু একটু বেয়াড়াও বটে। ফার্স্ট মেট পার্কারই ত ওকে ওই থলেগুলো ঘাঁটতে দেখে চটে গেছলেন।"

"তাই নাকি।"—মামাবাবু একটু হেসেছেন—"তাহলে মার্ফি বেয়াড়া না হলে ও বেরেটাও ত পাওয়া যেত না। যদিও বেরের কিছু মানে আছে কি না সেইটেই বলা শক্ত।"

"হ্যাঁ,"—ডিগবি আমার দিকে একটু যেন অপ্রসন্নভাবেই চেয়ে বলেছেন—"মিঃ হাজরা এমন একটা ফ্যাক্‌ড়া তুলেছেন যা বিশ্বাসও করতে পারছি না, আবার উড়িয়ে দিতেও পারছি না।"

এ বিষয়ে আর কিছু কথা তখন হয়নি। তারপর এখন আবার সেই মূর্তিকে ক্ষণেকের জন্যে দেখে নীচের সিঁড়ি দিয়ে নেমে তাকে খোঁজবার চেষ্টা আর করলাম না। করিডর থেকে সোজা নিজেদের কেবিনে ঢুকলাম। মামাবাবু অবশ্য তাঁর বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। এই পরম বিলাসের ঘুম ভাঙালে তাঁর মেজাজ কি হবে জানলেও আজ আর দ্বিধা করলাম না। দু'চারবার মুখে ডেকে সাড়া না পেয়ে কাঁধ ধরে সজোরে নাড়া দিয়ে ডাকবার পর অতি কষ্টে চোখ মেলে বিরক্ত জড়ান স্বরে বললেন—"কেন জ্বালাতন করছিস! রাত ত মোটে নটা।"

"নটা নয়, বারোটা,"—আমি রেগে বললাম—"কিন্তু সে কথা নয়। এই মাত্র আবার সেই মেয়েটিকে দেখেছি।"

"আবার!"—মামাবাবু এবার ধড়মড় করেই বিছানায় উঠে বসলেন—"কোথায়?"

বিবরণটা দিলাম। মামাবাবু তাতে অত উত্তেজিত হবেন আমিও সত্যি ভাবিনি। বিছানা থেকে উঠে পড়ে স্লিপিং স্যুট পরা অবস্থাতেই ক্যাপটেনের কেবিনে গিয়ে ধাক্কা দেওয়ায় আমি তখন একটু অপ্রস্তুত।

ক্যাপটেন এমনিতে ভালো মানুষ, কিন্তু এরকম আচমকা মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙলে কি মেজাজ নিয়ে বার হবেন কে জানে! আমি তার পরের দিন সকালেই ব্যাপারটা জানাতে চেয়েছিলাম।

আমাদের ভাগ্য ভালো, ক্যাপটেন তখনো ঘুমোননি। ঘুমোবার আগে একটু মৌতাত করছিলেন। ভুরু কঁচকে বেরিয়ে এলেও আমাদের দেখে জ্বলে উঠলেন না। বললেন—"না, আর হেলা-ফেলা করার ব্যাপার এ নয়। এখুনি নীচে গিয়ে ভালো করে খোঁজ নেওয়া দরকার।"

pathagar.net

একজন ও. এস.-কে ডেকে আমাদের কেবিনের কাছে পাহারায় দাঁড় করিয়ে আমরা সবাই নীচে গেলাম। খোঁজাখুঁজি হল, কিন্তু সবই বৃথা। ইঞ্জিন ঘর থেকে নাবিকদের কেবিন আর সমস্ত হোল্ড যথাসম্ভব সন্ধান করে কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। নিজের দেখা অভ্রান্ত কি না সে বিষয়ে আমারই তখন সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে। নাবিকদের ভাবভঙ্গি ত আমাদের ওপর বেশ অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের। ক্যাপটেন স্বয়ং এবার উৎসাহী না হলে তাদের দিয়ে খোঁজাখুঁজি করানই যেত না বোধ হয়।

ফার্স্ট মেট ত স্পষ্টভাবে নিজের বিরক্তিটা প্রকাশ করে গেলেন। ফার্স্ট মেট এবং বেরে যে পেয়েছে সেই বিল মার্ফির সঙ্গে মামাবাবু একটু আলাদা আলাপ করতে চেয়েছিলেন। ক্যাপটেন হুকুম দিয়েছিলেন সেই মত।

প্রথমে ফার্স্ট মেটের কেবিনে গেলাম। আমাদের বসতে পর্যন্ত না বলে তিনি একটা পাইপ ধরাতে ধরাতে গোমড়া মুখে যা বললেন তা অপমানেরই সামিল।

"আপনারা কোথাকার পুলিশ জানতে পারি? এ রকম চেহারায় পুলিশ আগে কখনো দেখিনি কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

মামাবাবুর এক মুহূর্তে আরেক মূর্তি। সমান মেজাজে কড়া গলায় বললেন—"আমরা প্রশ্ন করতে এসেছি। শুনতে নয়। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি না বলুন?"

ফার্স্ট মেটের চেহারা তখন দেখবার মতন। রাঙামুখ তখন আরো লাল হয়ে উঠেছে রাগে। ষণ্ডা-গুণ্ডা দৈত্যের মত দেহখানা। একটা ঘুঁষি চালালেই আমরা আর নেই।

ফার্স্ট মেট কিন্তু আমাদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থেকে অতি কষ্টে নিজেকে সামলাল। পাইপটা মুখে চাপা দাঁতের জড়ান স্বরে জিজ্ঞাসা করল—"কি আপনাদের প্রশ্ন?"

"প্রশ্ন শুধু একটা।"—মামাবাবুর গলা এখনো রুক্ষ—"এই মারমেড জাহাজে কতদিন কাজ করছেন?"

কি একটা কড়া জবাব দিতে গিয়েও ফার্স্ট মেট যে থেমে গেল তা বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। একটু চুপ করে থেকে মুখ থেকে পাইপটা বার করে বললে—"এক মাস মাত্র।"

"হুঁ, তাই ভেবেছিলাম, ধন্যবাদ।"—বলে মামাবাবু পেছনে ফিরে আমাকে নিয়ে সোজা ওপরে আমাদের কেবিনে।

মামাবাবুর এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিনি। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই, দরজার বাইরে টোকার সঙ্গে ভারী গলায় আওয়াজ পেলাম—"আসতে পারি।"

"আসুন।"—বললেন মামাবাবু।

ভেতরে যে ঢুকল ভারী গলার আওয়াজের সঙ্গে চেহারায় তার মিল নেই। রোগাটে পাতলা কমবয়সী ছোকরা। পরিচয় সে নিজেই দিল—"আমার নাম মার্ফি। ক্যাপটেন পাঠিয়েছেন। আপনারা কি জানতে চান সেই জন্যে।"

রোগা পাতলা ছোকরা হলেও মার্ফির মেজাজটা ফার্স্ট মেটের চেয়ে বিশেষ মোলায়েম নয়। কথাগুলো কাটা-কাটাই লাগল। তার কারণটা অবশ্য আলাদা, একটু পরে বুঝলাম!

মামাবাবু মার্ফির বেলায় কিন্তু ভোল পাল্টে মিষ্টি করে হেসে বললেন—"তুমিই ত বেরে টুপিটা পেয়েছ? কেমন?"

pathagar.net

মামাবাবুর মিষ্টি হাসি আর গলাতেই অতটা কাজ হবে ভাবিনি। মার্ফি প্রায় কাঁদুনে গলায় মামাবাবুর কাছেই তার ক্ষোভ জানালে—"পাওয়াটাই যেন আমার অপরাধ হয়েছে, জানেন! বারণ করা সত্ত্বেও থলেগুলো ঘেঁটেছি বলে আমার ওপর কি সব তম্বী।"

"কে তম্বী করল, কে?"—মামাবাবু হেসে সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"ওই ফার্স্ট মেট?"

"ফার্স্ট মেট মুখে করেছেন।"—মার্ফি বললে—"মনে মনে আরো অনেকেই খাপ্পা।"

"আরো অনেকে কারা? ক্যাপটেনও?"—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"না, না।"—মার্ফি তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ জানালে—"উনি অত্যন্ত ভালো। কিন্তু ওঁর নাকের তলা দিয়ে কি যায় সে উনি জানবেন কি করে?"

"যেমন এ জাহাজে মেয়ে লুকিয়ে থাকা?"—মামাবাবু মার্ফিকে উসকানি দিলেন।

"তা মেয়ে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব কি! এই আমিই ত..." সরলভাবে অতখানি বলে ফেলে মার্ফি যেন ভয় পেয়ে গেল।

"তোমার কিছু ভয় নেই।"—মামাবাবু তাকে সাহস দিলেন—"ক্যাপটেন তোমার সহায় তা ত জান। মোম্বাসা থেকে জাহাজ ছাড়াবার পর নিজে এ রকম কিছু দেখেছ?"

"আমি—আমি"—একটু থতমত খেয়ে মার্ফি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে ফেললে—"আমিও এই পরশু রাত্রে ওপরে ফোকাস্‌ল-এর কাছে ওই রকম একটা মূর্তি যেন দেখেছিলাম। সেটা আলোছায়ায় আমার মনের ভুলই বলে ধরে নিয়েছিলাম অবশ্য।"

"তাই কাউকে আর সে কথা জানাও নি, কেমন?"

ক্যাপটেন কখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন লক্ষ করিনি। তিনি এবার ভেতরে এসে মার্ফিকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। মার্ফি সেলাম জানিয়ে চলে যাবার পর চিন্তিত মুখে বললেন—"ব্যাপারটা তাহলে ভৌতিক বলেই ধরে নেব, মিঃ রায়? সেরকম একটা বদনাম অবশ্য আছে আমাদের মারমেড-এর।"

"সে বদনাম কাটান এবার দরকার নয় কি?"—মামাবাবু বললেন।

"যদি পারেন ত আপনার কাছে সত্যি কৃতজ্ঞ থাকব।"—ক্যাপটেন উৎসুকভাবে মামাবাবুর দিকে তাকালেন—"মেয়েটি যে-ই হোক, সত্যি যদি তাকে খুঁজে বার করতে পারেন!"

"তাকে খোঁজার চেয়ে কেন সে দেখা দেয় সেইটে বোঝাই বেশী দরকার নয় কি?"

ক্যাপটেন ও আমি দুজনেই একটু অবাক হয়ে মামাবাবুর দিকে তাকালাম।

আরম্ভটা যেন ভৌতিক কাহিনীর ভূমিকা হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। সেরকম কিছু লিখতে কিন্তু বসিনি। এধরনের অলৌকিক গোছের ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ব, জানতাম না। মামাবাবুও তা নিশ্চয় ভাবতে পারেননি। সুযোগ পেয়ে নেহাত খেয়ালের মাথায় এই সুদূর সমুদ্রের রাজ্যে তাঁর বেড়াতে আসা। সেই সঙ্গে প্রলোভন দেখিয়ে আমাকেও টেনে এনেছেন।

সুযোগটা হয়েছিল মগনলাল ব্রাদার্সের এক অংশীদার সন্দরদাস্ মগনলালের মামাবাবুর সঙ্গে একদিন দেখা করতে আসা থেকে। মগনলাল ব্রাদার্স আমদানী-রপ্তানীর কারবারী।

pathagar.net

বোম্বাই, করাচী ও কলকাতা থেকে তখনকার দিনে তাঁরা বিদেশে ম্যাঙ্গানিজ ও ইলমেনাইট চালান দেন। সমুদ্র পার থেকে যা আমদানী করেন, তার একটা গুয়ানো, অর্থাৎ পাখীদের যুগযুগান্তরের জমানো মল, সার হিসেবে যার জায়গায় আজকাল কৃত্রিম ফার্টিলাইজার চলছে।

এই গুয়ানো তাঁরা আনেন আফ্রিকার পূর্ব দিকের ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের উত্তরে অ্যাস্টোভ নামে এক ছোট্ট দ্বীপ থেকে। তাঁরা যে সব ছোট মাল জাহাজ ভাড়া করে ভারত থেকে ম্যাঙ্গানিজ ও ইলমেনাইট বিদেশে পাঠান, তারই দু'একটি ফেরবার পথে অ্যাস্টোভ দ্বীপ হয়ে এই গুয়ানো নিয়ে আসে। শুধু অ্যাস্টোভ দ্বীপের গুয়ানো নয়, এক দিক দিয়ে তার চেয়ে অমূল্য পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য এক সাত রাজার ধনও তারা আনে আরো উত্তরের সেসেল্‌জ্‌ দ্বীপপুঞ্জের প্রাসলিন বলে একটি ছোট্ট দ্বীপ থেকে।

মামাবাবু আমায় সেই সাত রাজার ধনের প্রলোভনই দেখিয়েছিলেন।

মগনলাল ব্রাদার্সের অংশীদার সুন্দরদাস ঠিক কি জন্যে মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন জানি না।

সেদিন আমি বিকেলে যখন মামাবাবুর বাসায় গিয়ে পৌঁছেছি, তখন তিনি বিদায় নিচ্ছেন। তাঁর শেষের আলাপটুকুই শুধু শুনে সামান্য যা বুঝেছিলাম। তিনি তখন বলছিলেন—"তাই বলছি, আপনি নিজের চোখে দেখে আসুন, রায় সাহেব। সারা দুনিয়ায় এ জিনিষ আর কোথাও নেই। দু'শ বছর আগে এ জিনিষের জন্যে রাজারা অর্ধেক রাজত্ব দিতে পেছপাও হত না। আপনি নিজের চোখে এ জিনিষ দেখেও আসুন আর আমাদের সমস্যাটারও মূল কি, তা ধরবার চেষ্টা করুন।"

"আপনাদের সমস্যা ত আসলে মারমেড নিয়ে"—বলেছিলেন মামাবাবু।—"অন্য জাহাজের তুলনায় মারমেড অনেক কম ভাড়ায় আপনাদের মাল বয়ে আনে। কিন্তু গত কয়েকবার কিছুতেই সময় মত বোম্বাই, করাচীতে পৌঁছাতে পারছে না। তার জন্যে লোকসান কিছু আপনাদের বইতে না হলেও ব্যাপারটার মানে আপনারা বুঝতে চান। এই ত?"

"হ্যাঁ, বুঝতে চাইছি একদিকে মারমেড-এর মালিকের খাতিরেই। মালিক স্টীম ট্রাস্ট বলে ছোট একটা বিলাতী কোম্পানী। কোম্পানী অত্যন্ত ভালো। শুধু যে অনেক অল্প ভাড়ায় আমাদের কাজ করে, তা নয়। পৌঁছাতে দেরী হবার জন্যে যে গুনাগার লাগে, তা নিজেরাই দ্বিরুক্তি না করে নিজেদের পাওনা থেকে কাটতে দেয়। তারা নিজেরাই এ ব্যাপারের খোঁজখবর অবশ্য নিচ্ছে। আমরা তাদের হিতৈষী হিসেবে কিছু করতে চাই। তবে সেটা গোপনে করা উচিত বলেই আপনাকে যেতে বলছি। আপনি যেন ওই পথে বেড়াতে চান। বন্ধু ও অতিথি হিসেবে আপনাকে আমরা সুযোগ দিচ্ছি।"

"খোঁজখবরে এ পর্যন্ত ত বিশেষ কিছুই জানতে পারেন নি"—বলেছেন মামাবাবু—"শুধু একবার সেসেল্‌জের রাজধানী মাহে দ্বীপের ভিক্টোরিয়াতে জাহাজটাকে সরকারী নৌ-পুলিশ খানাতল্লাসীর জন্যে দু'দিন আটক রেখেছিল এইটুকু জানেন।"

"হ্যাঁ, সে খানাতল্লাসীও নেহাত অকারণ, অন্যায়।"—বলেছেন সুন্দরদাস—"সরকারী দপ্তরের কোনো ভুল নির্দেশেই সেটা হয়েছিল বোধ হয়। খানাতল্লাসীতে কিছুই পাওয়া যায়নি। যাবেই বা কি? অতি সাধারণ একটা মালের ট্র্যাম্প জাহাজ। ম্যাঙ্গানিজ, ইলমেনাইট আর গুয়ানো বওয়াই তার কাজ। নৌ-পুলিশ ক্ষমা চেয়ে সসম্মানে তাই মারমেড-কে ছাড়পত্র দিয়েছে। মারমেড-এ খানাতল্লাসী সেই একটিবারই হয়েছিল, কিন্তু তারপর জাহাজ কয়েকবার ধরে ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারছে না। এ ব্যাপারে রহস্য যদি কিছু থাকে তা আলাদা ধরনের বলেই তাই সন্দেহ হয়।"

"মারমেড-এর নাবিকদের মধ্যে একটা কি কুসংস্কারের ধারণার কথা বলছিলেন না?"—প্রশ্ন করেছেন মামাবাবু।

"হ্যাঁ! আজগুবী ধারণা!"—হেসে বলেছেন সুন্দরদাস। "মারমেড-এর ওপর কোনো এক সমুদ্রের অপদেবতার ভর হয়েছে, এই গুজব তাদের মধ্যে রয়েছে। সেই অপদেবতাই নাকি জাহাজকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে। ট্র্যাম্প জাহাজের প্রায় মুখ্খু-সুখ্খু নাবিকদের মধ্যে ওরকম কুসংস্কার থাকা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং ওসবে আপনাকে কান দিতে বলছি না। আপনি নিজের চোখ কান খোলা রেখে হয়ত কিছু ধরতে পারবেন,এই আমাদের আশা।"

সুন্দরদাস তারপর নমস্কার জানিয়ে চলে গেছেন। মামাবাবু বর্মায় যখন ছিলেন, তখন থেকেই মগনলাল ব্রাদার্সের সঙ্গে যে তাঁর যোগাযোগ ছিল, সে কথা এবার অস্পষ্টভাবে আমার মনে পড়েছে। মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে তাঁর কাছেও কোম্পানীর পরামর্শ চাওয়া চিঠি দু'একটা মাঝে মাঝে আসতে দেখেছি।

সুন্দরদাস চলে যাওয়ার পর মামাবাবু আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে বলেছেন—"পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য, কোকো দ্য মের তা হলে আমরা দেখতে যাচ্ছি।"

"আমরা যাচ্ছি মানে?"—আমি হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছি—"আর অষ্টম আশ্চর্য কোকো দ্য মের, সে-ই বা কী বস্তু?"

"আমরা যাচ্ছি মানে—"

মামাবাবু যেন প্রথম ভাগ পড়াবার গলায় বুঝিয়ে দিয়েছেন—"তুই আর আমি কাল বুধবার বিকেলে বোম্বে মেলে রওনা হচ্ছি, আর শুক্রবার বোম্বে পৌঁছে সেই দিনই সন্ধ্যায় বি. আই. এস. এন.-এর এক প্যাসেঞ্জার জাহাজে বোম্বে থেকে আফ্রিকার কিনিয়ায় মোম্বাসা বন্দরে পাড়ি দিচ্ছি। মোম্বাসায় দুদিন থাকার সময় আশ্চর্য রূপকথার সাত রাজার ধন, অতল সাগরের অমৃত ফল কোকো দ্য মের স্বচক্ষে দেখতে আর নিজেদের মুখে চাখতে।"

আমার হাঁ-করা মুখ দিয়ে আর কথা বার হয়নি। মামাবাবুই আবার বলেছেন—"কোকো দ্য মের কি বস্তু বুঝতে পারিস নি ত? না পারবারই কথা। ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দের আগে এ বস্তু যে কি ও কোথাকার কেউই জানত না। মধ্যযুগে এ বস্তু অতি বিরল ছিল। কখনো কখনো সিংহল আর ভারতবর্ষের উপকূলে অদ্ভুত এক ফলের মত জিনিস সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে আসত। সে ফলের শাঁস অমৃত বলে লোকে বিশ্বাস করত।

pathagar.net

"হেন রোগ নেই যা নাকি তা খেলে সারে না। যে কোনো বিষ তা কাটিয়ে দেয়, এই ছিল তখনকার ধারণা। গভীর সমুদ্রের তলায় একটি মাত্র নাকি গাছ আছে, যাতে এই আশ্চর্য ফল ফলে। পৃথিবীর সব সমুদ্রের স্রোত সেই অতলে গিয়ে মিশেছে। সেখানকার ঘূর্ণীতে পড়লে কোনো জাহাজ আর ফেরে না। সেই আজব গাছের অবাক ফল কালেভদ্রে নাকি খসে পড়ে, সমুদ্রের স্রোতের বিরুদ্ধে ভেসে গিয়ে দূর কোনো উপকূলে পৌঁছে নিজে নিজেই হেঁটে ডাঙায় ওঠে। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য এ ফল সম্বন্ধে এরকম আজগুবী কিংবদন্তী ছড়ান খুব অস্বাভাবিক নয়। একটি ফলের ওজন আধ মণের ওপর পর্যন্ত হয়।

"১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে সেসেল্‌জ দ্বীপপুঞ্জের প্রাস্‌লিন দ্বীপটি আবিষ্কারের পর এ ফলের রহস্যের মীমাংসা হয়। কোকো দ্য মের মানে সমুদ্রের নারকেল, পৃথিবীর এই একটি মাত্র দ্বীপেই জন্মায়। জন্মভুমি জানা গেলেও কোকো দ্য মের এখনো অবাক-করা ফল। এ ফল একশ' ফুট লম্বা গাছে ফলে। তাও গাছের বয়স পঁচিশ বছর হবার আগে নয়। গাছগুলো কত দিন বাঁচে এখনো সঠিক জানা যায় নি। ১৭৬৮ সালে দেখা কয়েকটা গাছ অন্তত এখনো বেঁচে আছে। এ ফল গাছে ঝুলো হতেই নিদেন পক্ষে সাত বছর। এ ফল দেখবার এমন সুযোগ কি ছাড়ে!"

সত্যি সত্যিই তারপর মামাবাবুর সঙ্গে একদিন মোম্বাসায় পাড়ি দিয়েছি। এখনকার পাসপোর্ট, ভিসা, ফরেন এক্সচেঞ্জ, ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স, পি ফর্মের দিন হলে অবশ্য সম্ভব হত না। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও বছর দশেক আগের কথা, পৃথিবীতে ওসব বেড়া তখনো দুর্লঙ্ঘ্য হয়নি। মোম্বাসায় দুদিন থেকে মারমেড জাহাজে চড়ে প্রাসলিন দ্বীপে পৌঁছেছি। মুগ্ধ হয়েছি সেখানকার কোকো দ্য মের বা দানব নারকেলের অরণ্য দেখে। এবার জাহাজ চলেছে অ্যাস্টোভ দ্বীপে গুয়ানো বোঝাই করতে। ইতিমধ্যে ওই আধাভৌতিক রহস্যময় নারীমূর্তির আবির্ভাবে উত্তেজনা যে অমন তীব্র হয়ে উঠবে, কে জানত।

সমুদ্রের হালচাল বোঝা এখনো বুঝি মানুষের অসাধ্য। ক'দিন আকাশ বেশ পরিষ্কার পেয়েছি। শান্ত সমুদ্রের মৃদুমন্দ হাওয়ার ঢেউ। হঠাৎ কাল সন্ধ্যা থেকেই গাঢ় কুয়াশায় দিগ্বিদিক ঢেকে গেছে। রাত্রে একটা তারার কণা কোথাও দেখা যায়নি। ওপরের ডেকে উঠে মনে হয়েছে সমুদ্রে নয়, যেন মেঘলোকের ভেতরেই আছি। ডেক থেকে সকাল সকালই নেমে এসে কেবিনে শুয়ে পড়েছি। কেবিনে মামাবাবুকে না দেখে একটু অবশ্য অবাক হয়েছিলাম। রাত্রের ডিনার শেষ করে বিছানায় গড়াবার জন্যে মুখটা ধোয়া পর্যন্ত যাঁর প্রায় তর সয় না, তিনি আজ এই বিদঘুটে কুয়াশার রাত্রে বিছানা ছেড়ে গেলেন কোথায়? মামাবাবুর অবশ্য সব কিছুই অদ্ভুত। কাল বিকেলেই যেমন তাঁর হাতে একটা পুরোনো পত্রিকা দেখেছি, পত্রিকাটা আবার পর্তুগীজ ভাষায় সাপ্তাহিক। আমায় কৌতূহলভরে সেটা লক্ষ করতে দেখে বলেছেন—"পোর্তুগীজ শেখবার চেষ্টা করছি রে।", সে পত্রিকা নিয়ে সেসময়, তাঁর রাত্রে ঘরে না থাকা নিয়েও তেমনি বেশীক্ষণ অবশ্য মাথা ঘামাইনি। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে জেগেছি একেবারে ভোরবেলায়।

pathagar.net

ঘুম ভাঙবার পরই অস্বাভাবিক কিছু ঘটার আভাস পেলাম। জাহাজ কিছুক্ষণ থেকে চলছে না। থেমে থাকার এই স্তব্ধতাটাই নিজের অজান্তে অস্বস্তি জাগিয়েছে। কিন্তু জাহাজ এখন থেমেছে কেন?

অ্যাস্টোভ দ্বীপে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছনর কথা নয়। সেকেন্ড মেটের সঙ্গে আলোচনায় জেনেছি, আজ বিকেলের আগে সেখানে পৌঁছন যাবে না। তা হলে জাহাজ কোথায় কি কারণে থামল? মামাবাবুই বা এই সাত সকালে গেলেন কোথায়? তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে হাত-মুখ ধুয়ে পোশাক পরে বাইরে গিয়ে যা শুনেছি, তা প্রায় অবিশ্বাস্য। রাত্রের কুয়াশার মধ্যে দিক ভুল করে বিপথে গিয়ে জাহাজ সম্পূর্ণ অন্য একটি দ্বীপে এসে পৌঁছেছে। সেকেন্ড মেটই ছিলেন জাহাজ চালাবার কাজে। কুয়াশার মধ্যে যথানিয়মে কম্পাসের নির্দেশেই তিনি জাহাজ চালিয়েছেন। কিন্তু ভোরে কুয়াশা কেটে যাবার পর অবাক হয়ে দেখেছেন, কম্পাসের কাঁটাই তাঁকে ভুল পথে নিয়ে এসেছে। প্রথমটা হতভম্ব হলেও সেকেন্ড মেট অগডেন রাগে তারপর ফেটে পড়েছেন।অগডেনের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বার হবে। উত্তেজিতভাবে ক্যাপটেনকে তিনি বোঝাচ্ছেন যে, এ ব্যাপারে জাহাজের কোনো বদমায়েসের কারসাজী নিশ্চয় আছে। কম্পাসের কাছে কেউ চুম্বক বা লোহার কিছু অন্ততঃ লুকিয়ে রেখেছে। নইলে কম্পাসের এ ভুল হওয়া সম্ভব নয়। ক্যাপটেনকে তাই জাহাজের সবাইকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করতে অনুরোধ করছেন।

ক্যাপটেন অত্যন্ত চিন্তিত মুখে ধৈর্য ধরে শুনে বললেন—"কিন্তু চুম্বক বা লোহার কিছু লুকিয়ে যে কেউ রেখেছে, তার প্রমাণ কি? আমি ত আপনার সঙ্গেই সব খুঁজে দেখলাম। কোথাও সেরকম কিছু ত নেই।"

সেকেন্ড মেটকে এবার অনিচ্ছার সঙ্গে সে কথা স্বীকার করতে হল।

আমি এসে তাঁর সেই রুদ্রমূর্তিই দেখলাম। সেখানে তখন ক্যাপটেন ডিগবি আর মামাবাবু ছাড়া কেউ নেই। মামাবাবু এই ভোরে যে এখানে হাজীর থাকবেন ভাবতেই পারিনি।

"তা হলে?"—ক্যাপটেন ডিগবি নিজেই বেশ ফাঁপরে পড়েছেন মনে হল। বললেন—"ও ধরনের কিছু থাকলে ত কম্পাসের কাছাকাছি থাকবে! কম্পাসের এ রকম বিগড়ে যাওয়ার মানেই ত বোঝা যাচ্ছে না।"

"মানেটা যদি ভৌতিক হয়?"

মামাবাবুর কথায় সবাই আমরা তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম।

"ভৌতিক!"—সেকেন্ড মেট বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ,"—মামাবাবুর গলায় কৌতুকের একটু যেন আভাস!—"এ জাহাজের সে রকম একটা দুর্নাম ত শুনেছি। জাহাজকে ভুল রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে যায় বলে গুজব।"

"এ হাসি-তামাসার সময় নয়, মিঃ রায়।"

ক্যাপটেন একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন।

pathagar.net

"ব্যাপারটা তা হলে গুরুতর কিছু বলছেন!"—মামাবাবুর গলা হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর শোনাল— "বেশ, কম্পাসের ভুলে জাহাজ তাহলে কোথায় এসে থেমেছে জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"এটা অ্যালডাবরা দ্বীপ!"—বললেন ক্যাপটেন—"যেখানে আমাদের যাবার কথা সেই অ্যাস্টোভ দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে।"

"হুঁ, আগেই জানতাম। টেস্টুডো এলিফ্যান্টিনা-র দেশ।"—মামাবাবু আমাদের সকলকেই বোধ হয় থ করে দিলেন।

"কিসের দেশ বললেন?"—ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করলেন ভ্রূকুটিভরে।

"টেস্টুডো এলিফ্যান্টিনা।"—মামাবাবু শান্ত গলায় বললেন—"পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সাতমণী কচ্ছপ এই অ্যালডাবরা দ্বীপেই পাওয়া যায়।"

"কিন্তু এখানেই জাহাজ থামবে আপনি আগে জানলেন কি করে?"—জিজ্ঞেস করলেন সেকেন্ড মেট।

"জেনেছি এর আগেও বার কয়েক পথ ভুলে জাহাজ এখানেই থেমেছে বলে।"—মামাবাবু ক্যাপটেনের দিকে তাকালেন জিজ্ঞাসুভাবে—"কেমন, তাই না?"

"কোথায় থেমেছে না থেমেছে আপনি জানলেন কি করে?"—ক্যাপটেন এবার বেশ গরম।

"জেনেছি, আপনাদের লগ্‌বুক লুকিয়ে দেখে!"—মামাবাবুর মুখে গা-জ্বালান হাসি।

"লগ্‌বুক দেখে! লুকিয়ে আমাদের লগ্‌বুক দেখেছেন আপনি!"—ক্যাপটেন জ্বলে উঠলেন।

"লুকিয়েই দেখেছি সত্যি। কিন্তু প্রকাশ্যে দেখবার অধিকারও আমার আছে।"—মামাবাবু পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে ক্যাপটেনের সামনে খুলে ধরে বললেন—"এটা পড়লেই বুঝতে পারবেন স্টীম ট্রাস্ট আর মগনলাল ব্রাদার্স দু' তরফ থেকেই আমায় ঢালাও অধিকার দিয়েছে মারমেড জাহাজের ব্যাপারে যা আমার দরকার মনে হয়, সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখবার।"

"আপনি! আপনি তা হলে আমাদের মধ্যে গুপ্তচর হয়ে এসেছেন!"—ক্যাপটেন ঘৃণার সঙ্গে বললেন।

"হ্যাঁ, সেরকম গালাগালও দিতে পারেন।"—মামাবাবু নির্বিকারভাবে বললেন—"তবে শুধু আমাকে নয়, আপনার ফার্স্ট মেট এই মিঃ স্টিলকেও।"

ফার্স্ট মেট মিঃ স্টিল কখন এসে সেখানে দাঁড়িয়েছেন লক্ষ করিনি। অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। মামাবাবু তখন বলে যাচ্ছেন—"মিঃ স্টিলকেও জাহাজের রহস্য সন্ধানের জন্যেই ব্রিটেনের নৌ-পুলিশ বিভাগ থেকে ফার্স্ট মেট সাজিয়ে পাঠান হয়েছে।"

ক্যাপটেন একবার মামাবাবুর দিকে আর একবার মিঃ স্টিলের দিকে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে এবার কেমন একটু যেন থতমত খেয়ে অসহায়ভাবে বললেন—"আমার ওপর তা হলে স্টীম ট্রাস্টের বিশ্বাস নেই বুঝতে হবে। কিন্তু আমি কি নিজেই এই রহস্যের মীমাংসার চেষ্টা

করছি না? ব্যাপারটা চাপা দেবার ইচ্ছে থাকলে লগ্ বুকের বিবরণ কি বদলে লেখাতে পারতাম না? এখনি সব জানাজানি হলে এ জাহাজের অফিসার থেকে সাধারণ নাবিকের মধ্যে নিরীহ নির্দোষ অনেকের চাকরী নিয়ে টানাটানি হবে বলেই আমি নিঃশব্দে রহস্যটার মীমাংসা করতে চেয়েছি।"

"কিন্তু এই মায়া-দয়া করতে গিয়েই রহস্যের খেই আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, মিঃ ডিগবি।"—বললেন ফার্স্ট মেট রূপী মিঃ স্টিল।

"হ্যাঁ, বারবার জাহাজ এই অ্যালডাবরা দ্বীপেই কেন ভুলে এসে থামে তা অন্ততঃ বোঝবার চেষ্টা করতেন।"—মামাবাবুও যোগ দিলেন।

"তা বোঝাবার চেষ্টা করিনি মনে করেছেন?"—ক্যাপটেন বেশ ক্ষুণ্ণ—"কাল রাত্রে আমি নিজে কতবার এসে মিঃ অগডেনের সঙ্গে কম্পাস তদারক করে গেছি জানেন? কম্পাস এ রকমভাবে বিফল হবার কোনো কারণই ত খুঁজে পাচ্ছি না।"

"কারণ ত মিঃ অগডেন আগেই বলে দিয়েছেন।"—মামাবাবু হাসলেন—"কম্পাসের কাছে কোনো চুম্বক জাতীয় জিনিস থাকাই হল আসল কারণ।"

"মিঃ অগডেনের সঙ্গে আমি নিজে ভালো করে এ কামরা খুঁজে দেখেছি।"—ক্যাপটেন এবার উত্তেজিতভাবে বললেন—"ম্যাগনেট জাতীয় কোনো কিছুই পাইনি। আপনারাও খুঁজে দেখুন না।"

"তা ত দেখতেই হবে।"—মামাবাবুর গলার সুরটা কেমন অদ্ভুত।

সেকেন্ড মেট অগডেন নীরবে অপ্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার বিরক্তির সঙ্গে বললেন—"আমি তা হলে এখন যাচ্ছি। সারা রাত জেগে কাটিয়েছি, এখন বিশ্রাম দরকার।"

মিঃ অগডেন পা বাড়াতেই কিন্তু মামাবাবু বাধা দিলেন—"দাঁড়ান, যাবেন না, মিঃ অগডেন। আর যদি যেতে চান, আপনার ওভারকোটটা খুলে রেখে যান।"

"ওভারকোট খুলে রেখে যাব?"—অগডেন গরম মেজাজে ফিরে দাঁড়ালেন।

"হ্যাঁ, ওই ওভারকোটেই এ জাহাজের রহস্যের চাবিটি আছে কি না।"

মামাবাবু ও মিঃ স্টিল দু'জনেই তখন দু'দিক থেকে অগডেনকে গিয়ে ধরেছেন।

আমি ও ক্যাপটেন হতভম্ব হয়ে তাঁদের দিকে তাকাতে মামাবাবু হেসে আবার বললেন—"খুব অবাক হচ্ছেন, মিঃ ডিগবি? কিন্তু ওভারকোটের এই বোতামগুলো দেখেছেন? একটু বেখাপ্পা গোছের গড়ন নয়?"

বলতে বলতে ওভারকোট থেকে সজোরে একটা বোতাম ছিঁড়ে নিয়ে মামাবাবু আবার বললেন—"এই বোতামের ভেতরেই লুকোন ম্যাগনেট। ওই দিয়েই জাহাজের কম্পাস নিজের দরকার মত বেঠিক করে অপদেবতার কোপের গুজব তৈরীর চেষ্টা হয়েছে।"

"কিন্তু বোতামের মধ্যে লুকোন ম্যাগনেটের কথা আমার মাথায় আসেনি, মিঃ রায়।"—শ্রদ্ধা, বিস্ময়ের স্বরে বললেন মিঃ স্টিল—"আপনি বুঝলেন কি করে?"

"বুঝলাম কাল রাত্রে প্রথম মিঃ অগডেনকে এই ওভারকোট পরে কনট্রোল রুমে আসতে দেখে। এখন বেশ গরমের দিন যাচ্ছে। ওভারকোট চাপাবার কোনো প্রয়োজনই

হয় না। কাউকে না বুঝতে দিয়ে কম্পাস বিকল করবার একমাত্র উপায় হল ম্যাগনেট জাতীয় কিছু। সে ম্যাগনেট সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কিভাবে রাখা সম্ভব, ভাবতে গিয়েই ওভারকোটের বোতামের কথা আমার মাথায় আসে। আচ্ছা, মিঃ অগডেনকে এখন নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখুন, মিঃ স্টিল। আমি ক্যাপটেনের সঙ্গে কাজের কথাগুলো সেরেই যাচ্ছি। আশা করি মিঃ অগডেন গোলমাল করবার চেষ্টা করবেন না।"

"না, তা করব না।"—ধরা পড়েও ভেঙে না পড়ে অবজ্ঞাভরে মামাবাবুর দিকে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল অগডেন—"আমায় বন্দী করে আপনারাই বা করবেন কি? বিলেতে বিচার হয়ে বড়জোর আমার চাকরীটা যাবে। তার চেয়ে বেশী কিছু যদি হয় তা হলে কিছুদিনের জেল! আমি তার পরোয়া করি না। কিন্তু এ জাহাজের সব রহস্য তাতেই বুঝে ফেলবেন মনে করেছেন?"

নেহাত চাপা রাগে ও আক্রোশেই বোধ হয় অগডেনের মুখ আলগা হয়ে শেষ আস্ফালনটা বেরিয়ে পড়েছিল। মামাবাবু তার উত্তর না দিয়ে একটু শুধু হাসলেন।

মিঃ স্টিল অগডেনকে নিয়ে চলে যাবার পর ক্যাপটেনই আবার সেই কথা তুলে তাঁর সংশয় ও উদ্বেগটা প্রকাশ করে ফেললেন।

"অগডেন ত সত্যি কথাই বলে গেল, মিঃ রায়। ম্যাগনেটের সাহায্যে কম্পাস বিগড়ে দিয়ে জাহাজ ভুল পথে চালাবার জন্য অগডেনের হয়ত ভালো রকম সাজাই হবে, কিন্তু মারমেড-এর রহস্য তাতেই সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে না!"

"রহস্য সবই পরিষ্কার হয়ে গেছে মিঃ ডিগবি।"—মামাবাবু আশ্বাস দিলেন—"জাহাজে ভৌতিক মহিলা আমদানী করে আমাদের আসল রহস্য থেকে নজর সরিয়ে দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও ওদের সব ফন্দী-ফিকিরই ধরে ফেলেছি। আপনি এখন অ্যাস্টোভের বদলে মাদাগাস্কারের উত্তর-পশ্চিমের নোজিবে বন্দরে জাহাজে চালাবার হুকুম দিন দেখি।"

"নোজিবে বন্দরে!"—ক্যাপটেনের মুখ একটু গম্ভীর হল—"তা ত আমি পারি না, মিঃ রায়। কোম্পানীর যে নির্দেশ নিয়ে আমি জাহাজ মোসাম্বা থেকে ছেড়েছি তা লঙ্ঘন করতে আমি পারি না।"

"লঙ্ঘন ত এর মধ্যেই করেছেন!"—মামাবাবু হাসলেন—"তবে তা অবশ্য নিজের অজান্তে এবং অনিচ্ছায়। যাই হোক, কোম্পানীর নির্দেশ অমান্য করতে আপনাকে হবে না। স্টীম ট্রাস্টের লন্ডন অফিস থেকে এতক্ষণে নোজিবেতে জাহাজ নিয়ে যাবার নির্দেশ এসে গেছে বলেই মনে করি। আপনি স্পার্কাস অর্থাৎ ওয়্যারলেস অফিসারের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখুন। জাহাজ কিন্তু এখুনি ছাড়তে হবে, মিঃ ডিগবি।"

"নির্দেশ এসে থাকলেও এখুনি কি করে জাহাজ ছাড়ব, মিঃ রায়?"—ক্যাপটেন এবার একটু বিব্রতভাবে জানালেন—"জাহাজ এখানে থামবার পর আমাদের দু'জন নাবিক যে বড় কচ্ছপ দেখবার জন্যে একটা বোট নিয়ে দ্বীপে গেছে। দু'জনেই বলতে গেলে ছেলেমানুষ। তাই আমি অনুমতি না দিয়ে পারিনি।"

"তাদের একজন বিল মার্ফি, কেমন?"—জিজ্ঞাসা করলেন মামাবাবু।

pathagar.net

"হ্যাঁ, বিল মার্ফি আর ডিক রবার্টাস বলে একজন ও. এস.।"—বললেন ক্যাপটেন—"তারা ঘণ্টা দুয়েক বাদেই ফিরবে।"

"তাদের ফিরতে দেওয়া আর হবে না, মিঃ ডিগবি"—মামাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—"ওই দ্বীপেই হাতে-নাতে যাতে তারা ধরা পড়ে, তার ব্যবস্থাই করতে হবে এখন। ধরা অবশ্য শুধু বিল মার্ফিই পড়বে। ডিক রবার্টাস না জেনে তার সঙ্গী হয়েছে মাত্র। সুতরাং প্রথমে ধরলেও তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।"

"এসব আপনি কি বলছেন, মিঃ রায়।"—ক্যাপটেন একটু বিরক্ত ও সন্দিগ্ধভাবেই মামাবাবুর দিকে তাকালেন। মনে হল মামাবাবু আবোল-তাবোল বকছেন বলেই তাঁর ধারণা।

"আজগুবী কিছু বলছি না, মিঃ ডিগবি! বিল মার্ফি হাতে-নাতে কিভাবে ধরা পড়বে জানেন? ধরা পড়বে ওই দ্বীপের টেস্টুডো এলিফ্যান্টিনা মানে হাতী-কচ্ছপের পীঠের খোলার পেছনের খাঁজে চোরাই হীরে সিমেন্ট দিয়ে, পুডিং দিয়ে আটকে রাখবার চেষ্টায়। আফ্রিকা থেকে চোরাই হীরের কারবারীরা এই অদ্ভুত ফিকির কিছুকাল ধরে চালাচ্ছে। এই ফিকিরে হীরে যারা পাচার করে তারা আপনাদের মারমেডের মত কোনো কোনো জাহাজের দু-চারজন অফিসারকে টাকা দিয়ে হাত করে নানা ছলে এ দ্বীপে জাহাজ লাগাবার ব্যবস্থা করে। তারপর ওই হাত-করা দলের কেউ অতিকায় কচ্ছপ দেখার ছুতোয় দ্বীপে গিয়ে হীরে আটকে দিয়ে আসে। অতিকায় কচ্ছপ সংখ্যায় খুব বেশী নয়। দ্বীপের একটি অংশেই তাদের পাওয়া যায়। সুতরাং কাজটায় খুব অসুবিধে নেই। এরপর আসল ব্যাপারীদের দলের আর কেউ এক সময়ে অন্য জাহাজে বা সুলুপে এসে সেখানে এ সব হীরে সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এ সব দ্বীপে সখের টহলদারদের অভাব নেই। তারা আসে, ঘুরে ফিরে চলে যায়। তাদের কেউ যে চোরাই হীরে সংগ্রহ করতে আসে, এ সন্দেহ কে করবে? অ্যালডাবরা দ্বীপে কচ্ছপের গায়ে চোরাই হীরে থাকার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। নানা দেশের পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও চোরাই হীরে চালানের এই একটা অদ্ভুত ঘাঁটির কথা তাই এতদিন কল্পনাও করতে পারেনি। মারমেড-এর বিপথে ঘোরার রহস্য ভেদের চেষ্টায় আসবার সময় মাহে দ্বীপে একবার মারমেড খানাতল্লাসী করা হয় জেনেই আমার মনে সন্দেহ জাগে। মোম্বাসায় খোঁজ নিয়ে চোরাই হীরের ব্যাপারেই এই খানাতল্লাসী হয় জেনে সন্দেহটা দৃঢ় হয়।

মারমেড তল্লাস করে তখন কিছু পাওয়া যায়নি। যাবে কি করে? অ্যালডাবরায় চোরাই হীরে তার আগেই চালান হয়ে গেছে। অ্যালডাবরা দ্বীপেই কয়েকবার মারমেড পথ ভুলে এসে পড়েছে জেনে হীরে চালানের পদ্ধতিটা আমি অনুমান করবার চেষ্টা করি। ভুতুড়ে মহিলার খোঁজে সাধারণ ও. এস. নাবিকদের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ নিয়ে জানতে পারি যে, জাহাজ এখানে থামলে প্রতিবারই বিল মার্ফি কখনো একলা, কখনো আর কারুর সঙ্গে কচ্ছপ দেখবার ছুতোয় এ দ্বীপে নেমেছে। কচ্ছপ যেখানে পাওয়া যায় সে জায়গার বাইরেও সে কোথাও যায়নি। কচ্ছপদের সাহায্যে যে চোরাই হীরে লুকোন হচ্ছে, এ বিষয়ে

তখন আর আমার সন্দেহ থাকে না। আমার অনুমান যে ঠিক, তার প্রমাণ মিঃ স্টিলই আমায় দেখান। নৌ-পুলিশ বিভাগ থেকে কাউকে যে এ জাহাজে পাঠান হয়েছে তা আমি জানতাম। স্টিলই যে সেই লোক তা শুধু আগে বুঝতে পারিনি। বেরে পাওয়ার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারি উনি মাত্র একমাস আগে এ জাহাজে যোগ দিয়েছেন। তাইতেই ওঁকে আসল লোক বলে অনুমান করে পরে গোপনে আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ করি ও দুই কোম্পানী আমায় যে চিঠি দিয়েছে তা ওকে দেখাই। উনিও তখন বোলেটিন দ্য মোজাম্বিক অর্থাৎ মোজাম্বিক থেকে বার করা একটা সাপ্তাহিক বুলেটিনের একটা পুরোন সংখ্যা আমায় দেখান। অতি সাধারণ কাগজ, তাও পোর্তুগীজে লেখা বলে সে সংখ্যার একটা ছোট ভ্রমণ বিবরণ মোজাম্বিকের বাইরে কারুর চোখে পড়েনি। মিঃ স্টিল সে ভ্রমণ বিবরণের একটি জায়গা অনুবাদ করে আমায় পড়ে শোনান। একজন পোর্তুগীজ তাতে লিখেছেন যে, ম্যাডাগাস্কারের উত্তরের ছোট ছোট দ্বীপে একটি সুলুপ নিয়ে বেড়াতে গিয়ে অ্যালডাবরা দ্বীপে তিনি অতিকায় কচ্ছপ দেখতে পান। একটি কচ্ছপের মাপ-জোক নিতে গিয়ে তিনি তার পেছনে ছোট্ট আধময়লা কাঁচের টুকরোর মত পাথর আঁটা আছে দেখেন। পাথরটা খুলে নিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করবার পর সেটা হীরে বলেই তাঁর সন্দেহ হয়েছে। তাই সেটা তিনি পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছেন। বিবরণে সে পরীক্ষার ফল না জানান থাকলেও হীরের চোরাই কারবারীদের কৌশল আমাদের কাছে এবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্ফি এই দলেরই একজন। তাকে হাতে-নাতে তাই ধরবার ব্যবস্থা করেছি। এখন অ্যালডাবরায় রেসিডেন্স গভর্নরের কাছে আপনাকে শুধু একটু বেতার-খবর পাঠাতে হবে।"

"তা পাঠাচ্ছি।"—মামাবাবুর দীর্ঘ বিবরণে যেন ঘোর লাগা অবস্থায় ক্যাপ্টেন বললেন—"কিন্তু জাহাজের সব রহস্যের মীমাংসা এখনো হল না।"

"হ্যাঁ,"—এতক্ষণে আমিও মিঃ ডিগবিকে সমর্থন করলাম—"আসল সহস্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেবার জন্যেই জাহাজে ভূতুড়ে মহিলার আমদানী করা হয় আপনি বলছেন। কিন্তু সে মহিলা তা হলে গেলেন কোথায়?"

"তিনি ওই অ্যালডাবরা দ্বীপেই গেছেন।"—হাসলেন মামাবাবু—"ওই বিল মার্ফিই মহিলা সেজে আমাদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছে। রোগা পাতলা চেহারার মেয়ে সাজতে ওর অসুবিধেই হয়নি। বেরেটা খুঁজে পাওয়ার ভান করে বেশী চালাকী করতে যাওয়াই অবশ্য ওর মারাত্মক ভুল। স্টিল ও আমি তাইতেই ওর বিষয়ে সন্দিগ্ধ হই।"

pathagar.net

অতলের গুপ্তধন

সব কিছু জানা থাকলেও প্রথমটা একেবারে হতভম্বই হয়ে গেছলাম স্বীকার করছি।

নিজের শ্রবণশক্তি সম্বন্ধেই সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি? কি বললি?"

যাকে উদ্দেশ করে এ প্রশ্ন সে কিন্তু নির্বিকার। আমার বুদ্ধির স্থূলতাতেই যেন একটু বিস্মিত হয়ে ঈষৎ ভ্রূকুটি করে তার পূর্বের কথাটার পুনরাবৃত্তি করলে।

আগের বারের চেয়ে শুধু একটু বেশী জোর দিয়ে বলল—"হ্যাঁ মন্‌টন্ করলাম।"

"মন্‌টন্ করলি!"—বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে কথাটা শুধু মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলাম।

আমার অজ্ঞান-তিমির দূর করবার জন্যে যে ব্যাখ্যাটি এবার বর্ষিত হল, তাইতে কিন্তু একেবারে কুপোকাৎ হয়ে গেলাম।

"মন্‌টন্ করলাম"—এর সরল ব্যাখ্যা শোনা গেল—"চেঁচিয়ে পেলাম।"

এবার মুখ দিয়ে আর বাক্য নিঃসরণ হল না, বিমূঢ়তাটা শুধু বিরক্তি আর অধৈর্যের দিকে এগোবার একটু লক্ষণ বুঝি দেখা গেল।

সেই লক্ষণটা দেখেই মঙপো আরো তৎপর হয়ে উঠল আমায় বোঝাতে।

"মন্‌টন্ করে মানে চেঁচিয়ে পেলাম, বুঝতে পারছ না?"

আমি না বুঝলেও মঙপো নামটা শুনেই মামাবাবুর পুরোন ভক্তদের অনেকেই বোধহয় ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন।

বক্তা যখন মঙপো তখন বাংলা ভাষা নিয়ে কিছু ভানুমতীর খেল নির্ঘাত সে খেলবে এ কথাটা আমারও অবশ্য অনুমান করা উচিত ছিল। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার ঠেকে যা শিখেছি তা কিন্তু সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম তখনকার মত। ভুলে গিয়েছিলাম একটি বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে কৌতূহলটা একটু বেশী হয়ে উঠেছিল বলে।

বস্তুটা হল মঙপোর হাতে বাঁধা একটি তাবীজ ধরণের কিছু। মঙপোর হাতে আগে কখনো দেখিনি কিংবা লক্ষ করবার সুযোগ পাইনি।

মঙপো হঠাৎ গরমের জন্যেই বোধহয় হাতকাটা ফতুয়া সেদিন পরেছিল বলে তাবীজটা চোখে পড়ল।

বিশেষ করে চোখ পড়ল তাবিজটার যা আসল সম্বল সেই জিনিষটার জন্যে।

pathagar.net

মাদুলী-টাদুলী নয়, জিনিষটা, দূর থেকে অদ্ভুত একটা মুদ্রা বলেই মনে হল। নিউমিসম্যাটিক্স মানে মুদ্রাতত্ত্বে আমি পণ্ডিত নই, কিন্তু মণ্ডপোকে কাছে ডেকে তাবীজের মুদ্রাটা পরীক্ষা করে সেটা যে বেশ বিরল গোছের কিছু সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না।

মুদ্রাটা বহুকালের পুরোন আর সোনার বলেই মনে হল। সবচেয়ে অদ্ভুত তার খোদাই করা অক্ষরগুলো। সে হরফগুলো রোম্যান আর ভাষাটা একেবারে অজানা।

এ রকম মুদ্রা দিয়ে তাবিজ করা নতুন ধরনের সৌখীনতা নিশ্চয়ই তবে মামাবাবুর সঙ্গে এতকাল কাটিয়ে মণ্ডপোর সখটখ একটু ভিন্ন হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

কিন্তু মুদ্রাটার পরিচয় কি? আর তাবীজ করবার জন্য এ মুদ্রা সে পেল কোথায়?

সেই কথাই মণ্ডপোকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তার উত্তরে হতভম্ব-করা উত্তর শুনেছি—"কেন? সামানাকে মন্‌টন্‌ করলাম যে।"

'মন্‌টন্‌ করলাম'-এর ব্যাখ্যা 'চেচিয়ে পেলাম' শোনবার পর আমার বা মণ্ডপোর দু'জনের একজনের নির্ঘাত মাথা খারাপ হয়েছে ভাবাটা খুব অস্বাভাবিক বোধ হয় না।

ঠিক এই অবস্থায় পৌঁছে হঠাৎ মণ্ডপোর ভাষার কেরামতীর কথা না মনে পড়ে গেলে কি করতাম বলা যায় না।

এক যুগ আগে মণ্ডপোর বাংলা ইডিয়মের বিশেষত্বে অস্থির হতে হয়েছিল। তার সেই 'পাহাড় জ্বালা করার কথা' আর 'গুম কাটা' মার্কা বাংলা যে এখনো বদলায়নি সে কথা ভোলা অবশ্য উচিত হয়নি।

হেসে ফেলে ধমকের সুরে বললাম—"ইডিয়ামের বাহার ছেড়ে সোজা ভাষায় এ জিনিষ কোথায় পেয়েছিস বল দেখি। মন্‌টন্‌টা আসলে কি ব্যাপার?"

"কি ব্যাপার বুঝতে পারলি না!"

কৌতুকের সুরে মামাবাবুর গলা শুনে ফিরে তাকালাম। তিনি সকালে কি কাজে একটু বেরিয়েছিলেন। কখন ফিরে এসে ঘরে ঢুকেছেন টের পাইনি।

বাইরের পোশাক ছাড়তে ছাড়তে মামাবাবু বললেন—"ইডিয়ম নয়, ওটা হল সাধু ভাষার প্রয়োগ।"

"সাধু ভাষা!"—একটু ভ্রূকুটিভরে মামাবাবুর দিকে তাকালাম। মামাবাবু আমাকে নিয়ে তামাসা করছেন নাকি?

সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—"মন্‌টন্‌ আবার কি রকম সাধু ভাষা? বাংলার অন্ততঃ নয়।"

"হ্যাঁ, বাংলারই"—বাইরের পোষাক আর জুতো ছেড়ে পড়বার ঘরের আরাম কেদারাটায় গোলগাল দেহটি আয়েসে এলিয়ে দিয়ে মামাবাবু বললেন—"ওটা হল সংস্কৃত!"

এবার আমাকে একেবারে বিস্ময়ে নির্বাক দেখে মামাবাবু একটু হেসে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন— "মন্‌টন্‌ হল আসলে মন্থন! মানে সমুদ্র-মন্থনের মণ্ডপো সংস্করণ!"

"মন্‌টন্‌ হল মন্থন!"

pathagar.net

ফিরে তাকিয়ে দেখি বাংলা ভাষার এ অবিশ্বাস্য ভেল্কীবাজ মঙপো আর ঘরে নেই। মামাবাবুর ব্যাখ্যা শুরু হতে না হতেই সে সরে পড়েছে।

মুখে হাসলেও হতভম্ব ভাবটা তখনো সমানই আছে। মামাবাবুকে তাই জিজ্ঞাসা করতে হল কৌতূহলভরে—"মন্‌টন্‌ করলাম মানে চেঁচিয়ে পেলাম ব্যাপারটা কি? তা ছাড়া তার সঙ্গে ওর হাতের তাবীজের ওই পুরোন মুদ্রাটার সঙ্গে সম্বন্ধটা কিসের?"

"সম্বন্ধ একটু আছে।"—মামাবাবু আরাম কেদারায় হেলান দেওয়া অবস্থায় অর্ধনিমীলিত চোখে ঘুম জড়ান গলায় বললেন—"মন্‌টন্‌ যেমন মন্থন, তেমনি চেঁচিয়ে হল চেঁছে। সবুজ কচ্ছপগুলোর হদিস খুঁজছিলাম ত তখন!"

মাথা যতই ঘুরপাক খাক, মামাবাবুকে বেশ জোরে হাত ধরে নাড়া দিতে হল। নিদ্রা ব্যাপারটা মামাবাবুর একেবারে সাধা। বিছানায় একটু গড়াতে পারলে ত বটেই, আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে মাথাটা একটু পেছনে ঠেকাতে না ঠেকাতেই গভীর ঘুমে তিনি তলিয়ে যেতে পারেন। তখন ঠিক তাই ঘটেছে। দু'চোখের পাতা ত বুজে গেছেই। শেষ কথাগুলো যা বলেছেন তা প্রায় অস্পষ্ট। 'মন্‌টন' 'সামানাকে' 'চেঁচিয়ে' আর সবুজ কচ্ছপের হদিস জড়িয়ে যে অদ্ভুত ধাঁধাটি তখন পাকিয়ে উঠছে তার রহস্যভেদের জন্যে মামাবাবুর ঘুম ভাঙার অপেক্ষা করবার ধৈর্য আমার রইল না।

প্রথমে ভদ্রভাবে নাড়া দেওয়ায় কোনো কাজ না হওয়ায় রীতিমত ধাক্কা দিয়েই মামাবাবুকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি বলছেন, কি? স্বপ্নের ঘোরে প্রলাপ বকছেন নাকি? মঙপোর হাতের তাবীজের ব্যাপারে সবুজ কচ্ছপের কথা আসছে কোথা থেকে?"

মামাবাবুর চেহারা দেখে তখন মায়া হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কৌতূহলের তীব্রতায় আমি তখন নির্মম। চোখ দুটোর পাতা যেন অতি কষ্টে মেলে ধরে ক্লান্তভাবে বললেন—"ব্যাপারটা টার্টল্‌ সুপ থেকেই শুরু কি না।"

আমার দিশেহারা বিহ্বল দৃষ্টিটা এতক্ষণে বোধ হয় লক্ষ করে নিজে থেকেই এবার তিনি সোজা হয়ে উঠে বসে ঘুমটা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে বললেন—"যা, আমার শোবার ঘরের আলমারী থেকে উনিশশো একত্রিশ সালের ডায়েরীটা বার করে নিয়ে আয়, চাবীটা ড্রয়ারেই আছে জানিস ত!"

ছুটে ওপরে মামাবাবুর শোবার ঘরে যেতে গিয়েও দরজায় একবার থমকে দাঁড়ালাম।

ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম সন্দেহভরে—"তুমি আবার এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে না ত?"

"না রে, না। তোর মত জুলুমবাজ ভাগ্নের পাল্লায় পড়লে ঘুমোবার জো আছে!"

মঙপো গোড়ায় যত মাথা গুলিয়ে দিয়ে যাক তার দৌলতেই মামাবাবুর জীবনের অদ্ভুত একটা পালার সঙ্গে পরিচয় হল।

মামাবাবুর জীবনের এই ঘটনার কথা আমার একেবারে অজানাই ছিল।

মামাবাবু উনিশশো একত্রিশ সালের ডায়েরীটা আনতে বলেছিলেন। তাতেই নিশ্চয়ই বোঝা গেছে যে ব্যাপারটা সেই সালের।

pathagar.net

স্মরণ করে দেখলাম ওই উনিশশো একত্রিশ সালের শুধু নয়, তার সামনে পেছনে কয়েকটা বছর মামাবাবুর সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগই ছিল না। যেখানে থেকে 'কুহকের দেশে' আলেয়া-দারুদের রাজ্যে বেশ কয়েক বছর আগে পরম দুঃসাহসে পাড়ি দিয়েছিলেন, বর্মার উত্তরের সেই মিচিনা শহরের কাজ ছেড়ে তখনো তিনি দেশে ফেরেন নি, ড্র্যাগনের জলন্ত নিঃশ্বাস যেখানে গোটা একটা অঞ্চলকে আতঙ্কে জনশূন্য করে তোলে, সেই লুয়াং প্রবাং-এ তাঁর অভিযান তখনো ভবিষ্যতের গর্ভে।

সেই ক'টা বছর নিজের বিশেষ পড়াশুনার জন্যে আমাকে দেশের বাইরে থাকতে হয়েছিল। মামাবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি।

মঙপোর তাবীজের বিচিত্র রহস্য কাহিনীটা সেই সময়কার।

মামাবাবুর ডায়েরী থেকে যা বিবরণ পেয়েছি তাঁর নিজের মুখের কথা শুনে যেখানে যেমন দরকার তা শুধরে বা বাড়িয়ে নিয়ে এ কাহিনী আমি নিজের উৎসাহেই লিখেছি। তাতে ভুলচুক যদি কিছু কোনো কোনো বিষয়ে হয়ে থাকে তা হলে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার নিজের। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কল্পনার চোখে দেখা হিসেবে নিতে হবে এইটুকুই আমার নিবেদন।

সামান্য একটা অদ্ভুত পোকা মধুর চোঙার মধ্যে পাওয়া থেকে আলোয়া দারুদের দেশ আবিষ্কারে মামাবাবুর জীবনের আশ্চর্য একটা অভিযানের সূত্রপাত হয়েছিল। শিকারীদের রিপোর্টে বুনো হাঁসের একটু অস্বাভাবিক গতিবিধির খবর পেয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে লুয়াং প্রবাং-এর উপত্যকার ভয়ঙ্কর শয়তানী একটি চক্রান্ত উদঘাটিত করে আধুনিক যুগের জীবন্ত ড্র্যাগনের রহস্য মামাবাবু ভেদ করেন।

এবারের মঙপোর তাবীজের কাহিনীরও সূচনা সামান্য একটা হোটেলে খেতে বসার ঘটনা থেকে।

মিচিনা থেকে দু'দিনের জন্য মামাবাবু রেঙ্গুনে এসেছিলেন একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

মামাবাবুর বন্ধু ডঃ সার্প একজন জীবতাত্ত্বিক। ইউরোপ থেকে অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে দু'দিন রেঙ্গুনে কাটিয়ে যাবার সময় মামাবাবুকে দেখা করবার জন্য চিঠি লিখেছিলেন।

আজকালকার দিন নয় যে, গোটা পৃথিবী প্লেনেই যখন খুশী ঘুরে আসা যায়। তখন দূর-দূরান্তরে যাওয়ার জাহাজই ছিল ভরসা। ডঃ সার্প পি. অ্যান্ড ও. কোম্পানীর একটি যাত্রী জাহাজে এসে রেঙ্গুনের একটি বড় সাহেবী হোটেলে উঠেছিলেন।

মামাবাবুকে মিচিনা থেকে সেই হোটেলে ডঃ সার্প-এর কামরাতেই উঠতে হয়েছিল। তখনকার দিনে সাদা চামড়াওয়ালাদের দেশী লোকেদের সঙ্গে দূরত্ব রাখা দস্তুর হলেও ডঃ সার্প সে জাতের ইতর ছিলেন না। তিনি নিজে থেকেই বন্ধুর জন্য একটা ডবল বেডরুমের ব্যবস্থা করেছিলেন ভালো করে দু'দিন গল্পগাছা করবার জন্যে।

গল্পগাছা মানে অবশ্য তাঁদের দু'জনের যা ধ্যানজ্ঞান সেই জীববিদ্যা নিয়ে আলোচনা। ডঃ সার্প সখের ভ্রমণের জন্যে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন না। অস্ট্রেলিয়া থেকে তিনি যাবেন

নিউজিল্যান্ড—সেখানকার সমুদ্র উপকূলে, পূর্ব অস্ট্রেলিয়ান সাগর প্রবাহে চিনুক স্যামন মাছের গতিবিধি লক্ষ করতে।

পৃথিবী দুই মহাসমুদ্রে মাছের গতিবিধি নিয়ে দুই বন্ধুর আলোচনা হয়েছে।

সালটা উনিশ শো একত্রিশ, এই কথাটা মনে রাখবার। প্রথম মহাযুদ্ধের স্মৃতি তখন ফিকে হয়ে এসেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তখন বেশ দেরী। পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানসাধক জাতগুলো তখনি কিন্তু সমুদ্রের মহামূল্য খাদ্য সন্ধানে নানা জাতের মাছ ধরা নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে।

পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে জাপান তখন থেকেই এ ব্যাপারে সব চেয়ে উৎসাহী। জাপানের পর তখন আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, পেরু, চীন ও কানাডা মাছ ধরার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হয়েছে।

সমুদ্রের অফুরন্ত সম্পদ আরো কত ভালোভাবে আহরণ করে দুনিয়ার খাদ্য সমস্যা কতখানি যে মেটান যায়, সমুদ্রের মাছ কোথায় কত প্রচুর আর ভালো তার সন্ধান নিয়ে প্রামাণ্য মানচিত্র তখনো যে তৈরী হয়নি—এই সব আলোচনা করতে করতেই সেদিন দু'বন্ধু দুপুরের খানা খেতে হোটেলের ডাইনিং রুমের একটি টেবিলে বসেছিলেন।

টেবিলে ওয়েটার তখন দু'জনকে প্লেটে করে সূপ দিলে এক চামচ মুখে দিয়েই ডঃ সার্প মুখটা কেমন যেন করছেন। তা দেখে অবাক হয়ে মামাবাবু জিজ্ঞাসা করছেন—"কি ব্যাপার সার্প? মুখটা খারাপ লাগল?"

"খারাপ লাগল!"—হেসেছেন ডঃ সার্প—"লাগল একেবারে অমৃত। টার্টল সূপ—এর চেয়ে উপাদেয় আর কিছু আছে বলে ত জানি না।"

"তা হলে মুখটা অমন করলে কেন?"—জিজ্ঞাসা করেছেন মামাবাবু।

"করলাম, এ সূপ খাওয়ার সৌভাগ্য মানুষের আর কত দিন হবে তাই ভেবে!"

"আপনি যে একেবারে দূর-ভবিষ্যতের গণৎকার হয়ে উঠলেন?"—মামাবাবু একটু দুঃখের হাসি হেসে বলেছেন—"যার সূপ খাচ্ছি সেই সবুজ কাছিম মানে কিলোনিয়া মাইডাস-এর বংশ যে ভবিষ্যতে লোপ পাবার আশঙ্কা আছে সে কথা আপনারও তাহলে মনে হয়েছে!"

"মনে হয়নি আবার?"—ডঃ সার্প একটু উত্তেজিত হয়েই উঠেছেন এবার। তা উত্তেজিত হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এককালে উত্তর থেকে দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সমস্ত পূর্ব উপকূলের নতুন উপনিবেশ পত্তনে যা খোরাক যুগিয়ে সাহায্য করেছে, চাষী মজুর থেকে ধনকুবের সবাইয়ের মুখে যার নাম শুনলে লালা ঝরে, আটলান্টিক সমুদ্র পনেরো শ' মাইল যা সাঁতরে পার হয়ে চরতে যায়, নির্মম পাষণ্ড শিকারীদের অত্যাচারে কী ভাবে ধীরে ধীরে তাদের বংশবৃদ্ধি দুষ্কর হয়ে উঠেছে, আর অবাধে এ কাছিম শিকার চলতে দিলে ভবিষ্যতে সত্যিই এই প্রাণীটি একেবারে লুপ্ত না হোক, অত্যন্ত বিরল হয়ে যে উঠবে সে কথা ডঃ সার্পের চেয়ে ভালো করে আর ক'জন জানে! দু'বছর আগে তিনি আটলান্টিক সাগরের মাঝখানকার অ্যাসেন্‌সন্ দ্বীপে এই সবুজ কচ্ছপদের ডিম পাড়ার প্রধান একটি ঘাঁটি দেখতে আর সমুদ্রে দূর-দূরান্তরে তাদের বিচরণের রহস্য বুঝতে

গেছলেন। তাঁর মতে আন্তর্জাতিকভাবে এই মূল্যবান প্রাণীটির বিলোপ বন্ধ করার ব্যবস্থা এখুনি না করলে—

"একটি ব্যবস্থাই সবচেয়ে আগে দরকার।"—ডঃ সার্পের কথায় সায় দিয়েছেন মামাবাবু।

মাদী সবুজ কচ্ছপরা যে সব জায়গায় যুগ-যুগান্তর ধরে ডিম পেড়ে আসছে সেগুলি সংরক্ষিত করাই যে আসল ব্যবস্থা সে বিষয়ে দু'জনেই তারপর একমত হয়েছেন। তাঁদের দু'জনের আলোচনাতে সাব্যস্ত হয়েছে যে একটি মাত্র স্বভাবের দোষই সবুজ কচ্ছপদের পক্ষে সর্বনাশা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ জাতের কচ্ছপ সমুদ্রেই চরে বেড়ায়। যে অ্যাসেন্‌সন্ দ্বীপের কথা বলা হয়েছে, সেখানে ডিম ফুটে বেরিয়ে কচ্ছপের ছা-রা দক্ষিণ বিষুব স্রোতে গা ভাসিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলের উপকূলে চরতে আসে। সেখানেই তারা বড় হয়, তারপর কিন্তু ডিম পাড়বার তাগিদে মাদী কচ্ছপেরা একটানা চৌদ্দ শ' মাইল সাগর পাড়ি দিয়ে অ্যাসেন্‌সন্-এর মত মাত্র সাত মাইল লম্বা একটা দ্বীপে নির্ভুলভাবে গিয়ে ওঠে। সমুদ্রের জলে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সবুজ কচ্ছপরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। সেখানে তাদের শত্রুতা করবার মত কেউ নেই, কিন্তু প্রকৃতির বিধানে ডিম পাড়বার জন্যে মাদী কচ্ছপদের ডাঙায় এসে উঠতে হয়। সেখানে তারা মানুষের মাত্রা-ছাড়া হিংস্র লোভের কাছে একেবারে অসহায়। সবুজ কচ্ছপরা ডিম পাড়তে যে সব দ্বীপে ওঠে সেগুলিতে কচ্ছপ শিকার বা ডিম সংগ্রহ সম্পূর্ণ নিষেধ না করলেই নয়, তার জন্যে কিলোনিয়া মাইডাস-এর জীবনের ধারা আরো ভালো করে জানা, আর তাদের, যাকে বলা যায়, ডিম পাড়বার নির্দিষ্ট সুতিকা-দ্বীপগুলি বিশদভাবে নির্ণয় করা আগে দরকার।

এ সব আলোচনায় মত্ত হয়ে যা থেকে এ প্রসঙ্গ শুরু সে টার্টল সূপ খেতেই দু'জনে প্রায় ভুলে যাচ্ছিলেন। ওয়েটার এসে সেটা মনে করিয়ে দেবার পর সূপে চুমুক দিতে দিতে ডঃ সার্প বলেছেন—"সবুজ কাছিমের সমস্যাই আমার কাছে এখন প্রধান হয়ে উঠেছে, রায়। হাতে যে কাজটা নিয়েছি সেটা সেরেই ক্যারিবিয়ান কি বাহামায় কিলোনিয়া মাইডাস-এর বৃত্তান্ত ভালো করে জানতে যাব ঠিক করে ফেলেছি।"

ডঃ সার্প দু'দিন বাদে মামাবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে জাহাজে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছলেন, বহুকাল পর্যন্ত মামাবাবু তাঁর কোনো খবরই আর পাননি।

প্রায় বছর দুই বাদে তাঁর একটি চিঠি পেয়ে মামাবাবু কিন্তু যেমন অবাক তেমনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। আগেই বলেছি, তখনো প্লেনের যুগ শুরু হয়নি। চিঠিটা জাহাজে জাহাজে সমুদ্রপথে অনেক ঘুরে বেশ দেরীতে এসে পৌঁছেছে। চিঠিটা যেখান থেকে লেখা সেই জায়গাটার নাম শুনলে একটু বিস্ময় জাগবার কথা। জায়গাটাকে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের একটা ছোট স্থলবিন্দু বলা যেতে পারে। কিন্তু ডঃ সার্প সে জায়গায় আছেন জেনে বা চিঠিটা ঘুরে ঘুরে এত দেরীতে পৌঁছাবার জন্যে মামাবাবু অবাক ও উদ্বিগ্ন হননি। অবাক ও উদ্বিগ্ন হয়েছেন চিঠিটার মানে না বুঝতে পেরে।

ডঃ সার্প আর যাই হোন, কল্পনাবিলাসী নন। তিনি মনেপ্রাণে বৈজ্ঞানিক। তিনি যা বলেন বা লেখেন তা স্পষ্ট করেই লেখেন। তার মধ্যে ধোঁয়াটে কিছু থাকে না।

কিন্তু সুদূর বাহামা থেকে যে চিঠি তিনি মাসখানেক আগে পাঠিয়েছেন, হাতের লেখাটার অকাট্য প্রমাণ না থাকলে সেটা তাঁর লেখা বলে বিশ্বাস করাই শক্ত।

ডঃ সার্প চিঠি যা লিখেছেন তা দীর্ঘ নয়। শুধু তার ভাষাটা যেন প্রলাপের মত।

তিনি মামাবাবুকে ইংরেজীতে যা লিখেছেন তার যথাযথ বাংলা হল এই—

প্রিয় রায়,

এই চিঠি তোমার কাছে পৌঁছতে বেশ দেরী হবে জানি, তখন তোমার করবার কিছু থাকবে না বুঝেও এ চিঠি না লিখে পারছি না। তুমি ভূত-টুত বিশ্বাস কর না বোধ হয়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে তারা কিন্তু এই দ্বীপ-বিন্দুতে হানা দিচ্ছে। কিলোনিয়া মাইডাস-এর জীবন রহস্য উদ্ধার করতে এসেছিলাম। সাগর তলের আরো এক গভীরতর রহস্যের সম্পূর্ণ তলিয়ে যাবার আর দেরী নেই মনে হচ্ছে।

দুঃখ কোরো না, মিটমিট করে নেভার চেয়ে এ সমাপ্তির মধ্যে আতঙ্কের সঙ্গে একটা তীব্র উত্তেজনাও আছে।

সবুজ কাছিমের বিষয়ে নতুন যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি তা আলাদা একটি প্যাকেটে তোমার কাছে শিগ্‌গরই পাঠাচ্ছি। হয়ত কাজে লাগাতে পারবে।

ইতি—

ভূতে পাওয়া

জর্জ সার্প

মামাবাবু ডঃ সার্প-এর সে প্যাকেট পাননি। চিঠি পড়ে তিনি কিন্তু আর স্থির থাকতে পারেন নি। বাহামা তখনকার বর্মার মত ব্রিটিশ শাসনের অধীন, বর্মার সরকারী দপ্তরের সাহায্য নিয়ে বাহামায় ডঃ সার্পের খোঁজ করবার ব্যবস্থা করেছেন।

খোঁজ নেওয়া তখনকার দিনে একটু কঠিন ছিল। ডঃ সার্প বাহামার যে দ্বীপবিন্দুটিতে ছিলেন তার নাম সামানা-কে। এই 'কে' বা 'কী' বলতে বোঝায় অত্যন্ত ক্ষুদে দ্বীপ। আমি অবশ্য তা না বুঝে প্রথমে 'কে' বাংলা বিভক্তি বলে ভুল করেছিলাম।

এই সামানে-কে এখনকার দিনেও বাহামার একেবারে পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বললেই হয়। উনিশ শ' একত্রিশ থেকে এখন সাতষট্টিতে প্রায় কল্পনাতীত পরিবর্তন হয়েছে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের। সেখানে এখন প্লেন আর এয়ার ফিল্ডের ছড়াছড়ি। বাহামার রাজধানী হল নিউ প্রভিডেন্স দ্বীপের ন্যাসো। সেখান থেকে আমেরিকার ফ্লোরিডা স্টেটের মিয়ামি শহরে ত ঘড়ি ঘড়ি প্লেন যাওয়া আসা করছে। মিয়ামি থেকে অনেকে প্লেনে গালফ স্ট্রিম ডিঙিয়ে এসে রাতের ডিনার আর নাচটা ন্যাসোতে সেরে ফিরে যান।

এখনকার দিনেও কিন্তু ক্রুকেড দ্বীপের উত্তরে সামনা-কে-তে প্লেন ত নয়ই, নিয়মিভাবে কোনো লঞ্চ যাবার ব্যবস্থাও নেই। সে যুগে তা প্রায় অজানা অগম্যই ছিল।

ডঃ সার্পের খবর পেতে তাই বেশ দেরী হয়েছে।

খবর যা পাওয়া গেছে তা একটু অদ্ভুত। দক্ষিণের ক্রুকেড দ্বীপের ছোট্ট অ্যাটউড বন্দর থেকে একজন পুলিশ অফিসার একটি ইয়ল জাতীয় ক্ষুদে নৌকা নিয়ে সামানা-কে-তে গিয়ে কোনো মানুষজনই দেখতে পাননি। ডঃ সার্প দ্বীপবিন্দুটিতে যে তাঁবু খাটিয়ে থাকতেন

সেটি কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থাতেই পাওয়া গেছে। তার মধ্যে তাঁর কাগজ-পত্র অন্যান্য জিনিষ কিছুই খোয়া যায়নি।

শুধু ডঃ সার্প বা তাঁর অনুচরের কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। সেই সঙ্গে তাঁর নিজের মোটর লঞ্চটিও উধাও।

হয়ত ডঃ সার্প তাঁর অনুচরকে নিয়ে মোটর লঞ্চে বেরিয়েছেন আর কোথাও কোনো দুর্ঘটনায় সে মোটর লঞ্চ ডুবে গিয়েছে বলেই সরকারী রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছে। এ অনুমানে মামাবাবু কিন্তু সায় দিতে পারেন নি। এ খবর পাবার পর তিনি যা করেছেন তা অদ্ভুত। মিচিনার কাজ থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে একদিন মঙপোকে নিয়ে সুদূর বাহামাতেই পাড়ি দিয়েছেন।

বাহামা যাওয়া এত সোজা ছিল না তখন। আজকালকার দিনে ত রেঙ্গুন থেকে জেট বিমানে রোম হয়ে যাওয়া যায় একেবারে আমেরিকার ফ্লোরিডা স্টেটের মিয়ামিতে। সেখান থেকে যাত্রী প্লেনে বা আলাদা প্লেন ভাড়া করে সমুদ্রে ছ'শ' মাইল জুড়ে ছড়ানো যে কোনো দ্বীপবিন্দুতে নামা কঠিন নয়। প্লেন নামবার মত জায়গা আছে প্রায় সর্বত্রই।

তখন কিন্তু অনেক হাঙ্গামা করে যেতে হয়েছে। জাহাজে বঙ্গোপসাগর থেকে ভারতসাগর, তারপর রেড সী দিয়ে সুয়েজ খাল পেরিয়ে মেডিটেরেনিয়ান, সেখান থেকে আটলান্টিক পার হয়ে প্রথমে মিয়ামি, তারপর সেখান থেকে আবার বাহামার রাজধানী ন্যাসোতে গিয়ে ছোট লঞ্চে গিয়ে নামা, এগুলিকে বলে ইয়ল। এই ছোট লঞ্চে ছাড়া জাহাজে বাহামার বেশীর ভাগ দ্বীপে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ বিশাল বিস্তৃত অথচ অগভীর একটি বালির চরের ওপর অধিকাংশ দ্বীপবিন্দু সেখানে যেন বসান। সে আধ-ডোবা বালির চরের জলা বেশীর ভাগ জায়গায় আট হাতের বেশী গভীর নয়।

মামাবাবু মঙপোকে নিয়ে যে ন্যাসোতে গিয়ে উঠেছিলেন, তার চেহারাই ছিল আলাদা, তখনো ট্যুরিজ্‌ম অর্থাৎ টহলদারী হুজুগ এমন ক্ষ্যাপামির চূড়ায় পৌঁছায়নি। ন্যাসো তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রান্তে ঘুমন্ত এক আধা গ্রাম। একটির বেশী মোটর নেই। জেলেরা মাছ ধরে বিক্রী করতে আসে। বন্দরের রাস্তায় গেলে জেলে আর কসাইরা আমাদের এখনকার হাটের ফড়েদের মত খদ্দের ডাকাডাকি করে—"সবুজ কাছিম এক সিলিং-এ দু পাউন্ড, নিয়ে যান মশাই।"

জেলেরা ডাকে আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কসাইরা তাদের মাংসের সস্তা দর হেঁকে শোনায়।

ন্যাসো থেকে সামানা-কে-তে যাবার ব্যবস্থা করতেই একটু বেগ পেতে হয়েছে। কোনো লঞ্চ কি ইয়লকে ভাড়ায় যেতে রাজী করতে না পেরে মামাবাবু একটা পুরোন জেলেদের ইয়ল কিনেই ফেলেছেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ইয়ল কিনলেই হয় না। বাহামার আধ-ডোবা বালির চরের ওপর দিয়ে অজস্র প্রবালপুঞ্জ কণ্টকিত জটিল সব জলপথ ভালো করে জানা না থাকলেই বিপদ। মামাবাবুকে তাই মোটা পারিশ্রমিক কবুল করে সেই সঙ্গে বেশ কিছু বখসীসের আশ্বাস দিয়ে একজন ওস্তাদ পাইলট যোগাড় করতে হয়েছে।

সেই পাইলটকে নিয়ে সামানা-কে-তে যেদিন গিয়ে পৌঁছেছেন সেদিন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় খোঁজাখুঁজি বিশেষ কিছু আর করেন নি। সমুদ্রের কোলে যেখানে নিজেদের লঞ্চটা নোঙর ফেলেছিলেন তা থেকে কিছু দূর পর্যন্ত বালিয়াড়ীর ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছেন মাত্র। কোনো বসতির চিহ্ন কোথাও দেখতে পাননি। ডঃ সার্পের যে তাঁবুর আস্তানার কথা শুনেছিলেন সেটি হয়ত দ্বীপের অন্য কোনো প্রান্তে হবে ভেবে সেদিন আর খোঁজার চেষ্টা না করে নিজেদের আনা ছোট ছোট তাঁবু খাটিয়ে আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন।

মামাবাবু ঘুমের ব্যাপারে কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যে পাল্লা দিতে পারেন সে খবর তাঁর কীর্তিকাহিনী যাঁরা শুনেছেন তাঁদের অজানা নয়। বালিশে মাথা দিতে না দিতেই তিনি গভীর তন্দ্রায় তলিয়ে যেতে পারেন।

সেদিনও তেমনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ভোরের দিকে বিশ্রী একটা একঘেয়ে শব্দের সঙ্গে কেমন সমস্ত শরীরটা ভিজে ভিজে মনে হওয়ায় একটু চমকেই জেগে ওঠেন।

বিশ্রী শব্দটার কারণ বুঝতে দেরী হয় না। বাইরে ঝড় উঠেছে, তাঁবুর দরজায় পর্দাটা কি করে আলগা হয়ে যাওয়ায় তাঁবুর গায়ে ঝাপটাতে ঝাপটাতে সেটা ওই রকম শব্দ তুলেছে। শরীরটা ভিজে যাবার কারণও ওই ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির ঝাপটা।

তাঁবুর পর্দা আলগা হয়ে যাওয়া অবশ্য একটু অদ্ভুত, সাধারণ ঝড়ের ঝাপটায় ঢিলে-ঢালা হবার মত তাঁবু মামাবাবুর নয়। এর চেয়ে অনেক বেশী ধকল সইবার জন্যেই অত্যন্ত মজবুত করে সেগুলো তৈরী।

দরজার পর্দাটা লাগাবার জন্যে মামাবাবু বালিশের তলা থেকে টর্চটা বার করে জ্বেলেই অবাক হয়ে যান! তাঁবুর বেশী জিনিসপত্র লঞ্চ থেকে নামান হয়নি। কিন্তু নেহাত দরকারী হিসেবে যা নামান হয়েছে তার মধ্যে প্রধান তাঁর গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটাই তাঁবুর মধ্যে নেই। ব্যাগটা শোবার আগে ক্যাম্পখাটের গায়েই ঝুলিয়ে রেখেছিলেন বলেই তার অভাবটা প্রথমেই চোখে পড়ল। তারপর টর্চের আলোয় যা চোখে পড়ল তা প্রায় অবিশ্বাস্য। যা ঝড়ের ঝাপটায় আলগা হয়ে গেছে মনে করেছিলেন, তাঁবুর সেই দরজার পর্দাটা স্পষ্টই ধারাল কোনো অস্ত্রে কাটা হয়েছে। পর্দাটা দু' ফাঁক হয়ে তাই ঝোড়ো হাওয়ার দমকে ঝাপটাচ্ছে।

এই নির্জন দ্বীপে মানুষজন থাকবারই কথা নয়। যদি বা থাকে, তা হলে মাত্র একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ চুরি করবার জন্যে তার তাঁবুর পর্দা কাটবার মত গরজ সত্যিই আজগুবী।

আর কিছু যে খোয়া যায়নি মামাবাবু টর্চ নিয়ে তা দেখে নিয়েছেন। হঠাৎ তাঁর মঙপোর কথা মনে হল। মঙপোর ঘুম ত অত্যন্ত সজাগ। তাঁর তাঁবুর গায়েই মঙপোর ক্ষুদে তাঁবু লাগানো। সে কি এ ব্যাপারের কিছুই টের পায়নি?

টর্চের ব্যাটারিটার খরচ বাঁচাবার জন্যে মামাবাবু এবার হ্যাসাক বাতিটা জ্বেলে ফেললেন।

সে বাতির আলোয় তাঁবুটা পরীক্ষা করে বুঝলেন তাঁর আগের অনুমানই ঠিক। তাঁবুতে বেশী কিছু আনা হয়নি, তার মধ্যে শুধু গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটাই চুরি গেছে।

হ্যাসাক বাতিটা নিয়ে মামাবাবু তারপর মঙপোর ক্ষুদে তাঁবুটার দিকে গেলেন।

ভেতর পর্যন্ত যেতে হল না, তার আগেই দেখা গেল সে তাঁবুর দরজার পর্দাও আলগা হয়ে ঝোড়ো হাওয়ায় ঝাপটাচ্ছে, পর্দা সেখানে কাটা নয় এই যা। তারপর ভেতরে গিয়ে যা দেখলেন তা সত্যিই মামাবাবুর অনুমানের বাইরে।

মঙপো সেখানে নেই। তাঁবুর ভেতরকার চেহারা দেখলে মনে হয় মঙপো যেন নিজে থেকেই জামা পরে একটু বেড়াতে বেরিয়ে গেছে। কোথাও একটু অগোছাল কিছু নেই। মামাবাবুর সঙ্গে টহলে বার হলে মঙপোর যেটা নিত্যসঙ্গী সেই ক্যাম্বিসের হ্যাভারস্যাক্‌টাও সে নিতে ভোলেনি।

মামাবাবু মঙপোর তাঁবুতে এ অন্তর্ধান রহস্যের খেই খোঁজবার জন্যে অপেক্ষা করলেন না। ছুটে বেরিয়ে গেলেন তাঁর পাইলট লাফের খোঁজে।

দ্বীপের একটা ছোট খাঁড়িতে ইয়লটা বাঁধা ছিল।

এবার তাঁর মাথায় আরেকবার যেন বাজ পড়ল।

কোথায় লাফে? লাফে ত নেই, তাঁর ইয়লটাও নেই। তীরের বালির ওপর তার নোঙরটা যে তাড়াহুড়ো করে তোলা হয়েছে, টর্চের আলোয় মামাবাবু তা স্পষ্টই বুঝতে পারলেন।

কিন্তু নোঙর তুলে এভাবে লঞ্চ নিয়ে চলে যাওয়ার মানে কি? লাফে কি তাঁকে ফাঁকি দিয়ে ইয়লটা নিয়ে পালাবার জন্যেই এ কাজ করেছে! তাতে তার কি লাভ তা ত বোঝা যাচ্ছে না। লাফেকে সামান্য কিছু আগাম ছাড়া তার মাইনেটাও এখনো দেওয়া হয়নি। মাইনে আর তার ওপর নিশ্চিত বখসীসের পাওনা শুধু ইয়লটা গাপ করবার জন্যেই ছেড়ে যাওয়ার মত আহম্মক লাফে নিশ্চয় নয়। এ ইয়ল নিয়ে সে যাবে কোথায়? যেখানে যাবে, ধরা পড়ার সম্ভাবনা। পুরোন একটা ইয়ল চোরা বাজারে যদি বিক্রী করতেও হয়, তাতে কত আর দাম পাবে? চিরকালের জন্যে দাগী আসামী হয়ে পালিয়ে বেড়াবার মত প্রলোভন তাতে নেই। মামাবাবুর গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটা অবশ্য চুরি গেছে। কিন্তু সে ব্যাগে যে পয়সা কড়ি কিছু নেই লাফে তা ত ভালো করেই জানে, এই জনমানবহীন দ্বীপ বিন্দুতে পয়সা-কড়ির ত কোনো দরকার নেই। সঙ্গে বয়ে আনাই মুর্খতা। ব্যাগে যা আছে তা লাফে দেখেছে। তার সামনেই মামাবাবু ব্যাগ খুলে এ অঞ্চলের বিশেষ ম্যাপটা বার করেছিলেন এ দ্বীপে আসবার সময়। ওই ম্যাপ ক'টা, একটা দূরবীন, একটা সেক্সট্যান্ট আর মামাবাবুর ডায়েরীটা ছাড়া সে ব্যাগে নেহাত একটা আয়োডিনের শিশি, কিছুটা তুলো আর ব্যান্ডেজই শুধু আছে। এ দ্বীপে আসবার সময় ইয়লে লাফের পায়ের একটা আঙুল কেটে যাওয়ায় মামাবাবু তাকে ব্যাগটাই দিয়েছিলেন আয়োডিন তুলো বার করে নেবার জন্যে।

ব্যাগটা চুরি যাওয়ার দরুণই ইয়ল নিয়ে পালানটা লাফেরই শয়তানী বলে বিশ্বাস করা শক্ত হয়েছে। মঙপোর অন্তর্ধান আরো জটিল করে তুলেছে রহস্যটাকে।

তখন ঝোড়ো হাওয়া প্রায় থেমে এসেছে, ভোর হতেও আর দেরী নেই।

মামাবাবু ভোর পর্যন্ত নিজের তাঁবুতে গিয়ে অপেক্ষা করবেনই ঠিক করেছেন। তাঁবু পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছাতে হয়নি তার আগেই তিনি এমন একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখেছেন যা তাঁকে ডঃ সার্পের সেই অদ্ভুত চিঠিটার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

pathagar.net

ডাঃ সার্পের চিঠিতে ষোড়শ শতাব্দী থেকে এই দ্বীপবিন্দুতে ভূতটুত হানা দেয় এমন একটা আজগুবী কথা ছিল। সেই সঙ্গে এমন ইঙ্গিতও ছিল যে ডঃ সার্প নিজেই সেরকম কিছু দেখেছেন।

ডঃ সার্প অসুস্থ কল্পনায় সেরকম কিছু যদি দেখে থাকেন তাহলে মামাবাবুরও নিজের মাথা ঠিক আছে কি না সন্দেহ করা উচিত। কারণ দূরে বালির চড়ার ওপর ভোরের আগের আবছা অন্ধকারে সত্যিই এমন কিছু দেখা যাচ্ছে যা ভৌতিক ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না।

দুটি আবছা ছায়ামূর্তি সেখানে তলোয়ার নিয়ে লড়ছে। তাদের একটিকে ছায়ামূর্তি দেখেই স্ত্রীলোক বলে বোঝা যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, শুধু যে তারা বর্তমান যুগে অচল লম্বা তলোয়ার নিয়েই দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেতেছে তা নয়, তাদের পোষাকও আবছা দেখায় যতটুকু বোঝা যাচ্ছে তাতে মধ্যযুগের সম্ভ্রান্ত সৈনিকদেরই মত বলে মনে হয়।

মামাবাবুর মত মানুষও এ দৃশ্যে খানিক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন।

সত্যিই এ কি তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম? ভৌতিক না হলে এরকম অদ্ভুত ব্যাপারের অর্থই বা কি হতে পারে?

কয়েক মুহূর্ত এই সব ভাবনায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর মামাবাবু সন্তর্পণে ধীরে ধীরে দুই ছায়ামূর্তি যেখানে তলোয়ার নিয়ে যুঝছে সে দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু ছায়ামূর্তি দুটি তার আগেই অন্ধকারে দূরে সরে গিয়ে অস্পষ্ট হতে হতে হঠাৎ একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

হাতের টর্চটা জ্বেলে সেদিকে ফেলবার কথা এতক্ষণ মামাবাবুর মনেই ছিল না। এখন সেটা একবার পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন, না জ্বেলে ভালোই করেছেন। অতদূর তাঁর টর্চের আলো পৌঁছত না।

তাঁবুতে ফিরে গিয়ে সকাল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে মামাবাবু তাঁর অবস্থাটা ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করেন। তাঁর সমস্যা সত্যিই সঙ্গীন। এই এক রত্তি জনমানবহীন দ্বীপে তিনি সম্পূর্ণ একা ও সহায়-সম্বল-হীন। বাহামার দূর সীমার এ সমস্ত দ্বীপবিন্দুতে ন' মাসে ছ' মাসে একটা-আধটা লঞ্চ লাগে কি না সন্দেহ। লাফে তাঁর ইয়ল নিয়ে চলে যাবার দরুণ এখন থেকে বছর খানেকের মধ্যে তাঁর উদ্ধারের আশা সুতরাং নেই বললেই হয়। তার সঙ্গী সহায় মঙপো পর্যন্ত নিরুদ্দেশ। এখানে বছর খানেক কাটাতে হলে তাঁকে ত আরেক রবিনসন ক্রুসো হতে হবে, কিন্তু ক্রুসো বানচাল জাহাজের যে সব দরকারী জিনিসপত্রের সুবিধা পেয়েছিল, তাও ত তাঁর নেই। ইয়ল থেকে তাঁবুটা আর বিছানাপত্র ছাড়া কিছুই নামান হয়নি। খাবারদাবার ও যন্ত্রপাতি সবই পরের দিন সকালে নামাবার কথা ছিল। এখন যতদূর সম্ভব বুদ্ধি খাটালেও এ দ্বীপে আহার সংগ্রহ ত অসম্ভব ব্যাপার। সামানা-কে সম্বন্ধে যে বিবরণটুকু তিনি পেয়েছেন তাতে জানা যায় জন্তু-জানোয়ার কিছুই এ দ্বীপে নেই। দু' চারটি সামুদ্রিক পাখী এখানে চরতে নামে মাঝে। সে পাখী মারবার জন্যেও বন্দুক, না হয় তীর-ধনুক অন্ততঃ দরকার। বন্দুক ত মামাবাবু সঙ্গেই আনেন নি। হঠাৎ দরকারের জন্য যে পিস্তলটা কাছে রাখেন সেটাও আগের সন্ধ্যায়

লঞ্চ থেকে নামাতেই ভুলে গেছেন। এ দ্বীপে একমাত্র মাছ ধরে খাদ্যের সমস্যা মেটাবার কথা ভাবা যায়। কিন্তু যদি বা আলপিন কি সেফটিপিন্ বেঁকিয়ে বড়শি তৈরী করে তাঁবুর ক্যানভ্যাস থেকে সুতো আর রড দিয়ে ছিপ বানান যায়, সেই ছিপ ফেলবেন কোথায়? এই দ্বীপবিন্দুতে একদিকে শুধু বালির চড়া আর অন্য দিকে খানিকটা খাড়া পাহাড়। সমুদ্রে ছিপ ফেলবার জন্যে অন্তত একটা নৌকা ত দরকার।

সব দিক দিয়ে অবস্থাটা বিচার করতে গিয়ে চোখে অন্ধকারই দেখতে হয় মামাবাবুকে। আশাতীত অলৌকিক ব্যাপার যদি না ঘটে তাহলে এ দ্বীপে তিনি না খাবার না জল পেয়ে ক'দিন টিকতে পারবেন! ডঃ সার্পের অন্তর্ধান রহস্য আর যে ভৌতিক দৃশ্য স্বচক্ষে তিনি দেখেছেন তার মীমাংসার চেষ্টার কোনো অবসরই তাঁর মিলবে না।

অবস্থাটা সত্যিই সব দিক দিয়ে হতাশ করবার মত হলেও শুধু মনের জোরে আর অদ্ভুতভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে মামাবাবু প্রায় দশ দিন সেই ভূতুড়ে দ্বীপে কোনো মতে টিকে রইলেন।

জল আর খাবারের সমস্যা মেটাতে অবশ্য তাঁর প্রাণান্ত হয়েছে। এ দ্বীপে ছোটখাট একটা জলের কুণ্ডও নেই যা থেকে পান করবার মত মিঠে জল সংগ্রহ করা যায়। জলের সমস্যা মেটাতে তাঁরা তাঁদের লঞ্চে দিন দশেকের পক্ষে প্রচুর পানীয় জল নিয়ে এসেছিলেন, সে জল ফুরিয়ে গেলে লঞ্চ নিয়ে কাছাকাছি ক্রুকেড দ্বীপ থেকেই জল আনার ব্যবস্থা হত।

লাফে ইয়ল নিয়ে উধাও হবার পর সঙ্গে একবেলার মত পানীয় জলই মামাবাবুর কাছে ছিল। ভোর হবার পর ভালো করে দ্বীপটা ঘুরতে বেরিয়ে মামাবাবু প্রথমে খাবার জলের সন্ধানই করেছেন। একটা ছোট খানা-ডোবাও কিন্তু তাঁর চোখে পড়েনি।

জলের আগে খাদ্যের সমস্যাটাই আংশিকভাবে মেটাবার আশা দেখা গিয়েছে। সামানা-কে-র এক প্রান্ত বালির চড়া থেকে হঠাৎ যেন পাথুরে টিলা হয়ে উঠে সমুদ্রের দিকে একেবারে খাড়া দেওয়ালের মত নেমে গেছে। সেই পাথুরে টিলার সন্ধানে গিয়ে মামাবাবু পাহাড়ের মাথায় এক-একটি খাঁজে সামুদ্রিক পাখীর একটা-দুটো বাসা পেয়েছেন। কোনো কোনো বাসায় দু-একটা ডিম যা পাওয়া গিয়েছে তাতে আপাতত অনাহারে মৃত্যু অন্তত ঠেকান যাবে। প্রাণপণ চেষ্টায় শুধু নয়, ভাগ্যের কিছুটা অনুগ্রহে, জলের সামান্য একটু সন্ধানও তারপর মিলেছে। যেখানে সামুদ্রিক শঙ্খচিল জাতের পাখীর বাসা সেই পাহাড়ী টিলার ওপরেই জায়গায় জায়গায় পাথরের খোদলে বৃষ্টির জল জমে আছে। জল সেখানে যা পাওয়া যায় তা সামান্যই। সেই জল আর সামুদ্রিক পাখীর ডিম সাবধানে হিসেব করে খরচ করে মামাবাবু দিন দশেক কোনো মতে সেখানে কাটিয়েছেন, কিন্তু তারপর আর কোনো আশা যে নেই তা নিজের কাছে স্বীকার না করে পারেন নি।

এ ক'দিন দ্বীপটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েও ডঃ সার্পের রহস্যের কোনো হদিস কোথাও পাননি। প্রথম রাত্রের মত কিছু অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপার ইতিমধ্যে দুবার দেখেছেন। একবার সন্ধ্যার দিকে পাহাড়ী টিলার দিক থেকে বালির চড়ায় তাঁর তাঁবুতে নেমে আসবার পথে দূরে সমুদ্রতটের কাছে একটি নারীমূর্তিকে দেখেছেন। সে মূর্তি যেন

pathagar.net

এই হানা দেওয়া দ্বীপবিন্দুর কোনো অভিশপ্তা অপ্সরীর। গায়ে তার কোনো আবরণ নেই। বাতাসের মত লঘু পায়ে নিভে আসা আকাশের আলোয় স্বপ্নের মত বিছান সাদা বালির চড়া দিয়ে ছুটতে ছুটতে সে যেন মেঘের মত ভেসে যেতে পারে। কিন্তু বেশী দূরে ছুটে যাওয়া তার হয় না। একটা বালিয়াড়ীর কাছে এসে হঠাৎ পায়ে কি যেন আঘাত পেয়ে সে লুটিয়ে পড়ে আর ঠিক সেই মুহূর্তে সেই বালিয়াড়ীর পাশ থেকে দুটি বিশাল সৈনিক মূর্তি যেন সপ্তদশ শতাব্দীর কোনো পুঁথির পাতা থেকে বেরিয়ে আসে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ তখন গাঢ় হয়ে আসছে, অতদূর থেকেই সেই আবছা আলোতেও মাথায় টুপি, গায়ে কোর্তা আর পায়ের জুতোর অদ্ভুত পার্থক্যটা যেন কিছুটা বোঝা গেছে।

জালের মত একটা বড় চাদর গোছের আবরণ তারা ছড়িয়ে দিয়েছ সেই নারী দেহের ওপর, তারপর সেই চাদরে তাকে জড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপদে অদৃশ্য হয়ে গেছে বালিয়াড়ীটার আড়ালে।

ক্ষিদে তেষ্টার সঙ্গে সমানে এ ক'দিন যুঝে মামাবাবুর শরীর তখন প্রায় ভেঙে পড়েছে, তবু দূরের সেই বালিয়াড়ীটা লক্ষ্য করে তিনি ছুটে যাবার চেষ্টা করেন খানিক দূর পর্যন্ত। কিন্তু সে আর সত্যিকার ছোটা নয়, ক্লান্ত ভারী পাগুলো তুলতেই যেন হাঁফ ধরে।

কিছুটা এইভাবে যাবার চেষ্টা করে মামাবাবু হঠাৎ থেমে যান। দূরের সমুদ্রতীর অন্ধকারে কিছু খোঁজার চেষ্টার নিষ্ফলতা বুঝেই থেমে গেছলেন নিশ্চয়! কিন্তু তখন তাঁর মুখটা কেউ দেখতে পেলে একটু বোধ হয় অবাকই হত।

এরপর যে ভৌতিক ব্যাপার ঘটে তা মামাবাবুর তাঁবুর ভেতরেই। মামাবাবু সেদিন সামান্য একটু ঘুরে এসে বিকেল থেকেই তাঁবুর ভেতরে বিছানা নিয়েছেন। শঙ্খচিল জাতের পাখীর বাসা থেকে যে ক'টি ডিম সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তার শেষটি সেই দিন সকালে খাওয়া হয়ে গেছে। ফ্লাস্কের জলও প্রায় তলায় গিয়ে ঠেকেছে। পাথুরে টিলার খোদলে জল পাওয়া একেবারে অসম্ভব না হলেও, মামাবাবুর অতদূর গিয়ে পাহাড় বেয়ে ওঠার কোনো উৎসাহ দেখা যায়নি। যে ভাবে একেবারে তাঁবুর বাইরে এসে দু-পা বাড়াবার পর হঠাৎ তিনি টলে পড়েছেন ও তারপর কোনো রকমে উঠে আবার ভিতরে চলে গেছেন তাতে তাঁর দুর্বলতা প্রায় চরমে পৌঁছেছে বলেই মনে হয়েছে।

সেই দিন রাত্রেই বিছানায় আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকতে থাকতে একবার চোখ খুলে মামাবাবু যেন ভয়ে সিঁটিয়ে চীৎকার করে উঠেছেন—"কে? কে ওখানে?"

বিছানা থেকে সেই সঙ্গে উঠে বসবার চেষ্টাও করেছেন মামাবাবু, কিন্তু মাথাটা একটু তুলেই বালিশের ওপর আবার মুখ থুবড়ে পড়েছেন।

যে ছায়ামূর্তি দেখে চীৎকার করে উঠেছিলেন তা তাঁর একটু কাছে এগিয়ে এসেছে। তাঁবুর ভেতর কোনো আলো নেই, মামাবাবু ক্লান্তিতে কিংবা নিষ্প্রয়োজন বলেই হ্যাসাক বাতিটা সে রাত্রে আর জ্বালেননি। বাইরে জ্যোৎস্না সেদিন বেশ উজ্জ্বল, তারই আভা পর্দার নানা ফাঁক দিয়ে তাঁবুর ভেতরে একটা তরল অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছে, ছায়ামূর্তিটা মনে হয়েছে যেন সেই আবছা কুয়াশা দিয়েই গড়া।

pathagar.net

ছায়ামূর্তিটা কিন্তু যেন চেনা, প্রথম রাত্রের বালির চড়ায় এই মূর্তিকেই তলোয়ার নিয়ে যুঝতে দেখেছিলেন মনে হয়। আবছা অন্ধকারে মুখটা দেখা যায় না। কাবালিয়েরো পুরুষের পোষাকে তার নারী দেহের সৌষ্ঠব কিন্তু আরো ভালো করে যেন ফুটে উঠেছে। সে দিনের মত আজও তার হাতে খোলা তলোয়ার। সে তলোয়ার মামাবাবুর দিকেই তুলে ধরে কি অদ্ভুত ভাষায় অস্ফুট তীব্র স্বরে কি যেন সে বলে।

বুঝুন না বুঝুন, বিছানা থেকে উঠে বসবার বৃথা চেষ্টার সঙ্গে কাতরভাবে মামাবাবু প্রলাপের ঘোরেই বোধ হয় এ দ্বীপ ছেড়ে যাবার আকুলতা জানান।

তারপর আতঙ্কে আর দুর্বলতায় অবশ হয়েই যেন মনে হয় তাঁর গলায় কাতর প্রলাপ ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যায়।

ঠিক তার পরের দিনই অবিশ্বাস্যভাবে ফিরে এসে লাফে যখন তাঁবুর ভেতর মামাবাবুকে খুঁজে বার করে তখন তিনি প্রায় বেহুঁশ, প্রথমে লাফেকে তিনি চিনতেই পারেন নি।

লাফে অনেক চেষ্টা করে তাঁর সাড় ফিরিয়ে ইয়ল সমেত তার উধাও হওয়ার যে বিবরণ দিয়েছে তা অদ্ভুত।

সে রাত্রে ইয়লের ভেতরে শুয়ে প্রথমে ঘুমের মধ্যে সে অদ্ভুত একটা স্বপ্নই যেন দেখে বলে মনে হয়। খানিক বাদেই সে বুঝতে পারে স্বপ্ন নয়, সত্যিই সদ্য ঘুমভাঙা অবিশ্বাস্য একটা ভৌতিক ব্যাপার সে দেখেছে।

তার লঞ্চের ওপর কারা যেন উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেমন অদ্ভুত তাদের পোশাক তেমনি ভাষা, তাদের মধ্যে একজন যে স্ত্রীলোক, পুরুষ যোদ্ধার পোষাক পরে থাকলেও তা বোঝা যায়। সেই স্ত্রীলোকটিই দলের প্রধান। সে হঠাৎ তার বিছানার ধারে এসে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তীব্র ভাষায় কি যেন বলে।

তার সঙ্গী দুই জন দৈত্যর মত জোয়ান। তখন তাকে বেড়ালের ছানার মত ধরে তুলে বাইরে নিয়ে গিয়ে বালির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সভয়ে সামনে তাকিয়ে লাফে দেখে তারই ইয়ল-এর উঁচু মাস্তুলটা থেকে তারই দেহটা যেন ফাঁস লেগে ঝুলছে।

ইয়ল-এর ধারে এসে দাঁড়িয়ে সেই মেয়ে সর্দার ফাঁসীতে ঝোলান তার মূর্তিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে এবার চীৎকার করে যা যা বলে তার ভাষাটা না বুঝলেও মানেটা ধরতে লাফের দেরী হয় না।

লাফের পরিণাম কি হবে তা বুঝিয়ে দিচ্ছে সেই প্রেতিনী মূর্তি।

ভয়ে সমস্ত শরীর লাফের অবশ হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার জ্ঞানই থাকে না, তারপরই কাল ঘাম ঘেমে সাড় ফিরে পেয়ে লাফে দেখে সে ভৌতিক দৃশ্য সম্পূর্ণ গেছে মিলিয়ে।

সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্ন বলেই ভাবতে পারত। কিন্তু স্বপ্ন হলে সে সত্যিই ইয়ল-এর বাইরে বালির ওপর পড়ে থাকবে কেন?

pathagar.net

শুধু তাই নয় তার ইয়ল-এর নোঙরটাও আশ্চর্যভাবে ওপড়ানো। তখনি আকাশে ঝড় উঠেছে, ঝড়ের বেগ তখনো বেশী নয়, কিন্তু আর একটু বাড়লেই লঞ্চটাকে সমুদ্রে ঠেলে দিতে পারে অনায়েসে।

লাফে আর দ্বিধা করেনি। নোঙর তুলে ইয়ল চালিয়ে এই ভূতুড়ে দ্বীপ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে ক্রুকেড দ্বীপের স্লাগকর্ণার-এ গিয়ে উঠেছে। যা ভয় সে পেয়েছিল তাতে সেখান থেকে সটান ন্যাসোতে ফিরে যাওয়াই তার ইচ্ছে ছিল, ঠিক করেছিল সেখানে গিয়ে ইয়লটা ম্যারাইন পুলিশের জিম্মায় দিয়ে আজগুবী ব্যাপারটা জানিয়ে দেবে, কিন্তু মামাবাবুর কথা ভেবেই সে শান্তি পায় নি। আসবার সময় মামাবাবুকে ওই অভিশপ্ত দ্বীপে যে ফেলে এসেছে সেই অন্যায়টাই তার মনের মধ্যে কাঁটা হয়ে বিঁধে থেকেছে। আজ ভোরে তাই মরিয়া হয়ে সে ইয়ল নিয়ে এসেছে মামাবাবুর খোঁজ পাওয়া যায় কি না একবার শেষ চেষ্টা করে দেখে যাওয়ার জন্যে।

সত্যি কথা বলতে গেলে তার মনে মামাবাবুকে পাবার আশা বিশেষ ছিল না। মামাবাবুর সঙ্গে একটি ফ্লাস্ক জল ছাড়া খাবারদাবার কিছুই যে ছিল না তা ত লাফে ভালো করেই জানত। এ দ্বীপে এতদিন ওই প্রেতমূর্তিদের হাত থেকে রেহাই পেলেও জল আর খাবারের অভাবেই ত মারা যেতে হবে।

মামাবাবুকে তাঁবুর মধ্যে মুমূর্ষ হলেও জীবন্ত অবস্থায় পেয়ে মনের মস্ত বড় একটা গ্লানি তার কেটে গেছে।

লাফে যতক্ষণ ধরে তার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে ততক্ষণে ইয়লটা সামানা-কে ছাড়িয়ে ক্রুকেড দ্বীপের দিকে বেশ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে।

লাফে যেখানে ইয়ল-এর হাল ধরে চালাচ্ছিল মামাবাবু সেইখানেই একটা হেলানো কেদারায় আধশোয়া অবস্থায় লাফের বিবরণ শুনছিলেন। তাঁকে ব্র্যান্ডি মেশান কফি আর কিছু খাবার দিয়ে চাঙ্গা করে তোলার ব্যবস্থা করেছে লাফে।

মামাবাবুর মুখে এতক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও শোনা যায় নি। লাফের কথা শেষ হবার পর ক্লান্ত স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"এখন কোথায় আমরা যাচ্ছি, লাফে?"

"কোথায় আবার,"—মামাবাবুকে আশ্বস্ত করবার জন্যই বলেছে লাফে—"প্রথম ক্রুকেড দ্বীপের অ্যাটউডে যাব, তারপর সেখানে দু'দিন একটু বিশ্রাম করে ন্যাসোতে ফিরে যাব আবার।"

"না, ইয়ল ঘোরাও।"

লাফে প্রথম নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারে নি। মামাবাবুর দিকেই অবাক হয়ে চেয়েছে। তাঁর চিঁ চিঁ আওয়াজের গলা থেকে ওই কথা কি শোনা গেছে!

ব্যাপারটা সত্যিই তাই বোঝবার পর যেন অবোধকে বোঝাবার মত করে লাফে বলেছে—"এখন ইয়ল আবার কোন্ দিকে ঘোরাব? এখান থেকে সোজা ন্যাসো যাবার মত তেলই নেই লঞ্চে।"

"ন্যাসোতে নয়, আবার সামানা-কে-তেই ফিরব।" মামাবাবুর সেই দুর্বল ক্ষীণ স্বর।

pathagar.net

"কোথায়?"—এবার বেশ একটু ভ্রূকুটির সঙ্গে বলেছে লাফে—"আবার ফিরব সেই ভূতুড়ে সামানা-কে-তে?"

"হ্যাঁ।"

"আপনারও মাথা খারাপ হয়েছে দেখছি, মিস্টার রায়!"—এবার হেসে উঠেছে লাফে—"সেখান থেকেই ত আপনাকে উদ্ধার করে আনলাম, আবার সেখানে মরতে যেতে চান? আর এখন এই অবস্থায়?"

"এই অবস্থায় এখন গেলেই যা চাই তা পাব।"

মামাবাবুর কণ্ঠটা ক্ষীণ, কিন্তু কথায় কোনো দ্বিধা সঙ্কোচ নেই।

"কি পাবেন?"—বিরক্তির সঙ্গে বলেছে এবার লাফে—"ওই ভূতুড়ে দ্বীপে আছে কি?"

"ভূত ত আছে?"

মামাবাবুর চিঁ চিঁ করা গলায় এই রসিকতা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছে লাফে! রুক্ষ স্বরে বলেছে—"ভূতের ওপর অত টান ত এলেন কেন আমার সঙ্গে? বললেই পারতেন তখন! তাহলে অত করে নিয়ে আসবার হাঙ্গামাটা পোহাতে হত না, আপনাকে ওখানেই ফেলে আসতাম।"

"কিন্তু তাহলে এ ইয়লটার যে দখল পেতাম না।"

"কি বললেন?"—লাফে সত্যিই চমকে উঠে অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে মামাবাবুর দিকে এবার তাকিয়েছে—"আপনি এ ইয়লটার দখল চান? সেই জন্যেই আমার সঙ্গে এসেছেন? আর মুখের কথা খসিয়েই দখল পেয়ে গেছেন মনে করছেন!"

লাফের শেষ কথাগুলো যেমন গরম তেমনি তাতে বিদ্রূপের ধার। মামাবাবু তা যেন লক্ষই করেন নি, আগের মতই রুগ্ন মিহি অথচ স্পষ্ট গলায় বলেছেন—"দখল না পাবার কি আছে? ইয়লটা ত আমারই, ওটা ত বিক্রী করি নি কাউকে, ইয়লটা সুতরাং ঘোরাও।"

লাফের এবার অন্য মূর্তি! হালের হুইলটা ধরে গলায় আগুন ছুটিয়ে বললে—"বেশী গোলমাল করবেন না। এখানে এই মাঝ সমুদ্রে আপনাকে ফেলে দিলে কেউ জানতেই পারবে না, ক'টা হাঙ্গরের পেটে আপনি গেছেন, চুপ করে সুতরাং শুয়ে থাকুন।"

"কিন্তু শুতে তুমি দিচ্ছ কই!"—মামাবাবু অতি কষ্টে হেলানে চেয়ারটা থেকে মাথাটা তুললেন মনে হল—"সামানা-কে-তে যে এখুনি না ফিরলে নয়, সেইটে বুঝতে পারছ না কেন?"

লাফের চোখ দেখে মনে হল এবার মামাবাবুর মাথা খারাপ হওয়া সম্বন্ধে তার কোনো সন্দেহ নেই। আগেকার সুরটা পালটে অবুঝ পাগলকে শান্ত করবার ধরনে সে এবার গলাটা মোলায়েম করে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি সেখানে ফিরতে চাইছেন কেন? আপনার অনুচর ওই মঙপোর জন্যে ত? তার জন্যে কোনো ভাবনা নেই।"

"ভাবনা নেই মানে।"—মামাবাবু এ কথায় যেন একটু আশ্বস্ত হয়েছেন মনে হল।

"না,"—জোর দিয়ে বলেছে লাফে—"আপনার মঙপো আমার মতই কোনো ভৌতিক ব্যাপারে ভয় পেয়ে বোধ হয় আপনাকে ডাকতেই ইয়লের কাছে ছুটে আসছিল, তখন

আমি নোঙর তুলে ইয়ল ছাড়ছি, তাকে তুলে নিতে পেরেছিলাম। সে এখন ক্রুকেড দ্বীপের স্লাগকর্ণারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

একটু থেমে মামাবাবুর মুখের চেহারায় সন্তোষের লক্ষণ দেখে লাফে আবার বলেছে—"মঙপো আমার সঙ্গে আসবার জন্যে ঝুলাঝুলি করেছিল। সামানা-কে-তে কি বিপদ হতে পারে না জেনে দু'জনেরই এক সঙ্গে সে ঝক্কি নেওয়া উচিত নয় বলে অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়েছি। আমিও যদি না ফিরি তখন সে ছাড়া এ ব্যাপার নিয়ে খোঁজ করবার আর কেউ নেই বুঝেই সে শেষ পর্যন্ত থাকতে রাজী হয়েছে।"

"চমৎকার।"—মামাবাবু হাসি মুখে আগের চেয়ে একটু যেন জোরালো গলায় বলছেন—"তাহলে ত সামানা-কে-তে ফিরে যাবার কোনো বাধাই নেই? নাও, হুইল ঘোরাও।

"তার মানে।"—লাফে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। দাঁত খিঁচিয়ে উঠে বলেছে—"গোলমাল করলে কি হবে আগেই আপনাকে জানিয়ে রেখেছি, মিঃ রায়, সে রকম বিশ্রী কিছু করতে আমায় বাধ্য করবেন না।"

"না, বিশ্রী কিছু তোমায় করতে হবে না।"

মামাবাবুকে হঠাৎ হেলানো কেদারা থেকে উঠে দাঁড়াতে দেখে লাফের মুখের চেহারাটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। একবার মামাবাবু মুখের দিকে আর একবার তাঁর পকেটে ভরা হাতটার দিকে চেয়ে কি যেন বলতে গিয়েও তার গলায় আটকে গেছে তখন। মামাবাবু ডান হাতটা চেয়ারে হেলান দেওয়ার সময়ই পকেটের মধ্যে পোরা ছিল, এবার সেই পকেটে ভরা হাতটা দাঁড়িয়ে ওঠার সঙ্গে তুলে ধরাতেই লাফের হঠাৎ অতখানি পরিবর্তন।

মামাবাবু নিজেই তাঁর পকেটে ভরা হাতটার দিকে চোখের ইঙ্গিত করে এবার বলেছেন—"বিশ্রী কিছু করার ইচ্ছা আমারও নেই। হাত ঢোকান আমার এই পকেটটা যে উঁচু হয়ে রয়েছে দেখছ, এটা হয়ত ভেতরে পিস্তল থাকার দরুণ নয়। হয়ত হাতটা আর আঙুলগুলো আমি এমন করে সাজিয়ে ধরেছি যে পকেটের ওপর থেকে ওটা পিস্তল বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সত্যিই পিস্তল কি না তা পরীক্ষা করতে হলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সে সাহস তোমার নেই, লাফে। আসলে দেখতে যণ্ডা-গুণ্ডা হলেও তুমি নেহাত ভালো মানুষ, একজন ওস্তাদ পাইলট ছাড়া আর কিছু নয়। আমার পকেটে এটা পিস্তল নয় বলে নিশ্চিত জানলেও সত্যি আমার ওপর জোর জুলুম করতে তুমি পারতে না। শুধু মুখের হুমকি দিয়ে তাই কাজ হাসিলের চেষ্টা করছিলে। এ ধরনের কাজে তোমার রুচিই নেই। নেহাত টাকার প্রলোভন জয় করতে পারোনি বলে আমার সঙ্গে এই বেইমানীটা করেছ, বেশ কিছু টাকা তুমি আগেই পেয়েছ, আজ আমায় স্লাগকর্ণারে পৌঁছে দিতে পারলে আরো কিছু পেতে। সেদিক দিয়ে তোমার লোকসান হতে দেব না। যা তোমার পাবার কথা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী বখসীস আমি দেব। এখন ফিরে চল সামানা-কে-তে।"

"কিন্তু, কিন্তু"—লাফে মুখখানা কাঁচুমাচু করে প্রায় তোতলা হয়ে বলেছে—"কিন্তু ওখানে গেলে তারা আমাদের শেষ করে দেবে।"

pathagar.net

"কিছুই করবে না,"—হেসে বলেছেন মামাবাবু—"তা করবার হলে আগেই করত। একটা কথা জেনে রাখ, লাফে, মানুষ ভূত প্রেত যেই হোক, আসলে সত্যিকার শয়তান তাদের মধ্যে খুবই কম। ফোঁস করে যারা কাজ হাসিল করার চেষ্টা করে সত্যিকারের ছোবল তারা দেয় না, দেবার মত বিষদাঁতই তাদের অধিকাংশের নেই।"

"কিন্তু সেখানে যাব কোথায়?" করুণ সুরে জিজ্ঞাসা করেছে লাফে—"আপনি সমস্ত দ্বীপই ঘুরে দেখেছেন, কোথাও ত কেউ নেই। তাদের পাবেন কোথায়?"

"তিন শ' বছর আগে বোম্বেটেরা যেখানে থাকত সেইখানেই পাব।"—নিশ্চিত বিশ্বাসে বলেছেন মামাবাবু।

"তিন শ' বছর আগেকার বোম্বেটে!"—হতভম্ব হয়ে বলেছে লাফে।

"হ্যাঁ, সামানা-কে-তে যারা এখন হানা দিচ্ছে, তারা তিন শ' বছর আগেকার বোম্বেটে তা বুঝতে পার নি।"

মামাবাবুরও গলায় একটু যেন কৌতুকের সুর শোনা গেছে—"তুমি ইয়ল নিয়ে পালিয়ে আসার কৈফিয়ত হিসেবে যে গল্পটা বলেছ তা সবটাই তোমার কল্পনা নয়। তোমাকে ভয় দেখিয়ে আর ঘুষ দিয়ে যারা এ বেইমানী করিয়েছে তাদের তুমি যে পোষাকে দেখেছ তা তিন শ' বছর আগেকার বোম্বেটেদের।"

"তিন শ' বছর ধরে তারা ও দ্বীপে আছে!" লাফের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

"তাই ত মনে হচ্ছে,"—মামাবাবু বলেছেন—"অগুনতি দ্বীপের জটলা এই বাহামা এককালে সমুদ্রের বোম্বেটেদের স্বর্গ ছিল, তা জান নিশ্চয়! নতুন আবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশের মেক্সিকো, পেরু, য়ুকাটান-এর মত আশ্চর্য সব রাজ্য থেকে সোনা-দানায় বোঝাই হয়ে স্পেনের সরকারী সব জাহাজকে এই পথ দিয়েই যেতে হত। এ রাস্তায় সব দিক দিয়ে বিপদ। ঝড়, তুফান, ডুবো পাহাড় কাটিয়ে যারা টিকে যেত তাদেরও অনেককে দুর্দান্ত বোম্বেটেদের কবলে পড়তে হত। এই সব এলোমেলো ভাবে ছড়ান ছোট-বড় দ্বীপের জটলায় বোম্বেটেদের খোঁজই কেউ পেত না। বোম্বেটেরা সব গুপ্ত ঘাঁটিতে কত ঐশ্বর্য যে লুকিয়ে রেখেছে তার লেখাজোখা নেই। মাঝে মাঝে সমুদ্রের তলায় হঠাৎ যা পাওয়া যায় তাতেই দুনিয়ার মানুষের চোখ কপালে ওঠে। যা এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার কত শতগুণ ঐশ্বর্য যে এখনো লুকান আছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই লুকান ঐশ্বর্যের টানে তিন শ' বছর আগেকার বোম্বেটেদের সামানা-কে-তে হানা দেওয়া আশ্চর্য কি!"

"সেই বোম্বেটেদের গোপন ঘাঁটিতে যাবেন বলছেন!"—লাফে বেশ একটু হতভম্ব হয়ে জানিয়েছে—"আমি কিন্তু সত্যিই সেইরকম কোনো ঘাঁটির কথা জানি না। আমাকে আগে ভয় দেখিয়ে আর পরে বেশ ভালো টাকা ঘুষ দিয়ে,সে রাত্রে যখন তারা ইয়ল নিয়ে যেতে বলে তখনি তারা পরে কি করতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল দিন সাতেক ক্রুকেড দ্বীপের স্নাগকর্ণারে কাটিয়ে আমি যেন আবার গোপনে ইয়ল নিয়ে সামানা-কে-তে ফিরে আসি। সাতদিন পরে ফিরে এসে শেষ রাত্রে ওই খাঁড়িতেই ইয়লটা সাবধানে নোঙর ফেলে বাঁধবার পর তারা আমার সঙ্গে ওইখানেই দেখা করে আবার তিন দিন বাদে ইয়ল নিয়ে আসতে বলে। আপনাকে এ দ্বীপ থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কি

করতে আর কী বলতে হবে, তাও তারা শিখিয়ে দেয়। তাদের সঙ্গে তিনবারই আমার একই জায়গায় ওই বালির চড়ায় দেখা হয়েছে। বিশ্বাস করুন আপনাকে সত্যি কথাই বলছি।"

"বিশ্বাস করছি, কিন্তু যা বলছ তা পুরো সত্য নয়।"—মামাবাবু লাফের দিকে চেয়ে হেসেছেন।

বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে লাফে মামাবাবুর অভিযোগটা স্বীকার করেছে। কুণ্ঠিতভাবে বলেছে— "হ্যাঁ, মঙপো আর আপনার ব্যাগটা চুরির কথা বলিনি। ওরা আপনার কাছে খাবার দাবার বা অন্য দামী কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা করে। আমি তাতে সত্য কথাই বলি যে একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ ছাড়া আপনার কাছে কিছু নেই। সে ব্যাগেও যে টাকাকড়ি কি খাবার দাবার নয়, কয়েকটা কাগজপত্র একটা দূরবীন আর ফার্স্ট এড-এর সামান্য সরঞ্জাম ছাড়া কিছু নেই তাও ওদের জানাই। ওদের কিন্তু জেদ—সেই ব্যাগটা চুরি করবেই। আপনার তাঁবুর দরজা কেটে দু'জনে যখন ভেতরে ঢোকে তখন ওদের একজনের সঙ্গে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। মঙপো বোধ হয় আপনার তাঁবুর সামান্য নড়াচড়ার শব্দেই জেগে উঠেছিল। জেগে উঠেও সে নিজের তাঁবু থেকে বার হয়নি। লুকিয়ে থেকে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিল সম্ভবতঃ। ব্যাগ নিয়ে ইয়লের দিকে ফেরবার সময় আমি হঠাৎ একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে তাকে নিজের তাঁবু থেকে আপনারটায় ঢুকতে দেখি, আমার সঙ্গে ওদের একজনও সেটা লক্ষ করে। তার পর ওদের দু'জন গিয়ে আপনার তাঁবুর বাইরে ওত পেতে থাকে। মঙপো সেখান থেকে বার হবামাত্র তার মাথায় চাদর চাপা দিয়ে ওরা তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে। মঙপোকে কোথায় ওরা নিয়ে গেছে জানি না। আপনাকে আজকে উদ্ধার করে আনবার সময় মঙপো সম্বন্ধে যা বলেছি তা ওদেরই আগে থাকতে শেখান। মঙপোর জন্যে সত্যি আমার ভাবনা হয়।"

"ভাবনার খুব বেশী কিছু আছে বলে মনে হয় না।"—মামাবাবু লাফে-কে অবাক করে দিয়ে বলেছেন—"আমি যখন বেঁচে আছি তখন মঙপোকেও বহাল তবিয়তেই পাব বলে মনে হয়।"

"কোথায়?"—অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞাসা করেছে লাফে।

"ওই বোম্বেটেদের গুপ্ত ঘাঁটিতেই।"

"বারবার গুপ্ত ঘাঁটির কথা বলছেন!"—লাফে একটু অধৈর্যের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করেছে—"সে ঘাঁটি আমি ত জানি না বললাম। আপনি দেখেছেন সে ঘাঁটি?"

"দেখিনি, তবে অনুমান করতে পারি। সে অনুমান ঠিক কি না জানতে খুব বেশী অপেক্ষা করতে হবে না।"

"অনুমান ঠিক হলে গুপ্ত ঘাঁটিতে কাদের পাবেন? সেই তিন শ' বছর আগেকার বোম্বেটেদের?"

"অন্ততঃ পোষাক ত পাব তিন শ' বছর আগেকার!"—হেসে বলেছেন মামাবাবু।

"শুধু পোষাক!"—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে লাফে।

"না। শুধু পোষাক কেন, যারা সে পোষাক পরে তাদেরও,"—বলে কৌতুকের দৃষ্টিতে লাফের দিকে চেয়ে মামাবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"আচ্ছা, তিন শ' বছর আগেকার

BanglaBook.org

পোষাকে ভূত পেত্নীরা ত তোমার সঙ্গে কথা বলেছে। তাদের ভাষা তুমি বুঝলে কি করে? তাদের ভাষা ত ছিল স্প্যানিশ। স্প্যানিশ তুমি জান বুঝি।"

"স্প্যানিশ জানব কেন?"—লাফে মামাবাবুর ভুল শুধরে বলেছে—"আমি যা জানি সেই ইংরেজীই তারা বলেছে!"

"ইংরেজী বলেছে?"—মামাবাবু যেন অবাক—"কিন্তু কি রকম ইংরেজী? তোমরা যেমন বল, আমি যেমন বলি, না ফ্লোরিডার মিয়ামি থেকে যারা হামেশা বেড়াতে আসে তারা যেমন বলে তেমনি।"

একটু ভেবে নিয়ে লাফে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলেছে—"ঠিকই ত, ওদের কথার টান ত ওই যারা মিয়ামি থেকে বেড়াতে আসে তাদেরই মত? কিন্তু ওরা তাহলে কে?"

"কেওকেটা না হলেও একেবারে আজেবাজে লোকও বোধ হয় নয়।"—হেসে বলেছেন—"ছবি দেখলে তোমাদের ন্যাসো শহরেও কেউ কেউ হয়ত ওদের চিনতেও পারবে।"

"বলেন কি!"—বিস্ময়টা প্রকাশ করার সঙ্গেই লাফের মুখে কিরকম হতভম্ব ভাব ফুটে উঠেছে।

ইয়ল ফিরিয়ে আনবার পর দূরে তখন সামানা-কে-র তটরেখা দেখা যাচ্ছে আর মামাবাবু হঠাৎ ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে লাফের হাত থেকে স্টীয়ারিং হুইল প্রায় কেড়ে নিয়ে ঘোরাচ্ছেন।

দূরের তটরেখা নয়, মামাবাবুর এই পরিবর্তন দেখেই খানিক থ' হয়ে চুপ করে থেকে লাফে শেষ পর্যন্ত না বলে পারেনি—"আপনি ত খানিক আগে ধুঁকছিলেন, মিঃ রায়।"

"তা দশ দিন একরকম উপোসী হয়ে কাটালে ধুঁকতে হয় বই কি!"—মামাবাবু মুখ টিপে হেসে বলেছেন।

"তা হলে এখন?"—হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে লাফে।

"এখন আর ধোঁকবার দরকার নেই।"

"তার মানে আপনি ভান করছিলেন। কিন্তু সত্যিই ত দশদিন খাবার আপনার জোটেনি বললেই হয়।"

"পেটভরা খাবার জোটেনি বটে"—মামাবাবু রহস্যের ছোঁয়া দিয়ে বলেছেন—"কিন্তু যা জুটেছে তাতেও নেহাত আলসে পেটসর্বস্ব না হলে একেবারে শয্যাশায়ী হতে হয় না। উপবাস সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণাই ভুল।"

"তা হলে অমন ধোঁকবার ভান করেছিলেন কেন?"

"করেছিলাম আমার ধারণাটা ঠিক কি না যাচাই করবার জন্যে। কয়েক দিন ওদের কাণ্ডকারখানা লক্ষ করে আর তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল, ওরা ভয় দেখিয়ে ও দ্বীপ থেকে আমাদের তাড়াতে চায়। তাই না খেতে পেয়ে মরমর হবার আর ভূত দেখে ভয় পাবার ভান করে আমার ধারণাই ঠিক বলে জানতে পারি।"

"আপনার ধারণাই ঠিক বলে মানলাম। কিন্তু ও দ্বীপ থেকে আপনাকে ওরা তাড়াতে চায় কেন?"—লাফের সংশয়টা তখনো যায়নি।

"তাড়াতে চায়, এ দ্বীপে যে উদ্দেশ্যে তারা এসে লুকিয়ে আছে নির্ঝঞ্ঝাটে তার কাজ চালাবার জন্যে। এই দ্বীপের মধ্যে বা কাছাকাছি কোথাও তিন শ' বছর আগেকার বোম্বেটেদের গুপ্তধনের কোনো হদিস বোধ হয় ওরা পেয়েছে। অন্য কাউকে জানতে না দিয়ে তার সন্ধান চালাবার জন্যেই এ দ্বীপে যে আসে তাকেই তাড়াবার অত তোড়জোড়।"

মামাবাবুর অনুমান যে কতখানি নির্ভুল তার প্রমাণ সেই দিনই পাওয়া গেছে। দ্বীপবিন্দুটির যে দিকে খাড়া পাহাড় সমুদ্র থেকে উঠে গেছে সেই দিকে সমুদ্রের ওপরেই একটা প্রায় লুকান গুহা মুখ মামাবাবুরা খুঁজে পেয়েছেন। সে গুহা মুখ দিয়ে ভেতরে ঢোকবার পর দেখা গেছে, সে গুহা ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পাহাড়ের ভেতরে প্রকৃতির খেয়ালে একটা বিরাট গম্বুজওয়ালা হলঘরই যেন তৈরী হয়ে আছে। সমুদ্র থেকে জলপথেই সেখানে ভেতরে গিয়ে ওঠা যায়। থাকবার জায়গাও সেখানে যথেষ্ট। দ্বীপের ওপর থেকে বা সমুদ্রের দিক দিয়ে এই বিরাট গুপ্ত গুহার কোনো হদিসই পাওয়া যায় না। এককালে এ অঞ্চলের বোম্বেটেদের এটা একটা বড় ঘাঁটি ছিল সন্দেহ নেই।

এই গোপন ঘাটিটি আবিষ্কার করে যারা এখন তা দখল করে আছে তাদের পরিচয় ও বিবরণ একটু বিচিত্র।

মামাবাবু ঠিক ধরেছিলেন যে তারা সত্যিকারের দুর্জন পাষণ্ড নয়। দ্বীপটিতে অন্য কাউকে থাকতে না দেবার জন্যই ওই সব ভৌতিক ব্যাপার সাজিয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা তারা করেছে।

ভৌতিক ব্যাপার অমন নাটকীয় করে তোলার মধ্যে অবশ্য তাদের পরিচয় কিছুটা ধরা পড়ে গেছে।

ডঃ সার্প যখন কিলোনিয়া মাইডাসের রহস্য জানতে এই দ্বীপে আসেন তার বছর কয়েক আগে বোম্বেটেদের নিয়ে একটি সিনেমার ছবি তুলতে হলিউডের একটি দল এই দ্বীপে এসে কিছু দিন ছিল। সেই সময়ে সেই ছবির প্রধান নায়িকা, ও তার অনুগামী একজন তরুণ অভিনেতা, ও ছবির পরিচালক এখানকার গুপ্তধনের কিছু হদিস পেয়ে পরে নিজেরা একটি ছোট দল গড়ে এ দ্বীপে আবার ফিরে আসে। ডঃ সার্পকে এ দ্বীপে দেখে তারা তাঁকে তাড়াবার জন্যে ওই বোম্বেটে ভূত দেখাবার ব্যবস্থা করে। জলদস্যুদের সিনেমা ছবির পোশাকগুলো কাছে থাকার দরুনই এ ফন্দিটা তাদের মাথায় এসেছিল। ডঃ সার্প মামাবাবুর মতই এদের চালাকী কিন্তু ধরে ফেলেন। ধরে ফেলার পর তাঁরও গুপ্তধন আবিষ্কারের নেশা ধরে যায়। তিনি সেই থেকেই ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে গুপ্ত ঘাঁটিতেই ছিলেন। ন্যাসো-র পুলিশ সেই জন্যেই তাঁর খোঁজ পায়নি।

মামাবাবু ও লাফে গুপ্ত গুহায় গিয়ে চড়াও হবার পর সব রহস্যই ফাঁস হয়ে যায়। ডঃ সার্প ও মঙপো দু'জনকেই সেখানে পাওয়া যায়। তাদের যথাযোগ্য সমাদরেই সেখানে রাখা হয়েছে। সিনেমা ছবির ভূতপূর্ব নায়িকা গ্রেস বলে মেয়েটি ও তার দুই বন্ধু, অভিনেতা ও পরিচালক, মামাবাবুর কাছে অনেক করে নিজেদের ব্যবহারের জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চান। মামাবাবু তাদের ক্ষমা ত করেনই, ডঃ সার্পের সঙ্গে যোগ দিয়ে গুপ্তধন সন্ধানেও তাদের সাহায্য করেন। তাঁরই বুদ্ধিতে দ্বীপের মধ্যে লুকোন গুপ্তধন খোঁজার সঙ্গে

কাছাকাছি সমুদ্রের তলাতেও সন্ধান চালাবার ব্যবস্থা হয়। সেই ব্যবস্থাতেই একদিন হঠাৎ এক জায়গায় সমুদ্রের তলায় একটা মরচে ধরা সেকেলে নোঙর দেখা যায়। দ্বীপের চারিধারে কিছুদূর পর্যন্ত সমুদ্র এখানে বেশী গভীর নয়। গ্রেসের দলে ডুবুরী একজন ছিল, তার সঙ্গে মঙপোও ডুব সাঁতার দিয়ে সমুদ্রের তলায় পৌঁতা সেই নোঙরের এদিক ওদিক থেকে রাজার ঐশ্বর্য না হোক, বেশ কিছু পুরোন তখনকার স্পেনের মুদ্রা উদ্ধার করে আনে। সেখান থেকে যা পাওয়া গিয়েছিল, গ্রেস ও তার সঙ্গীরা মামাবাবু ও ডঃ সার্পকে তার ভাগ দিতে চেয়েছিল। তাঁরা তা নেন নি। এই দ্বীপের অভিজ্ঞতার নিদর্শন রূপে মঙপো শুধু তারই তুলে আনা একটি প্রাচীন মুদ্রা চেয়ে নিয়ে তা দিয়ে তাবীজ বানিয়ে রেখেছে।

এ কাহিনী লেখার পর মামাবাবুকে পড়িয়েছি। তিনি ত পড়ে আমায় প্রায় মারতে তাড়া করেছেন। তাঁর চোখে কৌতুকের ঝিলিকটুকু না দেখলে সত্যি তিনি ক্ষেপে গেছেন মনে করতাম।

মুখে অবশ্য তিনি কড়া বকুনি দিয়েছেন—"এটা কি হয়েছে হতভাগা! মনগড়া যা খুশী জুড়ে দিয়ে একটা আজগুবী গল্প বানিয়েছিস, সিনেমার ওই মেয়েটাকে কোথায় পেলি? ওটাকে ত প্রায় মামী বানিয়ে তুলেছিলি!"

বানাতে পারলে মন্দ হত না মনে মনে ভেবেছি।

pathagar.net

৭

পাহাড়ের নাম করালী

এক

পাটা একটু হড়কাতেই পাশের গাছের একটা ডাল ধরে ফেলেছিলাম।

কিন্তু সেটা অমন পলকা ভাবতে পারিনি। ধরার পর টান পড়া মাত্র মট করে ভেঙে গেল।

প্রায় খাড়া ঢাল দিয়ে তখন সোজা নীচের দিকে গড়িয়ে যেতে শুরু করেছি। দিশাহারা হয়ে হাতের সামনে যা পেলাম তাই ধরলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা একটা মোটা জংলা লতা।

লতা ছিঁড়ল না। কিন্তু রুখতেও পারল না আমার পতন। আমারই দেহের ভারে আলগা দড়ির মত পাহাড়ের গা থেকে খুলে আসতে লাগল।

তখন আর চোখ মেলে নীচে চেয়ে দেখবার দরকার নেই। পাহাড়ের এই দিকের খাড়াই কোথায় গিয়ে যে শেষ হয়েছে তা আমার ভালো করেই জানা। ওপরের পীক ভিউ থেকে সাবধানে ঝুঁকে বহুবার নীচের প্রায় অতল খাদের দৃশ্য দেখেছি। দেখতে গিয়ে গা-টা শিউরে উঠেছে প্রতিবারই। এটা লুকোবার জন্যে ঠাট্টার ছলে বলেছি—"হ্যাঁ, ডুব-ঝাঁপ দেবার একটা জুৎসই জায়গা বটে, সোজা একেবারে সাড়ে তিন হাজার ফুট!"

সেই সোজা সাড়ে তিন হাজার ফুট ডুব-ঝাঁপ আচমকা একদিন আমাকেই দিতে হবে তখন কি কল্পনা করতে পেরেছিলাম!

পারলে ওই পীক ভিউ-এর ধারে কাছে নিশ্চয় যেতাম না, অন্ততঃ এমন ঝড়বাদলের দিনে কখনো নয়।

মনে মনে ইষ্ট নাম জপ না করলেও মনশ্চক্ষে নিজের পরিণামটা তখন আমি ভালো করে দেখতে পেয়েছি। মুঠোয় ধরা জংলা লতাটা খাড়াইয়ের গা থেকে চড় চড় করে খুলে আসছে। সেটা যে কোথাও আটকাবে এমন কোনো আশাই আর দেখছি না।

আর যদি কোথাও আটকেও যায়, তাতেই বা কি লাভ হবে?

পাহাড়ের গা বেয়ে আমার গড়িয়ে পড়ার গতিবেগ ক্রমশই বাড়ছে। প্রাণপণে ধরে থাকবার চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হাতের মুঠোও ক্রমশ অবশ আর শিথিল হয়ে আসছে উদ্বেগে আতঙ্কে। জংলা লতার পাহাড়ের গা থেকে এই খুলে পড়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে দুর্বল অসাড় আমার হাতের মুঠি সে প্রচণ্ড ঝাঁকানি কোনো রকমেই সামলাতে পারবে না।

pathagar.net

যে রকমভাবে লিখলাম পীক ভিউ থেকে সাড়ে তিন হাজার ফুট নীচে অনিবার্য গতিতে গড়িয়ে পড়তে পড়তে এরকম সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে ভাবনা চিন্তাগুলো অবশ্য আসেনি। কথাগুলো ওই পর্যন্ত লিখতে যতক্ষণ লেগেছে তার অনেক আগেই হাজার দেড়েক ফুট নেমে যাওয়ার মধ্যে মাথার ভেতর সব জট পাকিয়ে গিয়ে চরম আতঙ্কের একটা নিরুপায় হতাশা মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। শেষ যা পরিণাম তার আর দেরী নেই, শুধু এইটুকু হুঁশই তখন আছে।

এ বিবরণটুকু যখন দিতে পারছি তখন পীক ভিউ থেকে সেদিনকার পতন চরম অপঘাতে যে শেষ হয়নি এটুকু না বললেও বোধহয় চলবে।

পরিণামটা কি হয়েছিল তা জানাবার আগে কেমন করে এমন একটা অপ্রত্যাশিত নিদারুণ দুর্ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়লাম, সেইটেই বোধহয় বোঝানো দরকার। তা বোঝাতে গেলে এ কাহিনীর আদি পর্বেই পিছিয়ে যেতে হয়।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও নাকি ধান ভানে।

প্রবাদটা যে কতখানি সত্য তা এ কয়দিনে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি।

কত আশা নিয়েই না এ জায়গাটায় এসেছিলাম। কলকাতায় কিছুদিন ধরে সব কিছু যেন জোলো লাগছিল। জোলো লাগবার আর অপরাধ কি? কয়েক বছর বাদে এইবারই কলকাতার সত্যিকার কড়া গোছের শীত পড়েছিল। দশ সেন্টিগ্রেড থেকে নয়, আট, এমন কি সাতও ছুঁই ছুঁই করেছে ব্যারোমিটারের পারা। আর দু-চারদিন এমন চললে সাত সেন্টিগ্রেডের রেকর্ডও যে ভাঙবে না তা কে বলতে পারে!

এমন মজাদার শীতের মরশুম অথচ এইবারই কলকাতায় একটা পয়লা নম্বর ক্রিকেট ম্যাচের ব্যবস্থা নেই। এম. সি. সি আসবে আসবে করে শেষ পর্যন্ত ফরেন এক্সচেঞ্জের সমস্যার জেরে আসতে পারছে না, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে কথাবার্তা খানিক দুর এগিয়ে কেন যে থমকে আছে, তা কর্তারাই জানেন। এদিকে আমাদের বিস্বাদ দিনগুলো কাটাতে টাকনা দেবার মতও কিছু জুটছে না।

দেশে সমস্যার নাকি অন্ত নেই। কিন্তু রাস্তায় ঘাটে বড়দিনের উৎসবের লোভে উপচে-পড়া ভীড়ে চলফেরা দায়। এই অবস্থায় অত্যন্ত মনমরা হয়ে যখন দিন কাটছে তখন মেঘ না চাইতে জলের মত আশাতীতভাবে একটা সুযোগ মিলে গেছে।

সেদিন আর কিছু না পেয়ে দুটো অখদ্দে লোক্যাল টীমের এলেবেলে ম্যাচ দেখে বিরক্ত হয়ে মামাবাবুর বাড়িতে গেছলাম, পৃথিবীর অদ্বিতীয় পাচক মহাভারতখ্যাত বিরাটরাজার রন্ধনশালার ইন-চার্জ স্বয়ং ভীমসেনেরই মন্ত্রশিষ্য বলে যাকে মনে হয়, সেই মঙপোর হাতের তৈরী কোনো অমৃতভোজ্য চা সহযোগে খেয়ে মনটাকে একটু চাঙ্গা করব বলে।

আমার মামাবাবু আর তাঁর পেয়ারের অনুচর মঙপোর কথা অনেকেই বোধহয় অল্পবিস্তর জানেন। প্রায় অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী মঙপোকে নিয়ে মামাবাবুর বিচিত্র বিস্ময়কর সব অভিযানের কয়েকটিতে আমার নিজেরও অংশ নেবার সৌভাগ্য হয়েছে। 'কুহকের দেশে', 'ড্রাগনের নিঃশ্বাস', 'মামাবাবু ফিরেছেন' ইত্যাদি লেখায় সেগুলির সাধ্যমত বিবরণ দেবার চেষ্টা আমি করছি।

pathagar.net

মামাবাবুর শেষ কাজের জায়গা ছিল বর্মার উত্তরে মিচিনা শহর। সেখান থেকে কাজে ইস্তফা দেবার পর বেশ কিছুদিন হল কলকাতার অপেক্ষাকৃত একটি নির্জন পাড়ায় তাঁর নিজের খেয়ালী চরিত্রের মত সৃষ্টিছাড়া একটি বাড়ী বানিয়ে তিনি সেখানে আছেন।

নামে বাড়ী হলেও আসলে সেটি মিউজিয়ম, লাইব্রেরী আর ল্যাবরেটরীর একটি সন্নিপাত। একতলা, দোতলার বই-কাগজ, নুড়ি-পাথর, কীট-পতঙ্গ, বিরল জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি যাদুঘরের সংগ্রহে আর গবেষণাগারের সাজ সরঞ্জামে মামাবাবুর নিজেরই থাকবার জায়গা যেন জোটে না। তিনি নিজে দোতলার ল্যাবরেটরীর পাশে একটি ছোট কামরায় রাত্রে শোন আর মঙপো থাকে ল্যাবরেটরীর অন্য পাশের একটি কুঠুরীতে।

অন্য কিছু করি না করি এ বাড়িতে প্রায় নিত্য হাজিরা না দিলে যেন ঘুমই আসে না রাত্রে। আকর্ষণটা মামাবাবুর সঙ্গসুখের শুধু নয়, মঙপোর পাচক হিসাবে নানা কেরামতীও যে বটে তা অস্বীকার করতে পারব না। মামাবাবু ত পেটুক দূরে থাক ভোজনবিলাসী যাকে বলে তাও নন। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি যাঁর অত টনটনে তাঁর রসনা প্রায় যেন অসাড়। রান্নার তারতম্য বোঝবার কোনো ধার তিনি ধারেন না। শিককাবাব আর সামিকাবাবের তফাত নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। ক্ষিদের সময়ে নেহাত বিস্বাদ কিছু না হলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।

মঙপোর মত রান্নার কালোয়াতের সেইটেই একমাত্র দুঃখ। সে দুঃখ কিছুটা সে আমার জন্যে এটা সেটা তৈরী করে ভোলবার চেষ্টা করে।

মামাবাবুর বাড়ীতে গেলে নতুন কিছু চাখার ব্যাপারে সাধারণত হতাশ হতে হয় না। সেদিনও তা হয় নি। চায়ের সঙ্গে সঙ্গত রাখতে অনবদ্য 'ওয়েলস রেয়ারবিট' খাইয়ে প্রাণ তর করে দিয়েছে মঙপো।

বদমেজাজ কেটে গিয়ে দিনটা সার্থক মনে হয়েছে শুধু 'রেয়ারবিট'-এর স্বাদের গুণেই নয়, আরো একটি কারণে।

সে কারণ হল শ্রীলোকনাথ মহান্তীর সঙ্গে দেখা, আলাপ আর তাঁর নিমন্ত্রণ।

শ্রীমহান্তী বয়সে মামাবাবুর চেয়ে অনেক ছোট। মামাবাবু যখন মিচিনা থেকে তখনকার জিওলজিক্যাল সারভের কাজ ছেড়ে আসেন, তার মাত্র কিছুকাল আগে মহান্তী সেই বিভাগেই কাজ পেয়ে মিচিনায় গেছলেন। মাত্র বছরখানেক একসঙ্গে কাজ করেছেন, কিন্তু তাইতেই বয়সের তফাত সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে একটা সত্যিকার প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল।

মামাবাবু মিচিনা ছেড়ে আসার পর গঙ্গা আর মহানদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বর্মা আলাদা হয়েছে, দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে। শ্রীমহান্তীও অনেক আগে বর্মা ও সেই সঙ্গে সরকারী কাজ ছেড়ে দেশে এসে স্বাধীনভাবে নিজের কাজ শুরু করেছেন। এদেশের খনিজ সম্পদের সন্ধান ও তার নিষ্কাশন নিয়োগের ব্যবস্থা নিয়েই তাঁর কাজ।

বর্মা থেকে ফেরার পর সাক্ষাৎভাবে সব সময়ে না পারলেও মহান্তী চিঠিপত্রে মামাবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এসেছেন। সম্প্রতি তিনি যে খনিজ সম্পদের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অজানা একটি অঞ্চলে কাজ করছেন, তা আগেই মামাবাবুর কাছ থেকে তাঁর

চিঠিপত্র থেকে জেনেছিলাম। সে সব চিঠিতে তিনি বার কয়েক তাঁর নতুন কাজের জায়গায় মামাবাবুকে একবার ঘুরে আসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

এবার সে নিমন্ত্রণ জানাতে তিনি নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছেন।

মহান্তীর কাছে তাঁর নতুন কাজের জায়গার বিবরণ শুনে আমি ত তখনি নেচে উঠেছি যাবার জন্যে। মামাবাবুকেও দুবার সাধতে হয়নি।

পরের দিন বিকেলেই চেষ্টা-চরিত্র করে বার্থ যোগাড় করে মহান্তীর সঙ্গে আমরা মামা-ভাগনে কল্পনার অরণ্য-স্বর্গে ক'টা স্বপ্নের দিন কাটাবার লোভে রওনা হয়েছি।

জায়গাটা কোথায় সঠিক জানাবার এখনো বাধা আছে। ধরে নেওয়া যাক অঞ্চলটার নাম লোধমা। ঘণ্টা চোদ্দ বড় লাইনের ট্রেন যাত্রার পর একটা মিটার গেজের লাইনে টিকি টিকি ঘণ্টা চারেক কাটিয়ে বাঙ্গুরকেলা বা গগনপোষ স্টেশনে নেমে মহান্তীর প্রসপেক্টিং কোম্পানী কি বনবিভাগের জীপে চড়ে গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছোট-বড় যেন সব পাহাড়ের ঢেউ, কোথাও ডিঙিয়ে, কোথাও ফুঁড়ে সেখানে পৌঁছতে হয়।

যাওয়ার ধকল আছে যথেষ্ট। কিন্তু গিয়ে একবার পৌঁছবার পর চারিদিকে চেয়ে চেয়ে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয়, এখানে স্বপ্নের মত বনবাসের কোনো আশাই অপূর্ণ থাকবে না। সাধ যা ছিল তা এমন কিছু আজগুবিও নয়। কলকাতারর সেই শহুরে আড়ষ্ট জীবন ক'দিনের জন্যে একেবারে ভুলে থাকব। আশ মিটিয়ে খুশীমত ঘুরে বেড়াব এখানকার পাহাড়ে জঙ্গলে। মন চাইলে একটু আধটু হরিণ, খরগোশ, বনমোরগ, তিতির ইত্যাদি শিকার করব, মাছ ধরব এখানকার অজানা সব পাহাড়ী হ্রদে, সেই সঙ্গে এখানকার সব দূর-দূরান্তরে লুকোন অজানা পার্বত্য উপত্যকার যুগ যুগ ধরে প্রায় বিচ্ছিন্নভাবে যারা কাটিয়ে এসেছে সেই সব অধিবাসীদের অদ্ভুত বিচিত্র জীবনযাত্রার রীতিনীতি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেব—এই ছিল পরিকল্পনা।

সে কল্পনা ব্যর্থ হবার কোনো কারণও ছিল না। লোকনাথ মাইনিং সিণ্ডিকেটের কর্তা হিসাবে যতদূর দৃষ্টি যায় এই আদিম কানন-গিরিরাজ্যের ওপর মহান্তীর প্রায় অবাধ অধিকার। এই পাহাড়ে জঙ্গলের দেশে এতদিন সভ্য শিক্ষিত জগতের মানুষের পায়ের ধুলো পড়েনি বললেই হয়। বহুকাল আগে ব্রিটিশ আমলে হেলায় ফেলায় ভাসাভাসা একটু জরীপ এ অঞ্চলের হয়েছিল। তারপর কখনো সখনো এক-আধজন ইংরেজ রাজপুরুষ নেহাত খেয়াল বশে এ দিকে শিকার-টিকার করতে এসেছেন। সৌখীন শিকারী হয়ে এলেও সে কালের ইংরেজ রাজপুরুষদের চোখকান খোলা থাকত। তাদেরই একজন এ অঞ্চলের আদিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা নিজের দেশের কাগজে আর এখানকার সরকারী গেজেটিয়ারে প্রকাশ করেছেন, আর একজন এ অঞ্চলের পাহাড়ী মাটি লোহামেশানো বলে আগেকার সরকারী জরীপের অস্পষ্ট বিবরণে সায় দিয়েছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর এ অঞ্চলের খনিজ সম্পদ সন্ধানের উৎসাহ প্রবল হয়েছে। এখানকার পাহাড়ে মাটিতে লোহা যে আছে এ বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নেই। শুধু তার পরিমাণ কোথায় কত আর তা থেকে ইস্পাত তৈরীর মজুরী কি রকম পোষায় তাই নতুন করে সমস্ত অঞ্চল জরীপ করে জানতে শ্রীলোকনাথ মহান্তীর কোম্পানী এখানে ঘাঁটি পেতেছে।

pathagar.net

মহান্তীর লোকনাথ মাইনিং সিণ্ডিকেট এখানে পুরোপুরি একেশ্বর হয়ত নয়, কিন্তু আর যে দু-চারটে ছোটখাট দল অন্য খুচরো ফরমাস নিয়ে আছে তারা কাগজে কলমে না হলেও আসলে লোকনাথ মাইনিং সিণ্ডিকেটের তাঁবেদার হয়ে তার ছত্রছায়ায় কাজ করে।

অঞ্চলটার নাম লোধমা বলেছি। তারই একটা ঈষৎ নেড়া গোছের ডুংরি-র সবচেয়ে সমতল জায়গায় একটা বারোমেসে পাহাড়ী ঝরণার কাছে মহান্তীর কোম্পানীর ছাউনি। কাঠ আর ক্যাম্বিসে তৈরী হলেও সেসব তাঁবুঘরে সুবিধার কোনো অভাব নেই বললেই হয়। মামাবাবুর সঙ্গে আমার আর মণ্ডপোর জন্যে আলাদা দুটি লাগাও তাঁবুর ব্যবস্থা মহান্তী করে দিয়েছেন। মহান্তীর নিজের তাঁবু আমাদের কাছেই। সেটা শুধু তাঁর শোবার ঘর নয়, অফিসও তিনি সেখান থেকে চালান।

প্রথম দিন লোধমার ছাউনিতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছল। সেদিন চারপাশের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু ঘুরে দেখবার সময় সেদিন আর ছিল না বলে আফসোস হয়েছে।

পরের দিন ভোর না হতেই সে আফসোস মেটাতে বেরিয়ে পড়েছি পাখী মারা বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে।

মামাবাবু তখনো যে তাঁর ক্যাম্পখাটে কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকাচ্ছেন, তা বলাই বাহুল্য। তাঁবু থেকে বেরিয়ে ছাউনির অন্য কাউকেও দেখিনি। শুধু মণ্ডপো যে আমার আগে উঠেছে, বেরুবার মুখেই গরম চায়ের কাপ নিয়ে তাকে ঢুকতে দেখে তার প্রমাণ পেয়েছি।

অজানা জায়গা। কিন্তু পথ চেনাবার জন্যে সঙ্গে কাউকে নেওয়ার দরকার আছে বলে মনে হয়নি। পথ ভুল করলেও ছাউনির ন্যাড়া পাহাড়টা চিনে আসতে পারব বলেই বিশ্বাস হয়েছে।

সন্ধ্যায় চারধারের যে দৃশ্য দেখেছিলাম ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় তা আরো মুগ্ধ বিস্মিত করেছে। যে দিকেই চাই, শুধু নিবিড় অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ের পর পাহাড়। ভাবতে ইচ্ছা করছে আদি শৈশবের পর পৃথিবীর তরঙ্গভঙ্গ যেন কোনো রোমাঞ্চিত শিহরনে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। পাহাড়ের পর পাহাড় যেন সেই জমে-যাওয়া সব ঢেউয়ে আর নিবিড় অরণ্য-আবরণে সেই রোমাঞ্চের প্রকাশ।

কাঁধে বন্দুক থাকলেও পাখী মারবার চেষ্টা করিনি। মনের আনন্দে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পাহাড় থেকে নেমে অরণ্যের পথে কিন্তু অনেক দূর চলে গেছলাম।

বেলা বেশ হয়েছে বুঝে ফিরতে গিয়ে একটু মুস্কিলে পড়েছি। বনের ভেতরে কোনো নির্দিষ্ট পথ ধরে ত আসিনি। খেয়াল খুশীমত চলে এসে যেখানে তখন পৌঁছেছি সেখান থেকে আমাদের ছাউনির ন্যাড়া পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে না।

পাহাড়টা দেখবার জন্যে একটা উঁচু জায়গায় ওঠা দরকার। কিছু দূরেই আরেকটা পাহাড় দেখে তার ওপর উঠব বলে এগিয়ে গেছি। সে পাহাড়ে খানিকটা ওঠবার পর হঠাৎ চমকে থেমে যেতে হয়েছে।

নীচে থেকে কে যেন চীৎকার করে কি বলছে।

ফিরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম একজন আদিবাসীকে দেখেছি। সে খুব উত্তেজিতভাবে হাত পা নেড়ে কি যেন আমায় উচ্চৈঃস্বরে বোঝাবার চেষ্টা করছে।

pathagar.net

তার ভাষা কিছুই বুঝতে না পারলেও ওপর থেকে নেমে এসেছি তার কাছে। কাছে এসেও তার কথা অবশ্য বুঝতে পারিনি। কিন্তু তার আকারে ইঙ্গিতে এইটুকু বোঝা গেছে যে আমায় পাহাড়ে উঠতে সে প্রবলভাবে মানা করছে।

কিন্তু কেন?

ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে মিঃ নাগাপ্পা না এসে পড়লে তা জানতে পারতাম না। মিঃ নাগাপ্পা এখানে অন্য একটি দলের নেতা হিসাবে এসেছেন। গতকাল রাত্রে খাবার সময় মহান্তী এই নাগাপ্পা ও আরো কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

মিঃ নাগাপ্পার কাছেই জেনেছি আদিবাসীদের কাছে এটা অতি পবিত্র পাহাড়। বিশেষ পরবের দিনে ছাড়া এ পাহাড়ে ওঠা নিষিদ্ধ। উঠলে সর্বনাশ নাকি অনিবার্য।

আদিবাসী পাহাড়টা সম্বন্ধে যে শব্দটা উচ্চারণ করেছে তা আমার কানে কতকটা 'এঞ্জা' গোছের শুনিয়েছে। শব্দটা যাই হোক বাংলায় তার মানেটা 'করালী' বললে কিছুটা বোঝানো যায়। আদিবাসীদের এই পবিত্র পাহাড়ের নাম হল করালী।

মিঃ নাগাপ্পা সঙ্গে থাকায় নিজেদের আস্তানা খুঁজে ফিরতে তারপর আর কোনো অসুবিধা হয়নি। বেশ অমায়িক মিশুক লোক। এক সঙ্গে আসতে আসতে এ অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁর নানা অভিজ্ঞতার গল্প বলেছেন। তাঁর নিজেরও শিকার ও মাছ ধরার সখ আছে। এ পাহাড়-জঙ্গলের দেশে কোথায় কি শিকারের সুবিধে সে বিষয়ে বেশ কিছু খোঁজ খবর ইতিমধ্যে নিয়েছেন। এসব সখের ব্যাপারে আমায় সঙ্গী পেলে খুশী হবেন জানিয়েছেন বারবার।

মিঃ নাগাপ্পা মহীশূরের লোক। একটা বড় বিদেশী কোম্পানীর হয়ে তিনিও এ অঞ্চলে প্রাথমিক এক ধরনের জরীপের কাজ করতে এসেছেন। তবে তাঁর সন্ধান লোহাটোহা নয়। এদিকে লোহার খনির কাজ শুরু হলে যে প্রচুর জলের দরকার হবে তা কোথা থেকে কিভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব তারই খোঁজ নিতে তাঁর কোম্পানী তাঁকে পাঠিয়েছে।

নাগাপ্পার সঙ্গে দলবল নেই বললেই হয়। জন তিনেক মাত্র সহকারী নিয়ে ন্যাড়া পাহাড়ের বসতিতেই একটি মাঝারি তাঁবুতে থাকেন।

এখানে আসার পর মহান্তীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা একটু বেশী হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া তাঁর মহান্তীর তাঁবুতেই হয়। সেই জন্যেই কাল রাত্রে এখানকার অন্য অনেকের আগে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ আমাদের হয়েছিল।

নাগাপ্পার সঙ্গে আস্তানায় ফিরতে সেদিন বেশ একটু বেলাই হয়ে গেছল। আমাদের ন্যাড়া ডুংরিতে আমায় উঠিয়ে দিয়ে নাগাপ্পা নিজের কাজে চলে গিয়েছিলেন। বাকী পথটুকু যেতে যেতে সকালের ভ্রমণ কাহিনী শুনিয়ে মামাবাবুকে তাঁর কুড়েমির জন্যে কিভাবে লজ্জা দেব তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু তাঁবুতে গিয়ে দেখি বেশ হুলস্থূল ব্যাপার। আর তার মূল হলাম আমি।

আমাকে তাঁবুতে না পেয়ে আর এতক্ষণ পর্যন্ত ফিরতে না দেখে সবাই একেবারে অস্থির। চারদিকে জন পাঁচেক লোক নাকি আমায় খুঁজতে বেরিয়ে গেছে।

সব শুনে অবাক যতটা হলাম তার চেয়ে চটলাম বেশী।

"কেন, আমি কি কচি খোকা যে দু দণ্ড কোথাও একলা ছাড়া পাবার উপযুক্ত নই?

pathagar.net

সকালে একটু বেড়াতে বেরিয়েছি তাতে ভয়ে ভাবনায় দিশাহারা হবার মত সাংঘাতিক ব্যাপার কি হয়েছে। আমায় কি একলা পেলে ছেলেধরা নেবে!"

কথাগুলো মামাবাবুকেই শোনাচ্ছিলাম। পাশে মহান্তীকে একটু মুখ টিপে যেন হাসতে দেখে এবার তাঁর ওপরও খাপ্পা না হয়ে পারলাম না।

"মামাবাবুর কাণ্ডজ্ঞান নেই, জানি। কিন্তু আপনি কি বলে ওর সঙ্গে তাল দিয়ে এসব পাগলামি ওঁকে করতে দিলেন? আপনি ত ওঁকে থামাতে পারতেন।"

"ওঁকে থামাব কি করে?"—মহান্তী এবার স্পষ্টভাবেই হেসে বলেছেন—"পাগলামি যদি বল, তা হলে উনি ত নয়, সব আমিই করেছি। অস্থির হয়ে চারদিকের পাহাড় জঙ্গলে তোমায় খুঁজতে পাঠিয়েছি আমিই।"

"আপনি!"—সত্যিই হতভম্ব হয়ে বললাম—"আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি ত অনেক আশাটাশা দিয়েছিলেন এখানে আসবার আগে। এখন কি বলতে চান, আপনার এই তাঁবুর চৌহদ্দির বাইরে যাওয়াই বারণ?"

"এখন অন্ততঃ তাই।"—আমার বিদ্রূপের খোঁচাটা যেন উপভোগ করে বলেছেন মহান্তী—"অত সকালেই তুমি যে বেরিয়ে যাবে তা ত ভাবিনি, তাই তোমাকে সাবধান করা আর হয়ে ওঠে নি!"

"সাবধান! কিসের সাবধান?"—বিরক্তিটা এবার বিস্মিত কৌতূহল হয়ে উঠেছে।

মহান্তীর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা তারপর শুনেছি।

গতকাল আমরা শুতে যাবার পর গভীর রাত্রে দূর এক পাহাড়ী গ্রামের এক আদিবাসী একটা অত্যন্ত খারাপ খবর দিতে মহান্তীর ছাউনিতে ছুটে এসেছে।

তাদের এলাকায় হঠাৎ একটা ক্ষ্যাপা হাতীর উপদ্রব দারুণ বেড়েছে। দিন-দুপুরে কাল তাদের গাঁয়ের একজন লোককে বনের পথে শুঁড়ে জড়িয়ে পায়ে থেঁতলে মেরে ফেলেছে।

এ হাতীর ভয়ে তাদের গাঁ ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। তারা জঙ্গলের মানুষ। জঙ্গলে না বার হলে তাদের দিন চলে না। কিন্তু হাতীর ভয়ে কেউ বসতির বাইরে যেতে সাহস করছে না। ক্ষ্যাপা হাতীটা কোথায় ওত পেতে আছে কে জানে! তেমন মর্জি হলে তাদের নেহাত খেলাঘরের মত লতাপাতার কুঁড়ের ওপর চড়াও হতেই বা তার কতক্ষণ!

হাতীটার চালচলন সব যেন সাক্ষাৎ শয়তানের। কখন যে সে কোথায় যেতে পারে কিছুর ঠিক নেই। কিছুকাল আগে মহাবুয়াং বলে এক জায়গায় এক ক্ষ্যাপা হাতীর উপদ্রবের কথা শোনা গেছল। মহাবুয়াং কিন্তু অনেক দূরের চার-চারটে বড় বড় পাহাড়ের ওপারের জঙ্গল। সেখান থেকে হঠাৎ এত দূরে ক্ষ্যাপা হাতীটা হানা দিতে পারে তা কেউ ভাবতেই পারেনি। হাতীটা সম্বন্ধে আতঙ্ক তাই এত বেশী।

কাছে দূরের সমস্ত আধিবাসী মহান্তীকে তাদের পরম সহায় বলে মানতে শিখেছে গত ক' বছরের ভেতর। ক্ষ্যাপা হাতীর কবল থেকে বাঁচবার জন্যে তাই তারা শরণ নিতে এসেছে মহান্তীর।

মহান্তীর কাছে আসবার আরো একটা কারণ তাদের আছে। যে লোকটা হাতীর উপদ্রবে মারা গেছে সে মহান্তীর ছাউনিরই একজন খিদমতগার। গাঁ থেকে ন্যাড়া পাহাড়ে মহান্তীর ছাউনিতেই আসছিল।

ক্ষ্যাপা হাতী মানেই একটা ভয়ঙ্কর কিছু। তার ওপর এ হাতীটা একটু যেন বেয়াড়া ধরনের বলে লোধমা অঞ্চলে একটু বেশী রকম সাবধান হওয়া প্রয়োজন মনে হয়েছে।

ন্যাড়া পাহাড়ের সব ক'টা ছাউনিতে কাল রাত্রেই খবরটা জানাবার ব্যবস্থা করেছেন মহান্তী। হাতীটা কখন কোথায় উদয় হবে তার ত কোনো ঠিক নেই! তার সঠিক পাত্তা না পাওয়া পর্যন্ত তাই লোধমার ন্যাড়া পাহাড় থেকে কোথাও কাউকে যেতেই মানা করা হয়েছে।

খুব ভোরে উঠে চলে যাবার দরুণ সে নিষেধ শোনবার সুযোগ আমার হয়নি। তাঁবুতে বা কাছাকাছি পাহাড়ে আমায় কোথাও সকাল থেকেই না দেখতে পেয়ে মহান্তী ও মামাবাবু ক্রমশঃ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে চারিদিকে আমার খোঁজে লোকজন পাঠিয়েছেন।

শুধু আমার জন্যেই নয়, ক্ষ্যাপা মস্তী হাতীটার সন্ধান নেবার জন্যেও পাহাড়ে জঙ্গলে নানাদিকে লোক পাঠান হয়েছে।

হাতীর খবর পাওয়া গেলেই মামাবাবু আর মহান্তী সেটা শিকার করতে বার হবেন এই রকম ব্যবস্থা হয়ে আছে।

হাতীর খবর তখন অবশ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু পাওয়া গেলেও তখনি রওনা হতে পারবেন কি না, আমি সুস্থ শরীরে না ফেরা পর্যন্ত, তাঁরা ঠিক করতে পারছিলেন না।

ছাউনির খাবার ঘরে সকালের চা-জলখাবার খেতে খেতেই এসব বিবরণ শুনছিলাম।

শিকার-টিকারের লোভেই কলকাতা ছেড়ে এই পাহাড়-জঙ্গলের অজানা রাজ্যে এসেছি। কিন্তু আসার পর এক রাত না-কাটতে-কাটতে ভাগ্যের এতটা অনুগ্রহে একটু যেন অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

শিকার করতে চেয়েছি বলে প্রথমেই একেবারে ক্ষ্যাপা হাতী জুটিয়ে দেওয়া!

মামাবাবুর কথা জানি না, কিন্তু আমি হাতী শিকারের কথা নেহাত বইয়েই পড়েছি। শিকারের জন্যে ছোট বড় জঙ্গলে অনেকবার গেছি বটে, কেঁদো না হলেও হরিণ-টরিন ছাড়া চিতা কি ভালুকও একটু-আধটু চোখে পড়েছে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে স্বাধীন বুনো হাতী চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য কোথাও কখনো হয়নি।

এ হাতীটা আবার শুধু স্বাধীন বুনোই নয়, উপরন্তু ক্ষ্যাপা খুনে, আর শয়তানের মত চালাক।

অস্বীকার করে লাভ নেই, উত্তেজনা যতটা অনুভব করছিলাম তার চেয়ে ভয় আর উদ্বেগের কাঁপুনি খুব কম নয়।

সেদিন অন্ততঃ ভয় উদ্বেগ উত্তেজনার বাজে খরচই হল। সারাদিনের মধ্যে কোনো দিক থেকে কোনো খবরই পাওয়া গেল না। ও তল্লাটে হাতীটার কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। শুধু ওই একটা মানুষের নিয়তি হয়েই যেন সে এসেছিল। তাকে শেষ করে ভোজবাজিতে গায়েব হয়ে গেছে।

পরের দিন যা খবর পাওয়া গেল তা আরো অদ্ভুত। এ অঞ্চলে নয়, ক্ষ্যাপা হাতীটাকে আবার তার পুরোন জায়গা মহাবুয়াং-এর জঙলেই নাকি দেখা গেছে।

এ খবর সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করবার মত অবশ্য নয়। চার-চারটে পাহাড় যে হাতী যখন খুশী পেরিয়ে যেতে পারে, হঠাৎ খেয়ালে কালই সে ফিরে আসবে না তার ঠিক কি!

pathagar.net

ইচ্ছেমত নিজের খেয়ালে পাহাড়-জঙ্গলে ঘোরা তাই বন্ধই রইল তখনকার মত। মহাবুয়াং-এ একজন সরকারী শিকারী নাকি ক্ষ্যাপা হাতীটার খোঁজে আছে। তার হাতে হাতীর সদ্গতির খবর না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আর স্বস্তি নেই।

যে আশায় আসা তাতেই ছাই পড়ায় আমি যখন ভাগ্যের ওপর গজরাচ্ছি মামাবাবু তখন কিন্তু দিব্যি খোশমেজাজে আছেন।

মহান্তীর ছাউনিতে তাঁর নিজের কাজ চালাবার মত ছোট একটা ল্যাবরেটরী আছে। মামাবাবু দিন রাত্তির পরমানন্দে সেখানেই এমনভাবে কাটান যে মনে হয়, কলকাতা ছেড়ে এই জন্যেই তিনি জঙ্গলের দেশে এসেছেন।

আমার কিন্তু সময় কাটানই দায় হয়ে উঠেছে। পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল নিয়ে যাদের কারবার তাদের ছাউনিতে পড়বার মত বইয়ের লাইব্রেরী আর কোথায় পাব। আর বইপত্তর থাকলেও এখানে এসে তাই পড়ে সময় কাটাতে মন চায়?

করবার আর কিছু না পেয়ে লোধমার ন্যাড়া পাহাড়টা আমি প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছি।

গাছপালা অন্য সব পাহাড়ের তুলনায় একটু কম হলেও পাহাড়টা সত্যি একেবারে ন্যাড়া নয়। যে দিক থেকে ঝরনাটা বেরিয়েছে সেদিকে ত পাহাড়টা খাড়া দেয়ালের মত অনেকখানি সোজা উঠে গিয়ে রীতিমত ঘন জঙ্গলে শেষ হয়েছে।

একদিন সাহস করে বেশ দুর্গম একটা চড়াইয়ের পথ ধরে খাড়া পাহাড়ের সেই ঝাঁকড়া মাথায় গিয়ে উঠেছি। দূর-দূরান্তরে যাবার সুবিধে নেই বলে দূরবীনটা সব সময়ে কাঁধে ঝোলানোই থাকে। তাই নিয়ে দুধের সাধ খানিকটা ঘোলে মেটান যায়।

পাহাড়ের মাথায় একটা সুবিধে মত জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরবীনটা চোখে তুললাম।

এ ক'দিন খোঁজখবর নিয়ে কাছাকাছি চারধারের পাহাড়গুলো অল্পবিস্তর চিনে ফেলেছি। পাহাড়ের মাথা থেকে আদিবাসীদের পবিত্র পাহাড়ের চূড়াটা চিনতে পেরে সেদিকেই দূরবীনটা ফোকাস করলাম।

আদিবাসীরা এ পাহাড়কে পবিত্র মনে করে করালী নাম যে দিয়েছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পাহাড়ের চূড়ার চেহারাটা সত্যিই ভয়-ভক্তি জাগাবার মত। প্রকৃতির নিজের খেয়ালে পাহাড়ের মাথার পাথরগুলো ঠিক যেন বিরাট বীভৎস একটা কুমির গোছের প্রাণীর হাঁ-করা মুখ বলে মনে হয়। ক'টা যেন দাঁতও সে হিংস্র মুখের ভিতর থেকে উঁচিয়ে আছে।

প্রথম দিন না জেনে ওই পাহাড়ের ওপর উঠতে যাবার সময় চূড়ার এ চেহারা ঠিক দেখতে পাইনি। নীচে থেকে দেখাও যায় না ভালো করে।

প্রায় সমান উঁচু আরেক পাহাড়ের মাথা থেকে করালী পাহাড়ের যথার্থ চেহারা এই প্রথম দেখতে পেলাম।

কিন্তু পাহাড়ের গায়ের একটা সরু সুতোর মত পথে ওটা কি দেখা যাচ্ছে?

জন্তু-জানোয়ার নয়, মানুষ।

কিন্তু আদিবাসী ত নয়!

আমার দূরবীন বেশ জোরালো। তাতে যা দেখছি তা ত প্যান্টসার্ট পরা সভ্য মানুষের চেহারা।

pathagar.net

দুই

আদিবাসীদের পবিত্র পাহাড়ে সার্টপ্যান্ট পরা মানুষ।

কেমন করে তা সম্ভব?

সেদিন যা অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তাতে বুঝেছি নেহাত নতুন বাইরের লোক না হলে এ পাহাড়ে ওঠবার কথা এ অঞ্চলে কেউ কল্পনাও করবে না।

আর বাইরের লোক কেউ এলে আমাদের এই ন্যাড়া লোধমা পাহাড়ে না এসে যাবে কোথায়? চারিধারে অমন দু'শ মাইলের মধ্যে আদিবাসীদের কয়েকটা জংলা পাহাড়ী গ্রাম ছাড়া সার্টপ্যান্ট যেখানে চলে এমন সভ্য মানুষের কোনো আস্তানা কোথাও নেই। জরীপের তাঁবু-টাঁবু দূর-দূরান্তে যদি বা একটা-আধটা আগে থেকে পত্তন করা হয়ে থাকে, ক্ষ্যাপা হাতীর এই বিভীষিকা শুরু হবার পর সেখান থেকে কেউ এক পাও বাড়াবে না।

ক্ষ্যাপা হাতীর ভয় আর আদিবাসীদের ধর্মের নিষেধ অগ্রাহ্য করে আমাদেরই মধ্যেকার সার্টপ্যান্ট পরা কে তাহলে ওই অভিশপ্ত এঞ্জা অর্থাৎ করালী পাহাড়ে আজ সকালে গিয়ে উঠতে পারে?

ওঠাটা ত হালকা খেয়াল বলা যায় না, রীতিমত অন্যায় গোঁয়ার্তুমি।

লোধমা পাহাড়ের ক'টি ছাউনিতে যারা আছে তারা সবাই কাজের ধান্দায় এখানে এসেছে, এরকম নিরর্থক গোঁয়ার্তুমি তাদের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়।

করালী পাহাড়ের সরু আঁকা-বাঁকা চড়াইয়ের পথ কোথাও কোথাও কয়েকটা চূড়ার পেছনে ঢাকা পড়েছে। লোকটা এমনি একটা জায়গায় অদৃশ্য হয়ে গেছল। পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই দূরবীনটা চোখে তুলে একটু ভালো করে লক্ষ করবার চেষ্টা করলাম, চেনবার মত কোনো কিছু পাই কি না দেখতে।

তা অবশ্য দুরাশা। জোরালো দূরবীনেও এত দূর থেকে পোষাকটা কি রকম শুধু তাই ছাড়া মুখের চেহারার কোনো আভাসই পাওয়া যায় না। আর আভাস একটু পেলেই বিশেষ সুবিধা হত কি।

এখানে এ কয়দিনে সকলকেই আমি চিনে ফেলেছি বলতে পারব না। আর একটু-আধটু দেখে থাকলেও মুখস্থ নিশ্চয় আমার হয়ে যায়নি। সুতরাং মুখের চেহারার আঁচ সামান্য একটু পেলেও তা দিয়ে কাউকে সনাক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

কিন্তু....? মানুষটাকে ঠিকমত চেনার কোনো সুবিধে হবে না বলে দূরবীনটা নামিয়ে ফেলেছিলাম। নতুন মোচড়টা বুদ্ধিতে লাগতেই আবার দূরবীনটা ব্যাকুলভাবে চোখে তুললাম।

দেখবার সুযোগ তখন আর বেশী নেই। পাহাড়ের মাথার দিকে পথটা চূড়ার আড়াল থেকে একটু উঁকি দিয়েই একেবারে অদৃশ্য হয়ে উল্টো পিঠেই বোধহয় চলে গেছে।

দূরবীনে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র মানুষটাকে দেখতে পেলাম। কিন্তু মনে হল এ দেখাটা একেবারে বৃথা নাও হতে পারে।

খাড়া শিখর থেকে নেমে নিজেদের ছাউনির দিকে যেতে যেতে করালী পাহাড়ে খানিক আগে যা দেখেছি তা মামাবাবু ও মহান্তীকে তখনি জানাব কি না ভাবছিলাম।

pathagar.net

জানান উচিত বুঝলেও সত্যি কথা বলতে গেলে এরকম একটা বাহাদুরীর সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। দারুণ কিছু অবশ্য নয়, কিন্তু ব্যাপারটায় একটু রহস্যের ছোঁয়া যে আছে এ বিষয়ে ত সন্দেহ নেই। ক্ষ্যাপা হাতীর কথা শোনবার পর থেকে মামাবাবু সেই যে ল্যাবরেটরীতে সেঁধিয়েছেন আর ত বেরুবার নাম করছেন না। তাঁকে একটু নাড়া দেওয়া দরকার। করালী পাহাড়ে আজ যাকে চড়তে দেখেছি তার যথার্থ পরিচয় খুঁজে বার করে ব্যাপারটা নাটকীয়ভাবে সাজিয়ে মামাবাবুকে তাই একটু চমকে দিতে চাই।

এ রহস্যভেদের জন্যে কি করতে হবে তা তখনি প্রায় ঠিক করে ফেলেছি। ছোট বড় মিলে পাঁচটি আলাদা কোম্পানীর ঘাঁটি আছে এই লোধমা পাহাড়ে। কিন্তু লোকনাথ মাইনিং সিণ্ডিকেট বাদে অন্য কোম্পানীগুলি নেহাত নগণ্য। কাজের দিক দিয়ে যেমন, লোকবলের দিক দিয়েও তেমনি তাদের গর্ব করবার কিছু নেই। সাধারণ শ্রমিক বাদে সব ক'টি কোম্পানীতে প্যান্টসার্ট পরবার মত ওপরয়ালা কর্মচারীর সংখ্যা বেশী কিছু নয়। একটু চেষ্টা করলে সাধারণ আলাপ করবার ছুতোতেই আজ সকালে কোনো কোম্পানীর কোনো অফিসারকে নিজের ছাউনিতে দেখা যায় নি তা জেনে নেওয়া খুব বোধহয় শক্ত হবে না।

মেঘ না চাইতেই জলের মত এ ধরনের খবর দেবার মানুষ শুধু নয়, একেবারে আসল খবরটাই নিজেদের ছাউনিতে পৌঁছবার আগেই পেয়ে যাব তা ভাবিনি।

পাহাড়ের রাস্তার একটা জংলা গাছের ডালে নতুন ধরনের একটা পাখী দেখে সেটা দূরবীনে ভালো করে লক্ষ করবার জন্যে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

"ছোটবাবু।"

হঠাৎ মেয়েলি নাকি-গলার ডাকটা শুনে চমকে উঠলাম প্রথমে।

এই নির্জন জায়গায় ওই সরু নাকি-গলায় 'ছোটবাবু!' বলে কে ডাকতে পারে! ব্যাপারটা ভূতুড়ে নাকি?

রহস্যটা পরমুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। যে গাছটার ডালের পাখী আমি লক্ষ করছিলাম তারই গুঁড়ির ওপাশ থেকে সরু সিড়িঙ্গে বকের মত চেহারার যে লোকটি কাঁচুমাচু মুখ করে বেরিয়ে এল তাকে দেখে হাসি চাপতে পারলাম না।

হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম—"বঙ্কুবাবু, আপনি এখানে? কি করছিলেন?"

"আজ্ঞে, কিছু না!"—বঙ্কুবাবু সকাতরে আমায় বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করলেন—"সত্যি এইখানে একটু নিরিবিলিতে এসে বসেছিলাম।"

এবার গলা একটু গম্ভীর করতে হল—"শুধু শুধু নিরিবিলিতে এসে বসেছিলেন? এখনো ত মুখটা ভালো করে মুছতে পারেন নি। ঠোঁটের পাশে কি খাবারের গুঁড়ো লেগে আছে! লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে এসে কি খাচ্ছিলেন?"

বঙ্কুবাবু এবার একেবারে অধোবদন। ধরা পড়ে মুখে আর রা নেই।

অতি কষ্টে হাসি চেপে গলাটায় একটু ভর্ৎসনার সুর এনে বললাম— "সরকার সাহেব কি সাধে আপনাকে অত বকাঝকা করেন? আপনি ত সত্যিই—"

কথাটা আমার আর শেষ করতে হল না। সরকার সাহেবের নাম করতেই বঙ্কুবাবু একেবারে অন্য মূর্তি। ওই সিড়িঙ্গে বক যেন আগুন ধরানো হাউই কাঠি হয়ে উঠল এক নিমেষে। একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে একটা খারাপ গালাগালই দিয়ে ফেলে

pathagar.net

বললেন—"ওই সরকার...! ওর কথা আপনারা বিশ্বাস করেন? তা ত করবেন-ই। ও হল সাহেব মানুষ, গ্যাড ম্যাড করে ইংরাজী বলে, দাঁতে পাইপ চেপে তামাক খায়, আর আমি ছেঁড়া কোট প্যান্ট আর ক্যাম্বিসের জুতো পরে বিড়ি খেয়ে দিন কাটাই। আপনারা নিজের জাত ভাইয়েরই ত পোঁ ধরবেন। কিন্তু ও আমায় উপোষ করিয়ে মারতে চায় তা জানেন। ও একটা ছুঁচো, ও একটা গিরগিটি, একটা গন্ধগোকুল একটা—"

বঙ্কুবাবু পশু-জগতে আরো উদাহরণ খোঁজার জন্যে একটু থামতেই গম্ভীর হয়ে সহানুভূতির স্বরে বললাম—"আপনার সব কথাই মানছি। আপনার অফিসার সরকার সাহেব একটা যাচ্ছেতাই লোক। কিন্তু আপনার খাওয়ার লোভ একটু বেশী, ডাক্তারের মানা সত্ত্বেও আপনি লুকিয়ে চুরিয়ে অখাদ্য কুখাদ্য একটু বেশী খান তা ত স্বীকার করবেন।"

সহানুভূতির স্বরটুকুতেই বঙ্কুবাবু এক নিমেষে একবারে গলে জল হয়ে গেলেন। করুণ স্বরে নিজের দুর্বলতাটুকু স্বীকার করে বললেন—"তা সত্যি খাই! কিন্তু খাব নাই বা কেন বলতে পারেন? ক'দিন আর বাঁচব! ডাক্তার যা-ই বলুক, যে ক'টা দিন বাঁচি আত্মাপুরুষকে দুঃখ দিতে চাই না, বুঝেছেন ছোটবাবু।"

বঙ্কুবাবুর ভোজন বিলাসের এ যুক্তির প্রতিবাদ চলে না। হেসে ফেলে তাই বললাম—"আত্মাপুরুষের দোহাই যখন দিয়েছেন তখন বুঝেছি। কিন্তু আমি হঠাৎ ছোটবাবু হলাম কি করে সেইটেই বুঝতে পারছি না।"

"বাঃ, আপনি ছোটবাবু হবেন না ত আর কে হবে!" বঙ্কুবাবু যেন অবাক হলেন আমার বুদ্ধির স্থূলতায়—"আপনি হলেন মহান্তী সাহেবের ছোট ভাই, সে হিসেবে ছোটসাহেবও অবশ্য হতে পারতেন।"

"না, না ছোটবাবুই ভালো!"—সাহেব ঠেকাতে আমার সম্বন্ধে বঙ্কুবাবুর ভুল ধারণাটা সংশোধন না করেই কথাটা অন্য রাস্তায় ঘোরাবার জন্যে হাল্কা সুরে বললাম—"কিন্তু হঠাৎ ছোটবাবু বলে ডেকে কি লোকসানই এইমাত্র করলেন তা জানেন?"

"লোকসান।"—বঙ্কুবাবুর মুখে বেশ একটু ভয় যেন ফুটে উঠল—"কি লোকসান করলাম?"

পাখীটা উড়িয়ে দিলেন।

এবার আমার গলার গাম্ভীর্য আর বঙ্কুবাবুকে ভড়কাতে পারল না। আমার মুখের ভাবটা ঠিক মত পড়ে ফেলে তাঁর সরু নাকি-গলার বেয়াড়া সুরে হাসতে হাসতে বললেন—"ওঃ! আপনি পাখী দেখছিলেন বুঝি! আমি কি তা বুঝতে পেরেছি? ওই জন্যেই বুঝি গলায় দূরবীনটা ঝুলিয়ে নিয়ে ঘোরেন?"

আমি একটু হেসে তাঁর অনুমানটাতেই সায় দেবার পর বঙ্কুবাবু একটু যেন চিন্তায় পড়ে যে প্রশ্নটা করলেন তা আমার পক্ষে প্রথম একটু বেয়াড়াই হয়ে দাঁড়াল।

বঙ্কুবাবু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন—"তা ওই পাহাড়ের ওপর থেকে পূর্ব দিকে তাকিয়ে কি পাখী দেখছিলেন? ও দিকের সব পাহাড় ত অনেক দূর। অত দূরের পাহাড়ের পাখীও দূরবীনে দেখা যায়?"

কি জবাব এখন দেওয়া যায় বঙ্কুবাবুকে, ভাবতে গিয়ে বেশ একটু ফাঁপরেই পড়লাম। বঙ্কুবাবু এখানে লুকিয়ে বসে ছাউনির ক্যান্টিন থেকে চুরি করে আনা নিষিদ্ধ খাবার খেতে

pathagar.net

খেতে আমায় ভালো করেই লক্ষ করেছেন বোঝা গেল। 'এমনি পাহাড় দেখছিলাম' বললে একটু সন্দেহের খোঁচা ওঠবারই সুবিধে দেওয়া হবে। দুবার তিনবার চোখে দূরবীন তুলে অমন তন্ময় হয়ে ঠিক এক দিকেই লক্ষ রাখাকে ঠিক উদ্দেশ্যহীন 'এমনি দেখা' বলে চালান যায় না। অতদূরে পাহাড়ে কোনো পাখী দেখছিলাম বললে আমার দূরবীনের শক্তিটা একটু আজগুবী রকম বাড়াতে হয়। বঙ্কুবাবু দূরবীন সম্বন্ধে অজ্ঞ আনাড়ী হলেও এ মিথ্যেটা হয়ত ধরে ফেলতে পারেন।

সরল সত্য কথাটা তাঁকে জানালেই অবশ্য সব সমস্যা চুকে যায়। কিন্তু তা হলে আমার গোয়েন্দাগিরির প্ল্যান গোড়াতেই একটু ভেস্তে যায় যে। মামাবাবু বা মহান্তীর কাছে নাটকীয়ভাবে রহস্যভেদের মজাটা তা হলে আর হয় না।

এতগুলো ভাবনা এক নিমেষেই মাথার মধ্যে পাক খায়নি। বঙ্কুবাবুর বেয়াড়া প্রশ্নটার উত্তর ভাববার সময় নেবার জন্যেই একটু থেমে এ ধরনের অবস্থায় সবাই যা করে সেই মত প্রশ্নটাকেই প্রথম আবার আউড়ে বলেছি— "অতদূরে পাখী দেখা যায় কি না জিজ্ঞাসা করছেন? কিন্তু পাখী ত আমি দেখছিলাম না।"

উত্তরটা এই পর্যন্ত দিতে না দিতেই বঙ্কুবাবু বেয়াড়া প্রশ্নটা থেকে নিজের সমস্যার সমাধানের সুবিধে করে নেবার কথাটা মাথায় এসে গেল।

"কি দেখছিলেন তাহলে?"—এ প্রশ্ন বঙ্কুবাবুকে আর করবার সময় না দিয়ে সত্যটা অর্ধেক গোপন করে বললাম—"দেখছিলাম, ওই এঞ্জা না কি বলে, আদিবাসীদের সেই পবিত্র পাহাড়ের চূড়োটা। ভাবছি, আজ একবার পাহাড়টায় যাব।"

যা আঁচ করেছিলাম ঠিক সেই ফলই ফলল। বঙ্কুবাবু একেবারে আঁতকে উঠে বললেন—"ও পাহাড়ে যাবেন কি মশাই, ও পাহাড়ে ওঠাই মানা। তা ছাড়া এখন ত কোথাও যাবার কথাই ওঠে না। মহাবুয়াং-এর ক্ষ্যাপা হাতীর কথা ভুলে যাচ্ছেন? লোধমা পাহাড় ছেড়ে কারুর যাবার হুকুমই নেই।"

"সবাই সে হুকুম মেনে চলছে বলতে চান?"— বঙ্কুবাবুকে যেন হালকাভাবেই প্রশ্নটা করলাম।

বঙ্কুবাবু কিন্তু আমার দিকে প্রথম একটু অবাক হয়ে চেয়ে তারপর যেন আক্রোশটা চাপতে না পেরে বলে ফেললেন—"মানছেন না শুধু একজন। ওই সরকার সাহেব।"

তিন

নিজেদের ছাউনিতে ফেরার পর বঙ্কুবাবুর কথাটাই সবিস্ময়ে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করছিলাম।

মামাবাবু আর মহান্তীকে ব্যাপারটা তখনো জানানো হয় নি। সুযোগই ছিল না জানাবার। মহান্তী তাঁর অফিস ঘরে ওখানকার অন্য সব কোম্পানীর কয়েকজন মাথার সঙ্গে একটা জরুরী পরামর্শ সভায় বসেছেন, আর মামাবাবু তাঁর ল্যাবরেটরীতে ঢুকে একেবারে কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছেন তাঁকে কোনো রকমে বিরক্ত না করবার।

pathagar.net

আমাদের ছাউনির খাস বেয়ারা রামস্বরূপের কাছে এসব খবর পেয়ে স্নানটা সেরে নেবার জন্যে বাথরুমে ঢুকেই কথাটা ভাবছিলাম।

বঙ্কুবাবু আক্রোশের বশে যে কথাটা চাপতে পারেন নি তার মানেটা তলিয়ে দেখতে গেলে বেশ একটু গোলমালে পড়তে হয়।

সবাই যা মেনে চলছে একমাত্র সরকার সাহেবই তা অগ্রাহ্য করে খুশীমত যেখানে সেখানে যান। ক্ষ্যাপা হাতীর ভয় তাঁকে ঠেকিয়ে রাখে না, আদিবাসীদের পবিত্র পাহাড়ের ধর্মের মানাও নয়।

সকালে করালী পাহাড়ে সার্টপ্যান্ট পরা যে মূর্তি দূরবীনে দেখেছি তা যে সরকার সাহেবের, বঙ্কুবাবু নাম না করেও স্পষ্টই তা জানিয়ে দিয়েছেন। সরকার সাহেবের এ অদ্ভুত কাজটা কি ধরনের খেয়াল বা গোঁয়ার্তুমি? নিছক খেয়াল বা গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আর কি গরজ থাকতে পারে এরকম বেয়াড়া আচরণের?

সরকার সাহেবের সঙ্গে এ কয়দিনের সামান্য একটু চেনাশোনা হয়েছে মাত্র। বিশেষ কিছুই তাঁর সম্বন্ধে জানি না। লোধমা পাহাড়ে যে ক'টি কোম্পানী এসে খুঁটি গেড়েছে তার মধ্যে সরকার সাহেবের কোম্পানীই সবচেয়ে নগণ্য সন্দেহ নেই। কোম্পানী বলতে তিনি, বঙ্কুবাবু আর একজন ফাইফরমাস খাটার এদেশী আদিবাসী বেয়ারা।

কোম্পানীর নামটা একটু জমকালো গোছের, আই. ডব্লিউ. এস.—অর্থাৎ ইন্টারন্যাশন্যাল ওয়াটার সাপ্লায়ার্স। কাজটা আসলে এই—নতুন কোথাও কারখানা কি খনি-টনির জন্যে বসতি গড়ে ওঠার ব্যবস্থা হলে সেখানে জল সরবরাহের কল-টল বসাবার অর্ডার যোগাড় করা। এ উমেদারী যাতে সার্থক হয়, তার জন্যে আগে থেকে একটু-আধটু লোক দেখানো জরীপও চালাতে হয়। লোধমা পাহাড়ের অঞ্চলে জল পাবার সুযোগ কোথায় কোথায় আছে তাই খোঁজবার নামে সরকার সাহেব তাঁর কোম্পানীর হয়ে এখানে একটা ঘাঁটি খুলেছেন।

কাজ কতদূর কি করছেন জানি না, তবে পোষাক-আশাকে আর চালচলনে সতিই বঙ্কুবাবু যা বলছেন তাই— দাঁতে পাইপ চাপা, গ্যাডম্যাড করে ইংরাজী বলা পাক্কা সাহেব।

এই সাহেবী ভড়ং-এর জন্যে তাঁকে গোড়াতেই একটু লক্ষ করেছি। বিশেষ করে বঙ্কুবাবুর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের জন্যে নজরটা একটু বেশী পড়েছে।

বঙ্কুবাবু একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের বোকা-সোকা মানুষ সন্দেহ নেই। সিড়িঙ্গে বকের মত চেহারা আর সরু মেয়েলি গলার জন্য তাঁকে আরো হাস্যাস্পদ লাগে। এখানকার সবাই অল্পবিস্তর তাঁর পেছনে লাগে মজা করবার জন্যে। বিশেষ করে বঙ্কুবাবুর পেটুকেপনাটা লোধমা পাহাড়ের সব ছাউনিতেই একটা নিত্যকার তামাসার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর সবাই বঙ্কুবাবুকে নাচিয়ে একটু নির্দোষ হাসি তামাসাই করে, কিন্তু সরকার সাহেব যা করেন তা আমার অন্ততঃ বেশ একটু নিষ্ঠুরই মনে হয়েছে।

জরীপের কাজে সরকার সাহেব বেশীর ভাগ বঙ্কুবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। শুনলাম, বঙ্কুবাবুর কাছে যা সবচেয়ে কষ্টকর, জরীপের টহলে বেরিয়ে সরকার সাহেব তাঁকে সেই শাস্তি দিয়ে মজা করেন। ডাক্তারের বারণ বলে বঙ্কুবাবুকে প্রায় উঁপোস করিয়ে রেখে

তাঁকে দিয়েই বওয়ানো টিফিন কেরীয়ার তাঁর সামনে খুলে সরকার সাহেব দেখিয়ে দেখিয়ে তার উপাদেয় লাঞ্চ খান।

আমরা আসার পর থেকেই ক্ষ্যাপা হাতীর ভয়ে জরীপ-টরীপ সব বন্ধ। নিজে তাই চাক্ষুষ দেখিনি, বঙ্কুবাবুর এ শাস্তির গল্প রসাল করে সরকার সাহেবই শুনিয়েছেন। নিজের চোখে বঙ্কুবাবুকে নিয়ে সরকার সাহেবের তামাসার যে নমুনা দেখেছি তাও আমার খুব ভালো লাগেনি।

বঙ্কুবাবু যে এই ন্যাড়া পাহাড়ের নীরস কাজসর্বস্ব জীবনে হাসির খোরাক যোগান তা দু-একদিন এখানে থেকেই বুঝে নিয়েছিলাম। যাঁরা তাঁকে নিয়ে মজা করেন তাঁদেরও খুব দোষ নিই নি। বঙ্কুবাবুর নিজের দোষও আছে। তাঁর নিজের বোকামীতে সবাইকে, এমন কি বেয়ারা চাপরাসীদেরও বঙ্কুবাবু তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করবার সুযোগ দেন।

ক'দিন আগে বিকেলে ক্ষ্যাপা হাতীর ব্যাপারটা আলোচনার জন্যেই লোকনাথ মাইনিং সিণ্ডিকেটের ছাউনিতে একটা চায়ের আসর বসেছিল। এক নাগাপ্পা বাদে সব কোম্পানীর বড় কর্তারাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহান্তীর অতিথি হিসেবে মামাবাবুর সঙ্গে আমিও থাকবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

ক্ষ্যাপা হাতীর সমস্যা সমাধানের কোনো মোক্ষম উপায় কেউ বাতলাতে পারেনি। হাতীর দৌরাত্ম্যে সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে থাকার ফলে কি ক্ষতি যে হচ্ছে সেই আলোচনাই হয়েছিল বেশী। খনির কাজ সরকারীভাবে শুরু করার জন্যে তার যন্ত্রপাতি যোগাবার ভার যে কোম্পানী পেয়েছে সেই এম এম অর্থাৎ মাইনিং মেশিনারিজ-এর প্রতিনিধি মিঃ মানুচিই সব চেয়ে সুপরামর্শ দিয়েছেন বলে আমার মনে হয়েছে। ক্ষ্যাপা হাতী মারবার জন্যে যা ব্যবস্থা হয়েছে তা যথেষ্ট নয় বলে তাঁর ধারণা। তা ছাড়া ক্ষ্যাপা হাতী সম্বন্ধে ভয়টাও তাঁর মতে একটু মাত্রা ছাড়ান। হাতীটা মহাবুয়াং থেকে আশ্চর্যভাবে হানা দিয়ে এদিকেও পাহাড়ে একজন মানুষ মেরেছে ঠিকই। কিন্তু ওই একজনকে মারবার পর এ অঞ্চলে তার মারাত্মক উপদ্রবের আর কোনো খবর পাওয়া গেছে কি? পাগলামির খেয়ালে একবার এদিকে এসে পড়লেও সে এ তল্লাট একেবারে ছেড়ে গেছে এমনও ত হতে পারে। আর সম্পূর্ণ ছেড়ে যাক বা না-যাক, নতুন কোনো উপদ্রব যখন এ পর্যন্ত করেনি, তখন লোধমা এলাকার সকলের ওপর একেবারে ঘরে বন্ধ থাকার হুকুম একটু আলগা করা যেতে পারে। ক্ষ্যাপা হাতীর কথা উড়িয়ে দিয়ে নয়, তার সম্বন্ধে সাবধান থেকে কাজকর্ম আবার শুরু করা উচিত, এই হল মানুচির মত। যে পাহাড়ী রাস্তায় মহান্তীর কোম্পানীর আদিবাসী আরদালীকে হাতীটা মেরেছে, সে জায়গাটা থেকেও একটা সন্ধান চালাবার প্রয়োজনের কথা তুলেছেন মানুচি। ঠিক মত সন্ধান নিতে পারলে হাতীটা ওই অঞ্চলে কোথা দিয়ে এসেছে ও কোন দিকে গেছে বোঝা অসম্ভব হবে না বলে মানুচির ধারণা।

মানুচি হয়ত তাঁর মতের স্বপক্ষে আরো কিছু যুক্তি খাড়া করতেন, কিন্তু সেই সময়ে আমাদের সভা ঘরের দরজায় বঙ্কুবাবুকে একবার উঁকি দিতে দেখা গেছে। আর তাঁকে দেখেই সরকার সাহেব মজা করবার উৎসাহ আর চাপতে পারেন নি। চোখ মুখ পাকিয়ে কড়া গলার ধমক দিয়ে ডেকেছেন— "বঙ্কুবিহারী।"

pathagar.net

ধমক শুনেই বঙ্কুবাবুর অবস্থা কাহিল। ভয়ে ভয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছেন কাঠগড়ার আসামীর মত।

"কি করতে এখানে এসেছ?" বজ্রস্বরে জানতে চেয়েছেন সরকার সাহেব।

মনে পাপ থাকার দরুন কি না বলা শক্ত, বঙ্কুবাবু এ জেরায় একেবারে থতমত। ভয়ের চোটেই আরো সরু হয়ে-যাওয়া গলায় দু-চারবার 'আজ্ঞে—আজ্ঞে' বলে একেবারে বোবা হয়ে গেছেন।

"এখানে আমাদের চায়ের আসর বসেছে।"—সরকার সাহেব যেন হুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে বলেছেন,—"ভালো মন্দ কিছু-না-কিছু খাবার আয়োজন হয়েছেই নিশ্চয় ক্যান্টিন থেকে। তারই লোভে ছোঁক ছোঁক করে ঠিক এসে হাজির হয়েছ বেহায়ার মত, কেমন? বল, সেই লোভে লোভে এসেছ কি না?"

বঙ্কুবাবু করুণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়েছেন। তার পর তাঁর প্রাণের দুঃখ বোঝবার কেউ নেই মনে করে নিরুপায় হয়ে স্বীকার করেছেন— "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

তাঁর সে মিহি মেয়েলি গলার করুণ স্বীকারোক্তি শুনে আর সকলের সঙ্গে না হেসে উঠে পারি নি।

সরকার সাহেব শুধু এই স্বীকারটুকু করিয়েই ছাড়েন নি। মজাটা আরো একটু টেনে নিয়ে গিয়ে ক্যান্টিনের হেড রাঁধিয়ে ছোটেলালকে ডেকে বলে দিয়েছেন—"বঙ্কুবিহারীকে চা জলখাবার আমাদের যা দিয়েছ সব দাও প্লেট ভর্তি করে।"

এ আশাতীত অনুগ্রহে বঙ্কুবাবুর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠতে না উঠতে সরকার সাহেব তাঁর শেষ হুকুম ছেড়েছেন—"বঙ্কুবিহারীর রাতের খাওয়া কিন্তু আজ বন্ধ মনে রেখো।"

বঙ্কুবাবু ছটফটিয়ে উঠে মিহি নাকি সুরে বৃথাই তাঁর প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করেছেন।

সকলের সঙ্গে তামাসাটা উপভোগ করেছি ঠিকই, কিন্তু বেশ একটু খারাপও লেগেছে। সরকার সাহেবের তামাসাটা ঠিক নির্দোষ যেন নয়। তার মধ্যে যেন অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে।

এ তামাসার পর সেদিনকার আলোচনা সভা অবশ্য ভেঙে গেছল।

বঙ্কুবাবুকে নিয়ে সরকার সাহেবের একটু নিষ্ঠুর মজা করার ধরনটা তারপর কয়েকবার চোখে পড়েছে। সরকার সাহেব মানুষটাকে তাতে খুব প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারিনি। বঙ্কুবাবুর কাছে নতুন খবরটা পাবার পর বিরূপতার সঙ্গে মনের মধ্যে একটু বিমূঢ়তাও মিশেছে এখন।

বিমূঢ়তাটা অবশ্য নিরর্থক হতে পারে। সরকার সাহেব মানুষটার মধ্যে দয়ামায়ার হয়ত একটু অভাব আছে, সেই সঙ্গে আছে লুকিয়ে নিয়ম ভাঙার একটা বেয়াড়াপনা, যেটা আসলে খামখেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়।

এই ব্যাখ্যাটা সঠিক হোক বা না হোক সরকার সাহেবের ওপর এখন থেকে গোপনে একটু নজর রাখবার সঙ্কল্প নিয়েই স্নান সেরে বার হলাম।

মহান্তীর কনফারেন্স তখন শেষ হয়েছে। মামাবাবুই শুধু ল্যাবরেটরী থেকে বার হন নি।

নিজে থেকে না বেরিয়ে এলে তাঁকে ডাকার হুকুমও নেই বলে তাঁকে বাদ দিয়েই মহান্তীর সঙ্গে খাবার টেবিলে গিয়ে বসতে হল।

pathagar.net

মামাবাবু কদিন ধরে যে রকম নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন তাতে মনের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভ জমে ছিল। একটু ঝাঁঝের সঙ্গে তাই জিজ্ঞাসা করলাম মহান্তীকে—"আপনার এই ক্যাম্পিসের ল্যাবরেটরীতে কি এমন যুগান্তকারী গবেষণা মামাবাবু করছেন বলুন ত!"

"আমি-ই কি জানি যে বলব?"—মহান্তী গম্ভীর হয়ে বললেন—"দেখছ না ল্যাবরেটরীতে আমারও প্রবেশ নিষেধ।"

"বাঃ! চমৎকার ব্যাপার ত!"—আমি অবাক হয়েই বললাম—"আপনার ল্যাবরেটরীতে কি গবেষণা হচ্ছে, আপনিই জানেন না! ঢোকাও আপনার বারণ!"

"সত্যিই কি আর বারণ।"—এবার মহান্তী হেসে ফেললেন—"তবে ডাঃ রায়কে ত আজ নতুন দেখছি না। কোনো কিছুর মধ্যে যখন এই রকম ডুবে থাকেন, তখন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যান। নিজে থেকে না ডাকলে সে সময়ে ওঁর কাছে যাওয়া উচিত মনে করি না।"

মহান্তী যা বললেন তা কি আমরা অজানা? কিন্তু এই পাণ্ডব বর্জিত জংলা পাহাড়ের ছেলেখেলার এই ল্যাবরেটরীতে ডুবে যাবার মত হঠাৎ এমন কি পেলেন মামাবাবু? সবাই যখন ক্ষ্যাপা হাতীর সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন মামাবাবু কি ল্যাবরেটরীতে তার মুস্কিল আসান খুঁজতে ঢুকেছেন।

ঠিক ওই ভাষায় না হলেও পরিহাসের সুরে মহান্তীকে যা প্রশ্ন করলাম তার মধ্যে ওই ক্ষোভটা একেবারে প্রচ্ছন্ন রইল না।

বললাম—"মামাবাবু ল্যাবরেটরীতে বসেই ক্ষ্যাপা হাতী তাড়াচ্ছেন নাকি?"

উত্তরটা আর পাওয়া গেল না।

মহান্তীর চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে পেছন ফিরে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

মামাবাবু ল্যাবরেটরীর জন্যে বরাদ্দ তাঁবুঘর থেকে বেরিয়ে ছাউনির বাইরের দিকে চলে যাচ্ছেন।

মামাবাবু একা নয়, তাঁর সঙ্গে আর একজন আছেন। মামাবাবুকে দেখে নয়, হতভম্ব হয়েছি মামাবাবুর সেই সঙ্গীটিকে দেখে।

সঙ্গীটি আর কেউ নয়, সরকার সাহেব। মামাবাবু তাঁর সঙ্গেই নিচু গলায় কি যেন আলাপ করতে করতে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন।

মামাবাবুর সঙ্গে সরকার সাহেবের থাকাও আশ্চর্য ব্যাপার। তিনি কি মামাবাবুর ল্যাবরেটরীতেই ছিলেন?

উত্তেজিতভাবে সেই প্রশ্নই করলাম মহান্তীকে। মহান্তী সায় দেওয়ায় অবাক হয়ে বললাম—"তবে যে আপনি বললেন, উনি কাজে ডুবে আছেন। নিজে থেকে না ডাকলে আপনি পর্যন্ত কাছে যাওয়া উচিত মনে করেন না!"

"তা ত করি-ই না।"—মহান্তীর চোখে একটু বুঝি কৌতুকের ঝিলিক দেখা গেল—"কিন্তু নিজে থেকে যাকে ডাকেন, তার যাওয়ায় ত দোষ নেই।"

"তার মানে?"—আরো বিমূঢ় হয়ে বললাম—"মামাবাবু গবেষণা নিয়ে তন্ময় হওয়ার মধ্যে ওই সরকার সাহেবকে নিজে থেকে ডেকেছেন? কেন?"

"গবেষণার ব্যাপারেই নিশ্চয়।"—সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন মহান্তী।

pathagar.net

"গবেষণার ব্যাপারে আপনি থাকতে সরকার সাহেবকে?"—আমি ঝাঁঝালো গলাতেই বললাম—"উনি কি আপনার চেয়ে বড় খনিজবিশেষজ্ঞ?"

"তা হওয়া অসম্ভব কিছু ত নয়।"—মহান্তী যেন একটু দুঃখের হাসি হাসলেন—"ডাঃ রায় নইলে ওঁকেই ডেকেছেন কেন?"

কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে বসে থেকে সবচেয়ে জরুরী প্রশ্নটা করলাম—"সরকার সাহেব কখন থেকে ল্যাবরেটরীতে আছেন, জানেন?"

"তা জানি বইকি।"—মহান্তী হেসে বললেন—"সেই সকাল থেকেই আছেন!"

"সকাল থেকেই! সকাল থেকেই!"—মহান্তীকে বেশ একটু অবাক করে বিস্ময়টা সরবে প্রকাশ করেই ফেললাম।

"কি হল কি?"—জিজ্ঞাসা করলেন মহান্তী।—"সরকার সাহেবের সকাল থেকে ল্যাবরেটরীতে থাকাটায় আশ্চর্য হবার কি আছে?"

চার

কি যে আছে তা মহান্তীকে তখন বলতে পারিনি।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেইদিনই বিকেলে বঙ্কুবাবুকে একটু নিরিবিলিতে নিয়ে গিয়ে—"আমায় মিথ্যে কথা বলেছিলেন কেন?"

থতমত খেয়ে বঙ্কুবাবু কাঁদ কাঁদ গলায় বলেছিলেন—"মিথ্যে কথা! কই? কি বলেছি?"

এরপর বঙ্কুবাবুকে বেশ একটু কড়া করেই ধমক দিয়েছিলাম।

"কি মিথ্যে বলেছেন জানেন না। সকালে কি বলেছিলেন আমায়?"

ভান কি না জানি না, কিন্তু বঙ্কুবাবু বেশ যেন একটু ভড়কে গিয়ে সকালের কথা ভাবতে চেষ্টা করছেন মনে হয়েছিল।

অনেক ভেবেচিন্তে কাতরভাবে যা জানিয়েছিলেন তাতে হাসি পাবারই কথা। তবে মেজাজটা তখন রীতিমত খারাপ ছিল বলে কৌতুকের বদলে বিরক্তিই বোধ করেছিলাম।

বঙ্কুবাবু আমার অভিযোগ কাটাবার জন্যে করুণভাবে বলেছিলেন—"আজ্ঞে, সকালে গোড়ায় একটু লজ্জা হয়েছিল। তারপর সত্যি কথা ত স্বীকার করেছিলাম। কেন অমন করে লুকিয়ে খাই তাও বলেছিলাম আপনাকে।"

"আপনার চুরি করে খাওয়ার কথা হচ্ছে না!"—রুক্ষ স্বরে বলেছিলাম—"রাতদিন আপনার শুধু খাওয়ার চিন্তা বলে ওই কথাই ভাবছেন। আর কি তখন বলেছিলেন মনে পড়ছে না? কি বলেছিলেন সরকার সাহেবের সম্বন্ধে?"

"সরকার সাহেবের সম্বন্ধে!"—বঙ্কুবাবু এবার কিন্তু আর থতমত খান নি। আমায় অবাক করে দিয়ে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ স্বরেই বলেছিলেন—"সরকার সাহেব সম্বন্ধে মিথ্যে ত কিছু বলি নি।"

"মিথ্যে বলেন কি!"—আমি মেজাজটা কড়াই রেখেছি—"বলেছিলেন না যে, সরকার সাহেব আজ সকালে আদিবাসীদের এঞ্জা পাহাড়ে গেছেন?"

pathagar.net

এবার আমারই প্রথমে হতভম্ব, তারপর অপ্রস্তুত হবার পালা। কাঁদুনে মিহি গলায় হলেও বঙ্কুবাবু রীতিমত ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছিলেন—"আজ্ঞে, সে রকম কোনো কথাই ত বলি নি। আমি শুধু বলেছিলাম, লোধমা পাহাড় ছেড়ে কোথাও যাওয়া বারণ হলেও সরকার সাহেব তা মানেন না। মনে করে দেখুন, আজকের সকালে যাওয়ার কথা, কি এঞ্চা পাহাড়ের নাম উচ্চারণও করিনি।"

সকালের কথাগুলো ভালো করে স্মরণ করে মনে মনে বেশ লজ্জিত হয়েছিলাম। সত্যিই সরকার সাহেব সেদিন সকালেই এঞ্চা পাহাড়ে গেছেন এমন কোনো কথা ত বঙ্কুবাবু বলেন নি। লোধমা পাহাড় ছেড়ে যাবার নিষেধ একমাত্র সরকার সাহেবই মানে না শুনে আমি খবরটার নিজের মত মানে করে নিয়ে আমার মনগড়া সন্দেহগুলো সরকার সাহেবের ওপর চাপিয়ে বসে আছি।

ভেতরে ভেতরে যে লজ্জা পেয়েছিলাম বাইরে তা প্রকাশ করিনি অবশ্য। তার বদলে সে লজ্জা ঢাকতে বেশ গলা চড়িয়ে অভিযোগটা একটু ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম—"আজকের সকালে এঞ্চা পাহাড়ের নাম না হয় করেন নি, কিন্তু সরকার সাহেব সম্বন্ধে যা বলেছেন তা-ই ত মিথ্যে। শুধু আপনার আক্রোশ মেটাতে ও কথা ত বানিয়ে বলেছেন।"

"আক্রোশ মেটাতে বানিয়ে বলেছি!"—বঙ্কুবাবু একেবারে যেন মিহি গলায় ডুকরে উঠেছিলেন— "বেশ, আজ হোক কাল হোক, আমি আপনাকে নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখাব।"

"কি দেখাবেন, কি? সরকার সাহেব লোধমা পাহাড় ছেড়ে বাইরে যান, এই?"—গলাটা কড়া রেখেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

"শুধু তাই কেন! আরো কিছু!"—বঙ্কুবাবু এবার গলায় হঠাৎ রহস্যের ছোঁয়া লাগিয়ে বলেছিলেন—"চুপিচুপি ডাকব কিন্তু। কাউকে কিছু জানাবেন না। চুপিচুপি ডাকলে আসবেন ত?"

বঙ্কুবাবুর ভঙ্গী দেখে এবার না হেসে পারিনি—"চুপি চুপি বা চেঁচিয়ে যেমন করেই ডাকুন, আসব"—বলে কথা দিয়ে তাঁকে ছেড়ে এসেছিলাম!

বঙ্কুবাবুর সঙ্গে আলাপটা হালকাভাবেই শেষ করে এসেছিলাম বটে, কিন্তু মনের ভেতর সংশয় সন্দেহের অস্বস্তিটা আরো বেড়েই গেল তারপর। হেঁয়ালিটা আরো ত গভীর হয়েই উঠেছে ক্রমে ক্রমে।

বঙ্কুবাবুর কথা আমি না হয় ভুল বুঝেছি, কিন্তু সেদিন সকালে বারণ থাকা সত্ত্বেও কেউ যে লোধমা পাহাড় থেকে বেরিয়ে এঞ্চা পাহাড়ে উঠেছিল এ বিষয়ে ত সন্দেহ নেই।

সে কে হতে পারে তা ত নতুন করে সন্ধান নিতে হয়। অমন করে সব নিষেধ অগ্রাহ্য করে ও পাহাড়ে সাত সকালে ওঠবার গরজই বা কার এবং কেন?

সরকার সাহেব সম্বন্ধে সেদিনকার সন্দেহটা অমূলক বলে প্রমাণ পাওয়া গেলেও তাঁর বিষয়ে মনের মধ্যে একটু খোঁচা যেন থেকে যায়। বঙ্কুবাবু শুধু আক্রোশের বশে তাঁর সম্বন্ধে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছেন বলে ত মনে হয় না। সরকার সাহেব চেহারা-চাল-চলনেই কেমন যেন একটু বেয়াড়া গোছের মানুষ। নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তিনি

এ ক'দিনের মধ্যে লোধমা পাহাড় থেকে কখনো কখনো যে বেরিয়ে গেছেন বঙ্কুবাবুর এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ভাবা যায় কি?

সমস্ত ব্যাপারটা এক হিসেবে এমন কিছু মাথা ঘামাবার হয়ত নয়। একটা খুনে ক্ষ্যাপা হাতীর ভয়ে কিছুদিনের জন্যে এ অঞ্চলে খুশীমত ঘোরাফেরা বারণ করা হয়েছে, আর তা সত্ত্বেও দু-একজন সে বারণ অগ্রাহ্য করছে, আসলে এই ত ব্যাপার। এর সঙ্গে আদিবাসীদের পবিত্র এঞ্জা পাহাড়ে ওঠার ঘটনাটা ধরলেও তেমন কিছু রহস্য সব কিছুকে জড়িয়ে আছে ভাবাই হয়ত আমার কল্পনাবিলাস।

মনকে এইভাবে বোঝাবার চেষ্টা যে করিনি তা নয়, কিন্তু খুব সফল হয়েছি বলতে পারব না। ওপর থেকে তেমন কিছু বোঝা না গেলেও কি যেন একটা অস্বাভাবিক অশুভ কিছু সব ক'টা ঘটনাকে জড়িয়ে আছে বলে সন্দেহটা মন থেকে দূর হতে চায়নি।

আমার সন্দেহ যে একেবারে কাল্পনিক নয়, পরের দিনই তার অমন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাবে, তা অবশ্য ভাবতে পারিনি।

প্রমাণটার কথা জানা গেল আবার স্বয়ং মামাবাবু কাছ থেকে।

আগের দিন মামাবাবুকে একবারও সুবিধে মত ধরতে পারিনি। দুপুর পর্যন্ত তিনি ত সরকার সাহেবের সঙ্গে ল্যাবরেটরীতেই কাটিয়েছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে খাবার ঘরে আসবেন জেনে সেখানে অপেক্ষা করাও বৃথা হয়েছে। আমাদের খাওয়া শেষ হবার পর বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও মামাবাবুকে আসতে না দেখে মহান্তীই রামস্বরূপকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন। রামস্বরূপ ফিরে এসে যা খবর দিয়েছে তাতে মহান্তী আমারই মত অবাক। মামাবাবু নাকি এ বেলার মত ছাউনিতে আর ফিরবেন না। সরকার সাহেবের সঙ্গে তাঁর তাঁবুতে গিয়ে দুপুরের খাওয়া সারবেন। ক্যান্টিনের হেড কুক ছোটেলালকে আগে থেকেই নাকি সেখানে খাবার পাঠাবার কথা বলে দেওয়া হয়েছে।

ব্যবস্থাটা মহান্তীর কাছেও যে অপ্রত্যাশিত তা তাঁর মুখ দেখে বুঝেছিলাম। মামাবাবুর ওপর তাঁর অন্ধ ভক্তি। তবু সরকার সাহেবের সঙ্গে মামাবাবুর হঠাৎ এত মাখামাখি তাঁকে যে বেশ বিস্মিত করেছে মহান্তী সেটা লুকোতে পারেন নি।

শুধু বিস্ময় নয়, সরকার সাহেবকে নিয়ে এই বাড়াবাড়িতে আমার একটু রাগই হয়েছিল। একটু তেতো গলাতেই আমি মন্তব্য করেছিলাম—"সরকার সাহেবের মধ্যে মামাবাবু ত নতুন নিউটন-আইনস্টাইন আবিষ্কার করেছেন মনে হচ্ছে!"

মহান্তী কিন্তু মামাবাবুর বিষয়ে এটুকু ঠাট্টাও সহ্য করেন নি। হেসে বলেছিলেন—"তোমার মামাবাবুকে এখনো ঠিক চেন না মনে হচ্ছে!"

এরপর মামাবাবুর বিষয়ে আর কোনো কথা তোলা উচিত মনে করি নি। বিকেলে বঙ্কুবাবুকে বকুনি দিতে যাওয়ার ফল যা দাঁড়িয়েছে তা আগেই জানিয়েছি।

রাত্রেও মামাবাবু আমাদের সঙ্গে খাওয়ার টেবিলে যোগ দেননি। বঙ্কুবাবুর মারফতই খবর পাঠিয়েছেন যে, তাঁর জন্যে অপেক্ষা যেন আমরা না করি। রাতের খাওয়াটাও তিনি সরকার সাহেবের তাঁবুতেই সারবেন।

শুধু রাতের খাওয়াটাই সেখানে সারেন নি, মামাবাবু সেখান থেকে ফিরেওছেন প্রায় মাঝরাতে।

pathagar.net

বিছানায় শুয়ে তাঁর আসাটা টের পেয়েছি, কিন্তু মনের ক্ষোভ রাগ কৌতূহল তখনকার মত চেপে রাখতে হয়েছে।

সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রথমটা অবাক যেমন হয়েছি তেমনি হতাশও। মামাবাবুর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ আজকেও বোধহয় মিলবে না।

মামাবাবু তাঁর বিছানায় নেই। উঠে খোঁজ করে জেনেছি ভোর না হতে উঠে রামস্বরূপকে গাইড করে লোধমা পাহাড় থেকেই নেমে গেছেন।

আমার কাছে হলেও মামাবাবুর এদিনের ভোরের এই অন্তর্ধান মহান্তীর কাছে অপ্রত্যাশিত নয় বলেই মনে হয়েছে।

আমি উদ্বেগ-উত্তেজনা নিয়েই মহান্তীকে খবরটা দিতে গেছলাম। যেরকম আশা করেছিলাম মহান্তীকে সে রকম বিচলিত না দেখে অবাক হয়েছি। একটু সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি—"মামাবাবুর আজ ভোরে বেরিয়ে যাবার কথা আপনি জানতেন না কি?"

"ঠিক জানতাম না।"—মহান্তী গম্ভীরভাবেই বলেছেন—"তবে এই রকম আরো অনেক কিছুর জন্যে কাল থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছি। রায়বাবু কাল রাত্রে তার ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন।"

মহান্তীর কাছে মামাবাবু কখনো 'মিঃ রায়' কখনো 'রায়বাবু' কখনো আবার শুধু 'আপনার মামাবাবু' কেন হন সেটা একটা গবেষণার বিষয়। মহান্তীর মন মেজাজের সঙ্গে সম্বোধন পাল্টে যাবার কোনো সম্পর্ক হয়ত আছে। তখন অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবস্থা নয়। 'রায়বাবু' শুনে একটু চমকালেও বিস্মিত প্রশ্নটাই করেছি—"আপনার সঙ্গে কাল রাত্রে মামাবাবুর কথা হয়েছিল? তিনি ত রাত প্রায় একটায় শুতে এসেছিলেন।"

"হাঁ"—মহান্তী স্বীকার করলেন—"তার আগে আমাকে ছাউনির বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করেন। আজই গুরুতর কিছু একটা ব্যাপারে হদিস পাওয়া যাবে বলে তখনি ইঙ্গিত করেছিলেন।"

আমাকে একেবারে বাদ দিয়ে মহান্তীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গোপন আলাপ করার খবর শুনে ক্ষুণ্ণ বেশ একটু হয়েছি। কৌতূহলের সঙ্গে সেই জ্বালাটা পরের প্রশ্নে সম্পূর্ণ লুকোতে পারি নি।

একটু তেতো গলাতেই বলেছি—"গুরুতর কিছুর হদিস সরকার সাহেবের দৌলতেই পাওয়া যাচ্ছে নাকি? তাঁর সঙ্গে হঠাৎ এত দহরম মহরম এই জন্যে?"

"তা হতে পারে।"—আমার মেজাজ দেখে মহান্তী এবার হেসে ফেলেছেন।

পাঁচ

মামাবাবু গত দু দিন যে রহস্য নিয়ে অত ব্যস্ত হয়ে আছেন সেটা যে কত বড় গুরুতর ও তার হদিস পাওয়ার ব্যাপারে সরকার সাহেবের ভূমিকা যে কতখানি,সেই দিন দুপুরেই তা জানা গেল।

মামাবাবু ফিরলেন বেশ বেলায়। সঙ্গে যেমন সন্দেহ করেছিলাম—সেই সরকার সাহেব। তাঁকে নিয়েই ভোরবেলায় মামাবাবু বেরিয়েছিলেন।

pathagar.net

সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যাওয়ায় মহান্তীর সঙ্গে আমি বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়েই মামাবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। মামাবাবু কোথায় গেছেন বলে যাননি। এখানকার নিষেধ নিজেই প্রথম ভেঙে লোধমা পাহাড় ছেড়ে তিনি নেমে গেছেন এইটুকু শুধু জানা গেছে।

মুখে কিছু না বললেও মহান্তী যে খুব নির্বিকার নিশ্চিন্ত তা মনে হয়নি। লোধমা পাহাড় থেকে নামা-ওঠার সাধারণ রাস্তায় একটু এগিয়ে গিয়ে খোঁজ করবার কথা তুলতেই মহান্তী রাজী হয়ে গেছেন।

পাহাড় থেকে উৎরাই যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে একটা ঢিবির পাশে বড় একটা গাম্ভারি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দূরবীন দিয়ে বৃথাই কিন্তু চারিদিক ব্যাকুলভাবে লক্ষ করেছি। বেশ একটু ভাবিত হয়ে নীচে খোঁজ করতে যাওয়ার জন্যে যখন তৈরী হয়েছি তখন ছাউনি থেকে রামস্বরূপ ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিয়েছে যে, সরকার সাহেবের সঙ্গে মামাবাবু এই মাত্র ফিরে এসে আমাদেরই ডাকছেন।

সাধারণ রাস্তা ছেড়ে মামাবাবু তাহলে কোনো চড়াই ভেঙে লোধমা পাহাড়ে উঠলেন? গেছলেনই বা তিনি কোথায়?

সে সব কথা জিজ্ঞাসা করবার ফুরসত মিলল না।

ছাউনিতে ফিরে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে মামাবাবু মহান্তীকে প্রায় যেন আদেশই দিলেন—"এখনি সকলকে জানিয়ে দাও যে লোধমা পাহাড় থেকে বাইরে যাওয়ার আর মানা নেই।"

"তার মানে?"—সবিস্ময়ে প্রশ্নটা না করে পারলাম না—"সে ক্ষ্যাপা হাতীটা মারা পড়েছে, না এ তল্লাট ছেড়ে গেছে?"

"মারা পড়েছে কি না এখনো জানি না,"—মামাবাবু একটু তীক্ষ্ণস্বরে জানালেন—"কিন্তু এ তল্লাটে কোনো দিন সে আসেই নি। মহান্তীর আদিবাসী চাপরাসী যেদিন জঙ্গলের পথে মারা পড়ে সেদিন অন্তত নয়।"

"সে কি?"—মহান্তী বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞেসা করলেন—"চাপরাসী তা হলে মারা গেল কি করে? তার হাতীর পায়ে থেঁতলানো লাশই ত পাওয়া গেছল।"

"তা যে গেছল সে ত শোনা কথা মাত্র"—মামাবাবু বললেন—"নিজের চোখে ত কেউ আমরা দেখি নি। বাঙ্গুরকেলা থেকে পুলিশের একজন লোক এসে লাশ পোড়াবার অনুমতি দেওয়ার কথা। ক্ষ্যাপা হাতীর ভয়ে কেউ আসেই নি। ওখান থেকেই হুকুম ছেড়ে দিয়েছে।"

"কিন্তু চাপরাসী মারা পড়বার দিন ক্ষ্যাপা হাতীটা যে এ তল্লাটে আসে নি সেটা অমন নিশ্চিত জানলেন কি করে?"—বেশ সংশয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম।

"জানলাম, মহাবুয়াং-এর একজন শিকারীর সঙ্গে কথা বলে।"—সরকার সাহেব এবার জবাব দিলেন—"তিনি ওই দিনই মহাবুয়াং-এর জঙ্গলে হাতীটার পেছনে অনেক ছোটাছুটি করেছেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে নীচের পাহাড়ী রাস্তায় আজই সকালে দেখা—মহাবুয়াং থেকে মিঃ নাগাপ্পার কাছে আসছেন।"

নাগাপ্পার নামটা শুনে নিজের অজান্তেই কেন চমকে উঠলাম প্রথমে বুঝতে পারলাম না।

pathagar.net

মামাবাবু যে খবরটা দিলেন তাতে লোধমা অঞ্চলের ক্ষ্যাপা হাতীর ভয়টা ঘুচল বটে, কিন্তু আরেকটা রহস্য গভীর শুধু নয়, ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিল।

মহাবুয়াং থেকে ক্ষ্যাপা হাতীটা পাহাড় ডিঙিয়ে এদিকে আসেই নি। অন্তত আদিবাসী পিয়নটি যেদিন মারা গেছে সেদিন মহাবুয়াং-এর জঙ্গলেই সেটা যে ছিল, তার চাক্ষুষ প্রমাণ আছে।

আদিবাসী পিয়নটি তা হলে মারা গেল কিসে?

ক্ষ্যাপা হাতী তাকে পায়ে থেঁতলে মেরেছে এ খবরটাই বা রটল কেমন করে?

এ খবর লোধমা পাহাড়ে মহান্তীর কাছে যে নিয়ে এসেছিল সেই আদিবাসী দূতের পক্ষে মিথ্যে করে এমন একটা খবর বানানো ত সম্ভব নয়!

সম্ভব হলেও তাতে তার স্বার্থ কি?

মহান্তীর পিয়ন তার পাহাড়ী বসতি থেকে লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে কাজে যোগ দিতে আসছিল। গরীব পাহাড়ী আদিবাসী। কেড়েকুড়ে নেবার মত পয়সাকড়ি তার কাছে ছিল না নিশ্চয়। কোনো সময়েই তা থাকে না। তা হলে তাকে নির্জন বনের রাস্তায় এমনভাবে কে কি উদ্দেশ্যে মারতে পারে?

এ খুনটা কি তাদের নিজেদের গাঁয়েরই কোনো রকম আকচাআকচি কি ঝগড়াঝাটির পরিণাম?

তা হওয়া প্রায় অসম্ভব। সভ্য মানুষের সংস্পর্শে বেশীদিন আসেনি বলে এ অঞ্চলের আদিবাসীরা এখনো তাদের নির্মল সরলতা হারায়নি। ব্যক্তিগত কোনো আক্রোশেও এমন লুকিয়ে চুরিয়ে খুন তারা করতে যাবে না। সে খুনকে ক্ষ্যাপা হাতীর কাজ বলে সাজাবার মত প্যাঁচাল বুদ্ধিও তাদের নেই।

মামাবাবু বলছেন যে হাতীর পায়ে থেঁতলানো লাশের কথা আমরা কানে শুনেছি মাত্র। তার চাক্ষুষ প্রমাণ নেই।

তা না থাকলেও যে আদিবাসী দূত খবরটা এনেছিল, সে অন্তত চেহারা দেখেছে,তা নিশ্চয় হাতীর পায়ে থেঁতলানো বলে ভুল হতে শোনা কথার ওপর নির্ভর করে আসেনি। সে স্বচক্ষে মৃতদেহের যে চেহারা দেখেছে, তা নিশ্চয় হাতীর পায়ে থেঁতলানো বলে ভুল হতে পারে। মৃত পিয়নটির লাশের ওই রকম পেষা-দলা অবস্থা কেমন করে হল সেটাও একটা দুর্ভেদ্য রহস্য।

নিজের মনে এসব তলাপাড়া করতে করতে সরজমিনে ব্যাপারটার তদন্ত করে আসা একান্ত দরকার বলে মনে হল।

পিয়নের মৃতদেহ সেখানে অবশ্য পড়ে নেই। অন্য চিহ্নটিহ্নও কিছু এতদিন বাদে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তবু জায়গাটা স্বচক্ষে দেখে ও আদিবাসীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করে হয়ত রহস্যের কোনো খেই পাওয়াও যেতে পারে।

এছাড়া এ রহস্যভেদের আর কোনো উপায় ত আমি দেখতে পেলাম না।

আমার মাথায় যে বুদ্ধি এসেছে মামাবাবুর সঙ্গে সেটা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁকে পাচ্ছি কোথায়?

পেলেও এসব কথা শোনবার তাঁর সময় কই?

pathagar.net

সেদিন দুপুরে ক্ষ্যাপা হাতীর এ অঞ্চলে উপদ্রবের গুজবটা মিথ্যে বলে জানিয়ে দেবার পর মামাবাবু আসল রহস্যভেদের কি রাস্তা নিয়েছেন, তা বোঝা আমার অসাধ্য।

দুপুরের স্নানাহার কোনো রকমে নম-নম করে সেরেই তিনি তাঁর ল্যাবরেটরীতে ঢুকেছেন। এবারে অবশ্য সেখানে প্রবেশ নিষেধ নয়। সরকার সাহেব ছাড়া মহান্তীকেও এবার ডেকে নিয়ে গেছেন।

মামাবাবু আর মহান্তীকে না জানিয়ে শুধু নিজের মতলবে আদিবাসীদের বসতিতে খোঁজ করতে যাওয়া উচিত হবে না বুঝে মরীয়া হয়েই বিকেল বেলা মামাবাবুর ল্যাবরেটরীর তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলাম।

আমার অনাহূত আবির্ভাবে কারুর আপত্তি যেমন দেখা গেল না, তেমনি কোনো অভ্যর্থনাও নয়। সরকার সাহেব ও মহান্তী তবু একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন, মামাবাবু সেটুকু ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

তাঁরা তখন সামনে ক'টা ছেঁড়াখোঁড়া কাগজ রেখে তারই আলোচনায় তন্ময়।

আলোচনাটা আমার কাছে গোপন করবার কোনো চেষ্টা দেখলাম না, কিন্তু খানিকক্ষণ নীরব শ্রোতা হয়ে বসে থেকে যেটুকু বুঝলাম, তাতে তা নিয়ে অত উত্তেজিত আলোচনা অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকল।

কাগজ ক'টা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িরই উপযুক্ত। সে রকম কোনো জঞ্জালের জায়গা থেকেই সেগুলো কুড়িয়ে আনা হয়েছে। এনেছেন সরকার সাহেব।

টেবিলের ওপর যেটা রাখা ছিল সেটা তুলে নিয়ে একবার দেখলাম। কাগজটা দুমড়ে দলা পাকিয়ে কেউ ফেলে দিয়েছিল। সেটা এখন একটুআধটু টেনেটুনে পাত করবার চেষ্টা হয়েছে। কেন যে হয়েছে, তা বোঝা আমার অসাধ্য। তাড়াতাড়িতে এটাওটা টোকবার জন্যে ব্যবহার করে তারপর কাজ হয়ে গেলে আজে বাজে কাগজ হিসাবে যা ফেলে দেওয়া হয়, এগুলো তার বেশী কিছু নয়।

আমি যেটা হাতে পেয়েছিলাম তাতে পেন্সিলে এক কোণে অস্পষ্টভাবে শুধু লেখা, 'মেটাল বুলেটিন ১৯৩৮ ৭৮ নম্বর, এক আউন্স— ছত্রিশ ডলার।'

অন্য কাগজ ক'টার সেই ধরনেরই আরো কিছু হয়ত আছে। লেখা যা আছে তা খনিজ সম্বন্ধে টুকিটাকি তথ্য বলেই মনে হয়। খবর হিসেবে হয়ত দামী, কিন্তু তথ্যের চেয়ে কাগজগুলোই বেশী উত্তেজনা জাগিয়েছে দেখলাম।

মামাবাবু তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সরকার সাহেবের কাছে কাগজগুলো কোথায় কি ভাবে পাওয়া গেছে জেনে নিচ্ছিলেন।

"প্রথম কাগজটা ত ক্যান্টিনে যাবার রাস্তার ধারেই পেয়েছিলেন বললেন"— মামাবাবু সরকার সাহেবের স্মৃতিটা যেন উসকে দেবার চেষ্টা করলেন—"কিন্তু ও রকম একটা দলা পাকান কাগজ রাস্তার ধারের ঝোপ থেকে তুলতে ইচ্ছে হল কেন?"

সরকার সাহেব সবিস্তারে তাঁর কাগজ পাওয়ার ইতিহাস এবার বলতে বসলেন।

কাগজগুলো পাওয়ার জন্যে জুতোজোড়ার কাছে নাকি তিনি ঋণী। নতুন কেনা জুতো। গোড়ালীর দিকটায় এখনো একটু লাগে। সেদিন ক্যান্টিন থেকে ফেরবার সময় একটু বেশী

লাগছিল বলে শুকতলার গোড়ালীর দিকটা সামান্য উঁচু করবার জন্যে একটা কিছু খুঁজতে গিয়ে রাস্তার ধারে ঝোপের গায়ে দলা পাকান কাগজের ডেলাটা দেখতে পান। তখনকার মত কাজে লাগিয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে কাগজের ডেলাটা ফেলে দিতে গিয়ে হঠাৎ কি খেয়ালে সেটা খুলে দেখেন। খুলে ওই টুকিটাকি লেখাগুলোর কোনো তাৎপর্য থাকতে পারে বলে প্রথমে বুঝতে পারেন নি—

সরকার সাহেব যেভাবে তাঁর বিবরণ ফেঁদেছেন, তাতে কতক্ষণে তা শেষ হবে কে জানে।

বেশীক্ষণ আর ধৈর্য ধরতে না পেরে তাঁর কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে বললাম—"আমার সামান্য একটু কথা বলবার ছিল, কথাও ঠিক নয়, আসলে একটু অনুমতি চাইতে—"

"না, না অনুমতি চাইবার কি আছে!"—মামাবাবু আমাকে শেষ করতেই দিলেন না। আমার কথাটার সম্পূর্ণ ভুল মানে করে কোনো রকমে নিজেদের আলোচনায় ফিরে যাবার তাড়ায় বললেন—"তুমিও খোঁজ না। সে রকম কাগজপত্র কিছু পেলে তক্ষুনি আমাদের দেখাতে কিন্তু ভুলো না।

হতভম্ব হয়ে খানিক মামাবাবুদের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। তাঁরা ইতিমধ্যেই ছেঁড়া কাগজের দলার আলোচনায় ফিরে গিয়েছেন। আমি রইলাম কি গেলাম, সে খেয়ালও বোধ হয় নেই।

এরপর ভেতরে ভেতরে গজরাতে গজরাতে নিঃশব্দে চলে যাওয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে!

তাই গেলাম। এবং ল্যাবরেটরীর তাঁবু থেকে বেরিয়েই বঙ্কুবাবুকে কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে দেখে হাতে যেন স্বর্গ পেলাম।

বঙ্কুবাবু আমায় বার হতে দেখে অপরাধীর মত সরে পড়বার চেষ্টায় ছিলেন। আমিই তাঁকে ডেকে থামালাম—"শুনুন, শুনুন, বঙ্কুবাবু! পালাচ্ছেন কেন!"

বঙ্কুবাবু আমার ডাকটায় অভিযোগের গন্ধ কোথায় পেলেন কি না জানি না, কিন্তু এবারে কাঁদুনে গলায় তাঁর এখানে উপস্থিত থাকার কৈফিয়ত দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

"আমার কি দোষ বলুন ত!"—বঙ্কুবাবু আমাকেই সালিসী মানলেন—"জরুরী বলে যে চিঠিগুলো টাইপ করে পাঠাতে হুকুম দিয়ে এলেন সেগুলো সই ছাড়াই যাবে? এই আসেন এই আসেন ভেবে সেই বিকেল তিনটে থেকে অফিসে বসে আছি। হঠাৎ এসে পড়ে অফিসে না পেলেই ত কুরুক্ষেত্র বাধাবেন। বিকেলের চা জলখাবারটা পর্যন্ত ক্যান্টিনে খেতে যেতে পারি নি—"

এইটেই আসল দুঃখের কারণ বুঝে বললাম—"চা জলখাবারটা অফিসেই ত আনিয়ে খেতে পারতেন বঙ্কুবাবু।"

"আনিয়ে খেতে পারতাম!" আমার কথা শেষ হতে না হতে বঙ্কুবাবু চিঁড়বিড়িয়ে উঠলেন— "ক্যান্টিনে সকলের ওপর কি হুকুম হয়ে গেছে জানেন? অফিসে আমাকে একটা বিস্কুটের টুকরোও কেউ যেন না এনে দেয়। আপনাদের সরকার সাহেব আমায়

boiRboi.net

মানুষ বলে গণ্য করেন না, জানেন ছোটবাবু? আমি ওঁর কাছে একটা কুকুর বেড়ালের অধম। এই যে সই করাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি, কতক্ষণ এ ভোগান্তি হবে বলুন ত!"

"আর ভোগান্তির দরকার নেই।"—আমি হেসে আশ্বাস দিয়ে বললাম—"আপনি অনায়াসে আমার সঙ্গে ক্যান্টিনে আসতে পারেন।"

"ক্যান্টিনে যাব? আপনার সঙ্গে?"—বঙ্কুবাবুর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেই, আবার যেন অন্ধকার হয়ে গেল—"কিন্তু সরকার সাহেব!"

"সরকার সাহেবের জন্যে কোনো ভাবনা নেই।"—আমি বেশ জোর দিয়ে জানালাম—"ওঁরা যে গবেষণায় ডুবেছেন তা থেকে আজ রাত পর্যন্ত উঠতে পারবেন বলে মনে হয় না।"

"ঠিক বলছেন?"—বঙ্কুবাবু উৎসুকভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে মনের ভাবটা যেন বোঝবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমায় বকুনি খাওয়াবার ফিকির করছেন না ত?"

"না, না।"—একটু ধমকের সুরেই এবার বললাম—"আপনাকে মিছিমিছি বকুনি খাইয়ে আমার লাভ কি? বকুনির চেয়ে ভালো কিছু খাওয়াবার জন্যেই ক্যান্টিনে নিয়ে যাচ্ছি।"

বঙ্কুবাবুর মুখ দেখে মনে হল, পারলে সিড়িঙ্গে বকের মত চেহারা নিয়েই তিনি নৃত্য করতেন। তার বদলে গলাটা আরো তীক্ষ্ণ করে তাঁর উল্লাসটা প্রকাশ করে বললেন—"ব্যস। রাত পর্যন্ত যদি খোঁজ করবার সময় না পায় তা হলে কাল আমাকে পাচ্ছে কোথায়?"

"কেন বলুন ত?" একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।

"বাঃ! কাল ছুটির দিন না!"—বঙ্কুবাবু সরকার সাহেবের ওপর যেন এক হাত নেওয়ার মত করে জানালেন—"সরকার সাহেবের ত্রিসীমানার আমি থাকব মনে করেছেন?"

"কাল আপনার ছুটির দিন!"—এ খবরটায় অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললাম—"তা হলে আমার সঙ্গে একটা কাজে আপনাকে থাকতে হবে।"

"কি কাজ?"—বঙ্কুবাবু একটু যেন সন্দিগ্ধ হয়ে রাস্তার ওপর থেমে পড়লেন। ক্যান্টিনে খাওয়াতে চাওয়াটা কি ধরনের টোপ তাই বোধহয় তখন তিনি বোঝবার চেষ্টা করছেন।

"শক্ত কিছু নয়।"—তাড়াতাড়ি আশ্বাস দিয়ে বললাম—"চলুন ক্যান্টিনে বসেই বলব।"

ছয়

ক্যান্টিনে বসে খাওয়াতে খাওয়াতেই বঙ্কুবাবুকে আমর মতলবটা জানালাম।

বঙ্কুবাবু ও সেই সঙ্গে আমার দুজনেরই ভাগ্য সেদিন ভালো। এ ক'দিন ক্ষ্যাপা হাতীর ভয়ে দূরের রেলঘাঁটি গগনপোষ থেকে জিনিষপত্র আমদানী বন্ধ থাকায় ক্যান্টিনে একটু টানাটানি করে চালাতে হচ্ছিল। কতদিন হাতীর উপদ্রবে রাস্তাঘাট বন্ধ থাকবে তার ত ঠিক নেই। মালপত্র একবার ফুরালে মাথা খুঁড়লেও আর পাওয়া যাবে না। যত দিন যাচ্ছিল, ক্যান্টিনের কর্তা ছোটেলাল তাই ততই খাবারদাবারের বেলা হাত গুটিয়ে নিচ্ছিল বাধ্য হয়ে।

pathagar.net

সেদিন ক্ষ্যাপা হাতীর ভয় ঘুচে যাবার দরুন ছোটেলাল একেবারে দরাজ হাতে অনেক কিছু খাবার বানিয়ে ফেলেছে।

বঙ্কুবাবুকে চায়ের সঙ্গে প্লেট ভর্তি করে সিঙাড়া কচুরি পানতুয়া শুধু নয়, তার সঙ্গে টিন খুলিয়ে সসেজও ভাজিয়ে দিয়েছি।

এই সব চর্বচোষ্যের সদ্ব্যবহার করতে করতে আমার প্রস্তাবটা শুনে বঙ্কুবাবু প্রথমটা কেমন একটু বিমূঢ়ই হলেন মনে হল। যার জন্যে এত ঘুষ, সে কাজটা বেশ গোলমেলে কিছু বলে তিনি নিশ্চয় আশঙ্কা করেছিলেন।

তার বদলে আমার সঙ্গে শুধু একটু আদিবাসীদের দূরের পাহাড়ী গাঁয়ে টহল দিতে যাওয়া! সে যাওয়াও আবার নিতান্ত নীরস বেকার হয়রানী নয়। সঙ্গের রসদ হিসেবে ছোটেলালকে স্যাণ্ডউইচ, সসেজ ইত্যাদি যে পরিমাণ প্যাক করে রাখতে বললাম, তাতে বঙ্কুবাবু ব্যাপারটা সামান্য একটু দেরীতে বুঝে বিস্ফারিত চোখে আমার জয়ধ্বনি কোনো রকমে যেন গলায় চেপে রাখলেন।

তাঁর রাজী হওয়াটা মুখের ভাষায় আর আমায় জানতে হল না।

আদিবাসী পিয়নটি যেখানে মারা গেছে, দূরের সেই জংলা পাহাড়ে পরের দিন যখন পৌঁছালাম তখন বেলা প্রায় দশটা। ভোর পাঁচটার আগে লোধমা থেকে বেরিয়ে মাঝে আধঘণ্টা শুধু সঙ্গের ফ্লাস্ক ও ঝোলার চা জলখাবার খাওয়ার জন্যে এক জায়গায় বিশ্রাম করেছি। তার মানে পাক্কা সাড়ে চার ঘণ্টা সমানে আমাদের হাঁটতে হয়েছে। সময়টা কম নয়, কিন্তু সঙ্গে পথ দেখাবার জন্যে বঙ্কুবাবু না থাকলে এর ডবল হেঁটেও জায়গাটায় এসে পৌঁছাতে পারতাম কি না সন্দেহ।

বঙ্কুবাবুকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যে কত বড় সৌভাগ্য, রওনা হবার পরেই বুঝতে পেরেছি। এ অঞ্চলে ট্যাঙ্গস ট্যাঙ্গস করে বেড়ানই বঙ্কুবাবুর কাজ শুধু নয়, বাতিকও। এ বেয়াড়া বেপোট পাহাড় জঙ্গলের অন্ধিসন্ধি আদিবাসীরাও তাঁর মত জানে কি না সন্দেহ। গোড়াতেই সোজা জানা রাস্তায় না গিয়ে যে পথ ধরে তিনি লোধমা পাহাড় থেকে আমায় নামালেন, সেটা কোনো রকম রাস্তাই নয়। প্রায় অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা গরু-ছাগলের পায়ে গড়ে ওঠা একটা টানা দাগ মাত্র। কিন্তু প্রায় পাঁচ মাইল দূরত্ব বাঁচাবার এটাই নাকি একটা অজানা পাকদণ্ডী।

এ রকম সর্টকাট বঙ্কুবাবুর পুঁজিতে আরো অনেক আছে। এই বিশেষ গুণপনার কথা জানা না থাকলেও আগের দিন বিকেলে মামাবাবুর ল্যাবরেটরীর তাঁবু থেকে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে সামনেই যখন বঙ্কুবাবুকে দেখি তখনি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে তাঁকে একেবারে আদর্শ সহায় বলে বুঝতে পেরেছিলাম। যে কাজ আমি করতে যাচ্ছি, তার জন্যে মন্ত্রগুপ্তিটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। সে দিক দিয়ে বঙ্কুবাবুর মত নিরাপদ নির্বোধ অথচ আমার যেটুকু দরকার সে দিক দিয়ে তখোড় লোক সমস্ত লোধমা পাহাড়ে আর কাকে পেতাম!

শুধু এ অঞ্চলের ওয়াকিবহাল পথের দিশারী হিসেবেই বঙ্কুবাবুর সঙ্গ মূল্যবান নয়, তাঁর একটা বিশেষ 'পয়'ও আছে দেখলাম।

pathagar.net

আদিবাসী পিয়নের খুন হবার জায়গাটা একবার স্বচক্ষে দেখে যেতে এসে সেদিন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এমন কিছু একটা দেখবার ও জানবার সুযোগ হল, এ ধান্দায় আসার সময় যা সত্যি কল্পনাও করতে পারিনি।

দেখালেন আবার বঙ্কুবাবুই।

বেশ একটু বেয়াড়া চড়াই ভেঙে তখন আদিবাসীদের বসতির জংলা পাহাড়ের মাথার উপত্যকাটায় পৌঁছেছি। চারিদিকে অত্যন্ত ঘন শাল শিশু কেন্দু বহেড়ার বন।

তারই ভেতর দিয়ে বড় বড় পাথুরে ঢিবির পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বঙ্কুবাবু সামনে থেমে গিয়ে হাত নেড়ে আমায় পা বাড়াতে নিষেধ করেছেন।

তারপর উত্তেজিত চাপা গলায় পিছু ফিরে বলেছেন—"ওই ঢিবিটার আড়ালে থেকে দেখুন।"

সন্তর্পণে ঢিবিটার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার আড়াল থেকে দেখে সত্যিই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছি।

যেখানে পাথুরে ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে দূরের পাহাড়ী প্রান্তরে একটা লোককে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখলাম। মানুষটি মাটির ওপর উবু হয়ে বসে কি যেন করছে। কি করছে এতদূর থেকে তা বোঝা না গেলেও মানুষটাকে নিজের কাজে তন্ময় বলেই মনে হল।

লোকটি আমাদের দিকে পিছু ফিরেই বসে ছিল, কিন্তু তাতেও তাকে চেনবার জন্যে দূরবীন তুলবার দরকার হল না।

চেহারা পোষাকের আদল থেকেই লোকটির পরিচয় তখন আমি নির্ভুল ভাবে বুঝে ফেলেছি। বোঝবার বিশেষ কারণ এই যে আগের দিন মামাবাবুর কাছে ক'টি অদ্ভুত খবর শোনবার পর থেকে এই লোকটির কথাই সারাক্ষণ ভাবছিলাম।

হ্যাঁ, মামাবাবুর কাছে যাঁর নাম শুনে অজান্তেই চমকে ওঠবার কারণটা গতকাল প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি, ইনি সেই নাগাপ্পা।

পুরো একটা দিন মনের মধ্যে তোলাপাড়া করে নাগাপ্পা সম্বন্ধে বেশ কিছু রহস্যের খেই তখন পেয়ে গেছি।

লোধমা পাহাড় থেকে দূরবীনে আদিবাসীদের করালী পাহাড়ে সেদিন যে এই নাগাপ্পাকেই উঠতে দেখেছিলাম এ বিষয়ে আমার মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই।

শুধু এই একটা ব্যাপারই নয়, নাগাপ্পার গতিবিধির মধ্যে সন্দেহজনক আরো কিছু আছে।

প্রথম দিন করালী পাহাড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াটাই ত অদ্ভুত। আমি না হয় খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে যাওয়ায় দরুণ ক্ষ্যাপা হাতীর খবর আর লোধমা পাহাড় থেকে কোথাও যাবার নিষেধের কথা জানতে পারিনি, কিন্তু নাগাপ্পা ত এ খবর আগের রাত্রেই পেয়েছেন। মহান্তী লোধমার সব ছাউনিতেই ত ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

নাগাপ্পা সে নিষেধ অমান্য করে পরের দিন সকালেই তাহলে বার হয়েছিলেন কেন?

pathagar.net

তাঁর সঙ্গে সেদিন যখন দেখা হয় তখন তিনি নিজের ছাউনিতে ফিরছেন। তার মানে আমার চেয়েও ভোরে তিনি লোধমা পাহাড় থেকে বেরিয়েছিলেন। মহান্তীর নিষেধ এভাবে অমান্য করে অত ভোরে বেরিয়ে যাবার কারণটা কি!

দেখা হবার পর তাঁর আর একটা ব্যবহারও অদ্ভুত। তিনি আদিবাসীদের এঞ্জা পাহাড়ের পরিচয় দিয়ে সেখানে ওঠা সম্বন্ধে আমায় সাবধান করেছিলেন, কিন্তু ক্ষ্যাপা হাতীর ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও ত আমায় জানান নি!

নাগাপ্পা সম্বন্ধে এত কথা সে মুহূর্তে অবশ্য ভাবিনি।

অত তন্ময় হয়ে নাগাপ্পা কি করছেন সেইটেই তখন গভীর কৌতূহলের বিষয়।

আমাদের এখন কি করা উচিত সেটাও ঠিক করতে পারছিলাম না।

সোজাসুজি এগিয়ে গিয়ে নাগাপ্পার সামনে হাজির হবার বাধা কিছু নেই।

নাগাপ্পা যদি আসতে পেরে থাকেন তা হলে আমরাই বা এ পাহাড়ে টহল দিতে আসতে পারব না কেন? সোজা গিয়ে দেখা দিয়ে নাগাপ্পা কি করছেন জিজ্ঞাসাও করা যায়।

নাগাপ্পা তা হলে কি করবেন?

যা তিনি করছেন তা খুব প্রাণ খুলে জানাবার কাজ নিশ্চয় নয়। সুতরাং আমাদের দেখতে পেয়ে খুব খুশী বোধহয় তিনি হবেন না।

কিন্তু অসন্তোষটা কি চেহারা নেবে তারপর?

বেশ একটু অসুবিধেয় পড়লেও একটা কিছু ঝুটো কৈফিয়ত দিয়ে তিনি ব্যাপারটা নির্দোষ বলে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন কি? তা করা-ই সম্ভব।

তা যদি করেন তাহলে লোকসান কিছু নেই। তাঁর কৈফিয়তটা মেনে নেবার ভান করে আমরা আসল রহস্যটা তারপর সন্ধান করবার চেষ্টা করতে পারি।

কিন্তু নাগাপ্পার প্রতিক্রিয়াটা গোড়াতেই সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

ছোটখাট অপরাধ নয়, রীতিমত একটা মানুষ খুনের ব্যাপার। সে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটাকে চাপা দিয়ে একটা দৈব দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেবার যে কৌশল করা হয়েছে তার ভেতরে দারুণ শয়তানী বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

এ সব কাণ্ডকারখানার সঙ্গে নাগাপ্পার সত্যিই যদি গোপন সংস্রব থাকে তা হলে তিনি এ জায়গায় আমাদের হঠাৎ উদয় হতে দেখে শুধু একটু মিথ্যে কৈফিয়ত দিয়ে সাধু সাজবার চেষ্টা নাও করতে পারেন।

এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর অবশ্য আর নেই। এ সময়ে এখানে তাঁর লুকিয়ে আসা-ই তার প্রমাণ।

এ অবস্থায় তাঁর গোপন কাণ্ডকারখানার অবাঞ্ছিত সাক্ষী হিসেবে আমাদের সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থার কথা তাঁর মনে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

আমরা গুনতিতে দুজন। কিন্তু দুজনেই নিরস্ত্র, তার ওপর বঙ্কুবাবু ত যাকে বলে একেবারে শূন্য—সহায়ের বদলে দায়।

নাগাপ্পার মত মানুষ এখানে শুধু হাতে নিশ্চয় আসেন নি। তাছাড়া হাতে একবার খুনের রক্ত যার লাগে, দ্বিতীয়বার সে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে বলেই জানি। আদিবাসী

pathagar.net

চাপরাসীর থেঁতলানো দেহটা যেখানে পাওয়া গেছে তারই কাছাকাছি আর দুটো লাশ রেখে দিয়ে যেতে নাগাপ্পার মত মানুষের দ্বিধা সঙ্কোচ খুব বেশী সুতরাং হবে না।

আমাদের মত দুটো বেয়াড়া সাক্ষীর মুখ চিরকালের মত বন্ধ করে দেওয়ার এমন সুযোগই বা নাগাপ্পা ছাড়বেন কেন?

এই নির্জন পাহাড়ে কোথায় কি হচ্ছে কেউ দেখবার নেই। পিস্তল ছুঁড়ে যদি কেউ আমাদের খতম করে তার শব্দটা পর্যন্ত পাহাড়ের এ ঢাল ছাড়িয়ে ওদিকের আদিবাসীদের গ্রামটা পর্যন্ত পৌঁছাবে না।

মনে মনে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই এতগুলো যুক্তি সাজিয়েও নিজেকে সামলানো শক্ত হয়ে উঠল।

এত বড়ো একটা সুযোগ পেয়েও নাগাপ্পাকে শুধু দূর থেকে লক্ষ করে সন্তুষ্ট থাকতে পারলাম না। সামনা সামনি গিয়ে উপস্থিত না হই, নাগাপ্পা অত তন্ময় হয়ে কি করছেন আরো একটু কাছে গিয়ে লুকিয়ে না দেখাটা লজ্জাকর কাপুরুষতা বলে মনে হল।

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বঙ্কুবাবুকে নীরব থাকবার ইসারা করে পাথুরে ঢিবিগুলোর পাশ দিয়ে গুঁড়ি মেরে দু পা-র বেশী কিন্তু এগুতে পারলাম না।

পেছন থেকে লম্বা সিড়িঙ্গে হাত বাড়িয়ে বঙ্কুবাবু আমার একটা পা তখন ধরে ফেলেছেন। চমকে ফিরে তাকিয়ে তাঁর মুখ চোখের যে চেহারা দেখলাম তা ভোলবার নয়!

সেখানে করুণ মিনতি, না হতাশ আতঙ্ক, না আমার আহম্মকিতে অক্ষম রাগ, কোনটা ফুটে উঠেছে বোঝা শক্ত। সব ক'টা ভাবই বোধহয় একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

বঙ্কুবাবু অমন করে ধরে ফেলায় চমকে ওঠার সঙ্গে বেশ একটু গরমই প্রথমে হয়ে উঠেছিলাম। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই তিনি কত বড় উপকার যে করেছেন তা টের পেলাম।

পাথুরে ঢিবির আড়ালেই তখনো দুজনে আছি। বঙ্কুবাবুর ধরা, আর আমার দু পা গিয়ে ফিরে দাঁড়ানতে নীচের শুকনো ঝরা পাতায় শব্দ যা হয়েছে তা নামমাত্রই বলা উচিত।

কিন্তু নাগাপ্পা শয়তান গোছের মানুষ বলেই বোধ হয় তাঁর কান শিকারীর মত সজাগ।

দুটো বড় পাথুরে ঢিবি আর তার সামনের একটা চারা শাল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নাগাপ্পাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখলাম ওই সামান্য শব্দেই তিনি হুঁসিয়ার হয়ে ফিরে বসেছেন। শুধু ফিরে বসেন নি, ডান হাতটাও তাঁর আমাদের এই পাথুরে ঢিবিগুলোর দিকেই তোলা। ভালো করে এত দূর থেকে দেখা না গেলেও তাতে একটা পিস্তলই ধরা আছে বুঝলাম।

পাথুরে ঢিবি দুটোর আড়ালে সামনের ঝোপগুলোর ভেতর দিয়ে আমাদের দেখতে পাওয়া নাগাপ্পার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। তিনি শুধু শুকনো পাতার ওপর আমাদের ক্ষণিকের নড়াচড়ার শব্দই পেয়েছেন, কিন্তু তা হলে অতটা অস্থির হয়ে তাঁর পিস্তল উঁচিয়ে ধরাটাই বেশ একটু অস্বাভাবিক নিশ্চয়। শুধু বন্য কোনো জন্তুর ভয়েই কি এই উত্তেজিত হুঁসিয়ারী? সে কথা বিশ্বাস করা শক্ত। এসব অঞ্চলে হিংস্র শ্বাপদ নেই এমন নয়। কেঁদো না হোক, চিতা আর ভালুকের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। এখন সব কিছু উল্টে গেলেও প্রথমে সেই শিকারের লোভেই ত এখানে এসেছিলাম।

কিন্তু সে সব শিকারের জানোয়ারের ত এই দুপুর বেলায় এ রকম পাহাড়ের মাথায় হানা দিতে আসা প্রায় অসম্ভব। নাগাপ্পার অমন সজাগ সর্তকতার লক্ষ্য অন্য কিছু বলেই তাই মনে হল।

অনুমানে যে ভুল হয়নি তৎক্ষণাৎ তার অস্বস্তিকর প্রমাণ পেলাম। নাগাপ্পা হঠাৎ উঠে পড়ে হিংস্র শ্বাপদের তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়েই সন্তর্পণে এক-পা এক-পা করে আমাদের ঢিবিটার দিকেই এগিয়ে আসতে শুরু করলেন। পিস্তলটা ডান হাতে আগের মতই উঁচান।

আমাদের অবস্থা তখন যে কি তা বোঝান শক্ত। কি যে করা উচিত তা ঠিক করতে না পেরে অস্থির যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তে তখন অসহ্য হয়ে উঠছে।

যেভাবে নাগাপ্পা এগিয়ে আসছেন তাতে মিনিট পাঁচেক বাদেই ত আমাদের ঢিবিটার কাছে পৌঁছে যাবেন।

ততক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে এখানে লুকিয়ে থাকব, না ছুটে পালাব এখনি?

পিস্তলের লক্ষ্যভেদ খুব শক্ত বলে জানি। সেই ভরসায় এখনি ছুটে পালালে হয়ত গুলি খেয়ে মরার পরিণামটা এড়াতে পারি।

কিন্তু সত্যিই কি নাগাপ্পা আমাদের মারতে পিস্তল ছুঁড়বেন? সভ্য জগতের মানুষ হয়ে সে কথাটা মন সহজে বিশ্বাস করতেই চায় না। ছুটে পালান বা চুপ করে লুকিয়ে থাকার বদলে এখনি উঠে দাঁড়িয়ে নাগাপ্পাকে দেখা দেবার কথাও তাই একবার মনে হল। বঙ্কুবাবুর দিকে ফিরে তাঁর মনের অবস্থাটা অনুমান করবার চেষ্টা করলাম। চোখের আর হাতের ইসারায়, উঠে দাঁড়িয়ে দেখা দেবার প্রস্তাবটাও চাইলাম তাঁকে বোঝাতে।

বুঝতে পারুন বা না পারুন তিনি হাত নাড়ার ইঙ্গিতে অত্যন্ত কড়াভাবে যেমন আছি তেমনি নিঃশব্দে অপেক্ষা করতেই বললেন বলে মনে হল।

বোকাসোকা পেটুক ভালোমানুষ হলে কি হয়, বঙ্কুবাবুর ভেতরের চোখ যে আমার চেয়ে তীক্ষ্ণ পরমূহূর্তেই তার প্রমাণ পেলাম। তাঁর বারণ না মানলে এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত সেদিনই হয়ে যেত এটুকু এখন বলতে পারি।

উঠে দেখা দেওয়া বা ছুটে পালান, দুটোর কোনোটাই না করে পাথুরে ঢিবির ফাঁক দিয়ে তখন নাগাপ্পাকে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে লক্ষ করছি।

নাগাপ্পা আরো কয়েকটা পা এগিয়ে এলেই আমাদের দেখতে পাবেন এইটেই তখন ভয়।

কিন্তু নাগাপ্পা আচমকা যা করে বসলেন সেইটেই অপ্রত্যাশিত। এগিয়ে আসতে আসতে নাগাপ্পা হঠাৎ পিস্তলটা ছুঁড়ে বসবেন এটা সত্যিই ভাবতে পারিনি।

একবার নয় দু-দুবার নাগাপ্পা সামনের দিকে আমাদের ঢিবিটার মাথা ডিঙিয়েই পিস্তল ছুঁড়লেন। গুলিগুলো বৃথাই অবশ্য খরচ হল।

যা ভেবেছিলাম সেই মত হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে দেখা দিলে কি যে হত তা ভালোভাবেই অনুমান করে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে তখন নাগাপ্পার পরের গুলির জন্যে অপেক্ষা করছি।

নাগাপ্পা কিন্তু আর গুলি ছুঁড়লেন না, এগিয়েও এলেন না আর আমাদের দিকে। যেভাবে খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সামনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে তিনি আবার

আগেকার জায়গায় ফিরে গেলেন তাতে আগের সন্দেহটা ভুল বলেই তিনি বুঝছেন বলে মনে হল।

নাগাপ্পা ফিরে যাওয়ায় তখনকার মত হাঁফ ছেড়ে অবশ্য বাঁচলাম, কিন্তু সেদিনকার বিপদ সবে যে তখন শুরু তা কি জানি!

নাগাপ্পা ফিরে গিয়ে আর সে জায়গায় বসলেন না। মাটিতে যে একটা ঝোলা গোছের পড়ে ছিল, এতক্ষণ তা দেখতে পাইনি। সেটার মধ্যে নীচে থেকে কি যেন দু-একটা জিনিষ ভরে নিয়ে ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নাগাপ্পা সামনের দিকে জংলা পাহাড়ের উল্টো দিকের আদিবাসীদের গাঁয়ের পথই ধরলেন।

নাগাপ্পা পাহাড়ের মাথা পেরিয়ে অন্য দিকের ঢালে একেবারে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত একেবারে নিস্পন্দ নীরব হয়ে রইলাম।

চলে যাবার সময় একটিবারও আমাদের দিকে ফিরে না তাকানতে নাগাপ্পার মনের সন্দেহ দূর হয়ে গেছে বলে বুঝেছিলাম, তবু সাবধানের মার নেই। নাগাপ্পা পাহাড়ের ওপিঠে নেমে যাবার পরও বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে তারপর সন্তর্পণে সামনের দিকে পা বাড়ালাম।

নাগাপ্পা অত তন্ময় হয়ে কি করছিলেন সেইটেই জানবার চেষ্টা করতে হবে।

জায়গাটায় পৌঁছে কিন্তু হতাশই হলাম। পাহাড়ী মেঠো জমি বেশ শক্ত মাটির ওপর এখানে শাল, কেঁদু, বহেড়া বা অন্য বুনো কাঁটা গাছের চারার ছোটখাট সব ঝোপ। খানিকটা দূরেই পাহাড়তলীর রাস্তার সেই জায়গাটা যেখানে আদিবাসীর থেঁতলানো লাশ পাওয়া গেছে। আদিবাসীদের সেখানে পোঁতা একটা লম্বা খুঁটির গায়ে বিদঘুটে মুখ-আঁকা একটা মাটির হাঁড়ি ঝুলিয়ে রাখার দরুনই জায়গাটা চিনতে পারলাম। বিদঘুটে মুখ আঁকা হাঁড়িটা ঝোলান হয়েছে ভূতপ্রেত তাড়াবার জন্যে। উপদ্রবটা ক্ষ্যাপা হাতীর বা যারই হোক তার পেছনে ভূত-প্রেতের হাত থাকতে বাধ্য এই তাদের বিশ্বাস।

বিদঘুটে মুখ আঁকা হাঁড়িটা যেখানে ঝোলান সেখানকার বদলে এ জায়গায় নাগাপ্পা কি করছিলেন প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর শক্ত লালচে মাটির ওপর একটু যেন কি ঘষার দাগ পেলাম। মাটির ওপর থেকে কোনো কিছু চেঁচে নিলে যেরকম দাগ পড়ে অনেকটা সেই রকম।

বঙ্কুবাবুই সে দাগটা প্রথম লক্ষ করে দেখিয়ে দিলেন। উৎসাহভরে আমার পাশেই বসে পড়ে বললেন,—"নাগাপ্পা কি করছিলেন, বুঝেছেন এবার? কি একটা এখান থেকে চেঁচে তুলছিলেন। এই ত ঘষার দাগ।"

"তা ত বুঝলাম।" গোয়েন্দাগিরিতে বঙ্কুবাবুর কাছে হার মেনে আপনা থেকেই একটু রুক্ষস্বরে বললাম—"কিন্তু চেঁচে তুলছিলেন কি? লোকটা মরল ওই রাস্তায়, এখানে তার কি প্রমাণ ছিল যে সরাচ্ছিলেন!"

কি সরাচ্ছিলেন তাও বঙ্কুবাবুরই প্রথম চোখে পড়ল। একটা কাঁটা গাছের তলায় ছোট একটা যেন গোবরের ডেলা পড়েছিল, আগে দেখতে পাই নি। বঙ্কুবাবু সেইটে একটা কাঠি দিয়ে টেনে এনে সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন—"এই জিনিষ নয় ত?"

"জিনিষটা কি?"— অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"গোবরের মত দেখাচ্ছে!"

pathagar.net

"না, গোবর নয়!" বঙ্কুবাবু এবার জোর দিয়ে বললেন—"তবে অন্য কোনো জানোয়ারের বিষ্ঠাই মনে হচ্ছে। একটা টুকরো শুধু পড়ে আছে।"

"নাগাপ্পা এই জিনিস অত তন্ময় হয়ে চেঁচে তুলছিলেন?" আমি অবাক হয়ে বঙ্কুবাবু দিকে তাকালাম—"আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।"

"বিশ্বাস ত আমারও হচ্ছে না।" বঙ্কুবাবু আমার কথার সায় না দিয়ে পারলেন না—"কিন্তু এখানে ত যত্ন করে নেবার মত আর কিছুই দেখছি না।"

"এখন আর দেখবেন কি করে!"—আমি ঠাট্টার সুরে বললাম—"যা ছিল তা ত নাগাপ্পা তুলে নিয়ে গেছেন। তবে জায়গাটা ভালো করে একটু খুঁজে দেখা দরকার।"

খোঁজ করতে গিয়ে ওরকম একটা মোক্ষম নিদর্শন পেয়ে যাব তা অবশ্য কল্পনাও করিনি।

এবারে আর বঙ্কুবাবু নয়, আবিষ্কর্তা আমি নিজেই।

প্রথমে নাগাপ্পা যে জায়গাটায় বসেছিলেন সেখানটা বেশ তন্ন তন্ন করে দেখে আদিবাসী পিয়নের লাশ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল পাহাড়ী রাস্তার সেই অংশটাও পরীক্ষা করেছিলাম।

কয়েকদিন আগের ঘটনা। পাহাড়ী ডাঙায় বা রাস্তায় সে বীভৎস ব্যাপারের কোনো চিহ্নই এখন আর নেই। পাহাড়ের ওপর বেলা বাড়ার সঙ্গে রোদে ঝলমল করছে চারিদিক, তারই সঙ্গে চারিদিকের বনে যে হাওয়ার মর্মর শোনা যাচ্ছে তা মিলে এমন একটা শান্ত মধুর পরিবেশ গড়ে তুলেছে যে এ পবিত্র জায়গায় অমন একটা পৈশাচিক ব্যাপার কখনো ঘটতে পারে বলেই বিশ্বাস হয় না।

খুনের জায়গাটা দেখবার পর থেকেই বঙ্কুবাবু বাড়ী ফেরার জন্যে তাগাদা দিচ্ছিলেন। দুপুরের খ্যাঁটটার দেরী হয়ে যাবার দুর্ভাবনাতেই তাঁর এই তাড়া বুঝেছি। তাড়ার আসল কারণটা ওই হলে তাঁর যুক্তিটা খুব অগ্রাহ্য করবার নয়।

"যা দেখবার তা ত দেখলেন,"—বেশ একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলেছেন বঙ্কুবাবু—"খুনের খেই পেতে সারা জঙ্গলটাই খুঁজতে হবে নাকি!"

মুখে কিছু জবাব না দিয়ে প্রায় সেই আজগুবী কাণ্ডটাই করেছি, আর তাইতেই পেয়ে গেছি সেই আশাতীত খেইটা। পেয়েছি অবশ্য একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায়।

সাত

বঙ্কুবাবুকে বিরক্তমুখে পাহাড়ী রাস্তাটার ধারেই বসিয়ে রেখে আশপাশের জঙ্গলটা অকারণেই ঘুরে দেখছিলাম। কাজটা যে আহাম্মকের মত হচ্ছে সেটা যে একেবারে বুঝিনি তা নয়। কিন্তু বনের ভেতর ঢুকে পড়ে পা দুটো যেন আপনা থেকেই সামনে চলে যাচ্ছিল।

বেশ কিছুটা ওইভাবে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখবার মত কিছুই অবশ্য পাইনি। আর দেরী করলে বঙ্কুবাবু হয়ত ক্ষিদের জ্বালায় রাগ করে একলাই রওনা দেবেন ভেবে ফিরতে গিয়ে হঠাৎ পা হড়কে একটা গর্তের মধ্যেই পড়ে গেলাম।

pathagar.net

এখানটা জঙ্গল বেশ গভীর। তলায় শুকনো পাতা এমন ঘন হয়ে জমে আছে যে মাটি দেখাই যায় না। পা-টা একটা গোল কাটা ডালের ওপর পড়ে হড়কে যাবার পর যে গর্তটার মধ্যে চলে গিয়েছিল ওপর থেকে তার অস্তিত্ব টেরই পাওয়া যায়নি।

অমন বেকায়দায় পড়ে গিয়েও পা-টা ভাঙেনি তারি জন্যে ভাগ্যের ওপর কৃতজ্ঞ হয়ে আবার দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে নিজের জুতোটার দিকে নজর দিয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

পায়ে গোড়ালী-আঁটা স্যাণ্ডাল পরা ছিল।

পায়ে আর জুতোয় ওটা কি লেগে?

এ ত কিসের ছাই দেখা যাচ্ছে। এখানে এই জঙ্গলের ঠিক একটি জায়গায় এরকম ছাই থাকার মানে কি? কাছেপিঠে কেউ কোথায় আগুন জ্বালিয়েছে বা রাঁধাবাড়া করেছে এমন কোনো চিহ্ন নেই।

ওপরে নয়, ছাইটা এমন একটা গর্তের ভেতরেই বা চাপা দেওয়া কেন?

যেভাবে গর্তের ভেতর রেখে ওপরে শুকনো ঝরাপাতা দেওয়া হয়েছে, তাতে লুকোবার চেষ্টাটা অত্যন্ত স্পষ্ট।

গর্তের ভেতর ছাইয়ের সঙ্গে আর কি আছে দেখবার জন্যে সেখানে বসতে গিয়ে শুকনো পাতার ওপর পায়ের শব্দে চমকে সেদিকে তাকালাম।

না, ভয় পাবার মত কেউ নয়। আমার দেরী দেখে ধৈর্য ধরতে না পেরে বঙ্কুবাবুই বকের মত লম্বা ঠ্যাং চালিয়ে খুঁজতে এসেছেন।

ক্ষিদের জ্বালায়, অধৈর্যে আর আমার বিরুদ্ধে অক্ষম রাগে তাঁর মুখখানার চেহারা যা হয়েছে তা অন্য কারুর হলে ভয় পাবার মতই বলতাম, কিন্তু বঙ্কুবাবুর বেলা তাতে হাসিই পেল।

কাছে এসে প্রায় জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার আমার আর একবার সামনের গর্তটার দিকে চেয়ে বঙ্কুবাবু তাঁর মেয়েলি সরু গলাটাকে যেন আরো তীক্ষ্ণ ছুঁচোল করে তাঁর অভিমান আর অভিযোগটা প্রকাশ করলেন—"আমায় এমনি করে জব্দ করার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছেন? আমায় একলা ফেলে রেখে এসে আপনি খেলা করছেন এখানে!"

"খেলা নয় বঙ্কুবাবু, খেলা নয়"—বঙ্কুবাবুর গলার স্বরে আর বলার ধরনে হেসে ফেলেও তাঁকে ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—"এই গর্তটায় কি পেয়েছি দেখছেন? ছাই।"

"ছাই!"—আমি যেন তাঁর সঙ্গে পরিহাস করছি এমনিভাবে কথাটা নিয়ে বঙ্কুবাবু আরো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন—"আমি না হয় মুখ্খু হাঁদা গাঁইয়া, কিন্তু দুটো ভালো মন্দ মাঝেসাঝে খাওয়ান বলে আমার সঙ্গে এরকম তামাসা করাটা কি উচিত, ছোটবাবু? গর্তে ছাই আছে ত আমাদের কি!"

বঙ্কুবাবু যত রাগেন তাঁর চেহারা আর গলা তত হাস্যকর হয়ে ওঠে। এবার কিন্তু হাসি সামলে গম্ভীর হয়েই তাঁকে ব্যাপারটা বোঝাতে ব্যস্ত হলাম। নীচে থেকে খানিকটা ছাই হাতে তুলে নিয়ে বললাম—"ও ছাইয়ের মধ্যে কি দারুণ রহস্যের ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে তা এখনো বুঝতে পারছেন না? ভালো করে চারিদিকে চেয়ে দেখুন। কোথাও আগুন জ্বালার কোনো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন কি?"

আমার দিকে যেভাবে বঙ্কুবাবু চাইলেন তাতে মনে হল আমার মাথা কতখানি খারাপ হয়েছে তা-ই যেন তিনি আঁচ করবার চেষ্টা করছেন। মুখে শুধু একটু বিস্মিত প্রশ্নই করলেন—"আগুন না হলে ছাই এল কোথা থেকে?"

"ঠিক ধরেছেন!"—আমি উৎসাহভরে উঠে দাঁড়ালাম—"ছাই যখন রয়েছে তখন আগুন নিশ্চয়ই জ্বালা হয়েছিল। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন নেই কেন?"

বঙ্কুবাবুকে বোঝাবার নামে নিজের কাছেই যুক্তিগুলো ভালো করে সাজাবার চেষ্টা করে বললাম—"আদিবাসীরা পাহাড়ে জঙ্গলে আগুন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া জ্বালে না। তারা সাধারণত পাহাড়ের জঙ্গল সাফ করবার জন্যে বা চাষের জন্যে জমি উদ্ধার করতে বছরে একবার চৈত্র বৈশাখ মাসে বনে আগুন লাগায়। এখন সে সময় নয়, আর সে আগুনের প্রমাণ খুঁজতে হয় না। এখানকার আদিবাসীদের পাহাড় জঙ্গলের যেখানে সেখানে রান্নার জন্যে এক বেলার উনুন পাতা দস্তুর নয়, আর সে উনুনও লুকোন থাকে না। এখানকার আগুনের কোনো চিহ্ন যখন নেই তখন নিশ্চয়ই তা জ্বেলে তারপর লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে।"

বঙ্কুবাবুর চোখে মুখেও অধৈর্য বিরক্তি কেটে গিয়ে তীব্র আগ্রহ ফুটে উঠতে দেখে একটু থেমে প্রায় নাটুকে সুরেই জিজ্ঞাসা করলাম—"লুকোবার কারণ কি?"

"খুনের ব্যাপারের নিদর্শন গোছের কিছু এখানে পুড়িয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলতে চাইছেন?"—বঙ্কুবাবু দু-চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকেই যেন ভেদ করার চেষ্টায় বললেন—"কিন্তু তাই যদি হয় তা হলেও প্রমাণ ত সব ছাই হয়ে গেছে। এখন আর ও ছাই কি কাজে লাগবে।"

"এখনো অনেক কাজে লাগতে পারে"—আমি জোর দিয়ে বললাম—"প্রথমতঃ এ গর্তটা থেকে ছাইয়ের সঙ্গে অন্য কিছুও হয়ত পাওয়া যেতে পারে। আর তা যদি না পাওয়া যায় তাহলে ওই ছাই কিসের জানতে পারলে এ খুনের ব্যাপারের একটা কোনো হদিস হয়ত মিলে যেতে পারে।"

আর কিছু বলতে হল না। আমার কথা শেষ হবার আগেই দেখি বঙ্কুবাবু গর্তের ধারে বসে পড়ে মুঠো মুঠো ছাই তুলে তাঁর পকেটে ভরছেন।

তাঁর আগেকার রাগ বিরক্তি দেখে যেমন, বঙ্কুবাবু এখনকার উৎসাহ দেখেও তেমনি হাসি পেল। সে হাসি চেপে "গর্তের সব ছাই-ই শুধু শুধু নিয়ে যাবার দরকার নেই" বলে তাঁকে থামাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার দরকার হল না।

বঙ্কুবাবু নিজেই হঠাৎ থেমে গিয়ে আমাকেই যেন সাবধান করার ভঙ্গীতে বললেন—"এ গর্ত এরকম ভাবে ঘাঁটা খুব অন্যায় হচ্ছে তা জানেন! আমাদের আনাড়ী হাতের ঘাঁটাঘাঁটিতে আসল যা প্রমাণ তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর কিছু সুতরাং ছোঁয়াও চলবে না।"

বঙ্কুবাবুর কথাটা ঠিক। তবু মনের খুঁতখুঁতনিটা প্রকাশ না করে পারলাম না—"কিন্তু গর্তের তলায় আর কিছু আছে কি না একটু দেখলে বোধ হয় ভালো হত।"

pathagar.net

বঙ্কুবাবু তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমার একটা হাত ধরে ফেলে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে যেতে যেতে বললেন—"না, তা ছাড়া এখানে আর দেরী করে নাগাপ্পার কাছে কি ধরা পড়তে চান? সে যে কোনো মুহূর্তে এই পথেই ফিরতে পারে তা ভেবে দেখেছেন?"

এ কথার ওপর সত্যিই আর বলবার কিছু পেলাম না। বেশ একটু সন্ত্রস্ত হয়েই বঙ্কুবাবুর সঙ্গে সে তল্লাট ছাড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পা চালালাম।

আট

বঙ্কুবাবুর একটা যুক্তি মেনে আদিবাসীদের পাহাড় থেকে নেমে এসেছিলাম, কিন্তু তাঁর আরেকটা পরামর্শ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়ার জন্যে নিজেদের লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে ফিরে অমন আফসোস সেদিন করতে হবে কল্পনাও করিনি।

বঙ্কুবাবুর সঙ্গে তাঁর জানা সর্ট-কাট-এ কিছুদূর নামবার পর এক জায়গায় সাধারণ ব্যবহারের পাহাড়ী রাস্তাটা সামনে পড়েছিল। সে রকম সম্ভাবনা হলেও দুজনে এক সঙ্গে যাতে নাগাপ্পার চোখে না পড়ি—তার জন্যে বঙ্কুবাবু আমায় সাধারণ রাস্তাটা ধরেই লোধমা পাহাড়ে ফিরে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি যা কারণ দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে তখন কোনো খুঁত পাইনি। তাঁর পরামর্শ নিয়ে তাই একা একাই লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে ফিরেছিলাম।

ছাউনিতে পৌঁছে প্রথমেই অবাক হয়েছিলাম বঙ্কুবাবু তখনো ফেরেন নি জেনে। তিনি যে সংক্ষিপ্ত পথ ধরে আসছেন তাতে তাঁর ত আমার আগে পৌঁছাবার কথা।

বিস্ময়টা শেষ পর্যন্ত ভয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্তও বঙ্কুবাবু না ফেরায়!

কাউকে কিছু তখনো জানাতে পারিনি। নিজেই খবর নিয়ে যা জেনেছি তাতে আতঙ্ক আরো বেড়েছে। শুধু বঙ্কুবাবুকেই নয়, লোধমা পাহাড়ে নাগাপ্পাকেও কেউ নাকি সারাদিন দেখেনি।

নাগাপ্পাকে তার পর দিন সকালে ফিরতে দেখেছি, কিন্তু বঙ্কুবাবু তখনো নিরুদ্দেশ। নেহাত বঙ্কুবাবুর মত মানুষ বলেই আমি ছাড়া কেউ বোধহয় তা লক্ষই করেনি।

পরের দিন বেলা দুপুর পর্যন্ত বঙ্কুবাবু যখন ফিরলেন না তখন রীতিমত অস্থির হয়ে উঠলাম। আমার ভয়টা শুধু নিজের মনের মধ্যে আর চেপে রাখতেও পারলাম না।

নিজেই একবার বঙ্কুবাবুর খোঁজ করতে যেতে পারতাম। সে কথা একবার ভেবেওছিলাম। কিন্তু তারপরই মনে হল ব্যাপারটা সম্ভবত অনেক বেশী গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু আমার নিজের ক্ষমতার ওপর ভরসা করে একলা কিছু করতে যাওয়া উচিত নয়।

মামাবাবু কিংবা তাঁর বদলে মহান্তীকে আগের দিন যা যা ঘটেছে তার বর্ণনা দিয়ে আমার অনুমান আর আশঙ্কাটা জানান দরকার বুঝেও বেশ কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে খুবেই অবশ্য তাঁদের খোঁজে গিয়েছি।

মামাবাবু কি ভাবে ব্যাপারটা নেবেন সেটা খানিকটা অনুমান করতে পারি বলেই এই অনিচ্ছা। এত বড় গুরুতর ব্যাপারটাকে সম্ভবত তিনি আমলই দেবেন না।

pathagar.net

"বঙ্কুবাবু নিরুদ্দেশ!"—বলে মিথ্যে আতঙ্কের ভান করে হয়ত শেষ পর্যন্ত হেসেই উঠে বলবেন—"খ্যাঁটের লোভে আদিবাসীদের গ্রামেই হয়ত লুকিয়ে আছে!"

মহান্তী কাছে থাকলে তাঁরও সে পরিহাসে যোগ দেওয়াটা বেশ কল্পনা করতে পারি।

সত্যি কথা বলতে গেলে বঙ্কুবাবুকে নিয়ে এ রকম অস্থির হওয়াটা একটু যে হাস্যকর দেখায় তা আমিও বুঝি। সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক মত না জানলে তাঁকে নিয়ে দুর্ভাবনাটা আজগুবী মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

সমস্ত ব্যাপারটা তাই মামাবাবু আর মহান্তীকে না জানালে নয়।

তার পরেও যদি তাঁরা নির্বিকার থাকেন ত নাচার।

কিন্তু মামাবাবু বা মহান্তীর নাগাল পাওয়াই যে ভার।

তাঁরা লোধমা পাহাড় ছেড়ে যাননি এইটুকু খবর পেয়ে আমাদের নিজেদের ছাউনি, তারপর সরকার সাহেবের আস্তানা, দুজায়গায় খোঁজ করে শেষে যা জানলাম তাতে বেশ একটু অস্বস্তিই বোধ করলাম। আর কোথাও নয়, নাগাপ্পার খাস তাঁবুতেই তাঁরা বিশেষ পরামর্শ-সভায় নাকি জড়ো হয়েছেন।

নাগাপ্পার তাঁবু শুনেই অবশ্য সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। আমার যা বলবার তার শ্রোতা হিসাবে নাগাপ্পাকে যে চাই না তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এখন আর উপায় কি! সময় আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয়। নাগাপ্পার তাঁবুর পরামর্শ- সভা থেকে কখন মামাবাবু বার হবেন তার জন্যে আর অপেক্ষা করা চলে না।

মরীয়া হয়ে নাগাপ্পার তাঁবুতেই তাই গিয়ে হানা দিলাম।

পরামর্শ-সভাটা যে অত্যন্ত গোপন ও জরুরী তা নাগাপ্পার বেয়ারার আচরণেই একটু বোঝা গেল। সসম্ভ্রমে সেলাম জানিয়েও সে একটু দরজা আটকাবার ভঙ্গীতেই বললে—"ওঁদের জরুরী মিটিং হচ্ছে আজ্ঞে! কারুর ঢুকতে মানা আছে।"

"জানি!"—বলে বেয়ারাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে পর্দার দরজা ঠেলে নাগাপ্পার খাস তাঁবুতে ঢুকে পড়লাম।

ঢোকাটা যে অপ্রত্যাশিত আর অবাঞ্ছিত তা কয়েক জোড়া অপ্রসন্ন চোখের কোঁচকানো ভুরু দেখেই বুঝলাম। মহান্তীর তাকানটাও একটু যেন অস্বস্তির। শুধু মামাবাবুর দৃষ্টি নির্বিকার, আর সহাস্য অভ্যর্থনা শুধু নাগাপ্পার মুখে।

"আসুন! আসুন, মিঃ সেন!"—তাঁর নিজের তাঁবুতে সভা বসেছে বলেই যেন উদার গৃহস্বামীর ভূমিকা নিয়ে নাগাপ্পা বেয়ারাকে একটা বাড়তি চেয়ার আনবার হুকুম দিলেন।

আমি ইতিমধ্যে কামরার সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। শুধু মামাবাবু, মহান্তী, সরকার সাহেব আর নাগাপ্পা নয়, আর একটি নতুন মুখ সেখানে দেখলাম। আমাদেরই বয়সী রোগাটে একজন ইউরোপীয়ান। ফিকে বাদামী পাতলা চুল আর ফ্যাকাশে কোঁচকানো মুখে কেমন একটু রুগ্নতার আভাস থাকলেও ইনি যে নাগাপ্পার বর্তমান অতিথি মহাবুয়াং-এর হাতী শিকারী তা তখন বুঝেছি।

বেয়ারার নিয়ে আসা ক্যানভাসের ফোল্ডিং চেয়ারটায় বসবার পর নাগাপ্পা পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় ইয়োরোপীয় শিকারীর নামটাও জানলাম—জন কার্সন।

pathagar.net

এ সভার আলোচনার বেশ একটা উত্তেজনার মুহূর্তে উপদ্রবের মত যে এসে পড়েছি পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হবার আগেই বুঝলাম।

সরকার সাহেবই একটু অধৈর্যের সঙ্গে নাগাপ্পার দিকে চেয়ে বললেন—"এসব লৌকিকতার যথেষ্ট সময় পরে পাওয়া যাবে, মিঃ নাগাপ্পা। এখন মিঃ রায় যা বলছিলেন সেটার মীমাংসা আগে দরকার।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই!"—বলে নাগাপ্পা যেন মাপ চাইবার ভঙ্গী করলেন। কিন্তু তাঁর চোখের মধ্যে এক পলকের জন্যে যে চাপা আক্রোশের ঝিলিকটা খেলে গেল তা আর যারই হোক আমার দৃষ্টি এড়াল না।

মামাবাবু কিন্তু আগাগোড়া নির্বিকার। আমরা চুপ করতেই বই থেকে যেন মুখস্থ পড়ছেন এমনিভাবে বললেন—"আমরা তা হলে দু ধরনের অদ্ভুত খেই এ রহস্যের পাচ্ছি। তার একটা এই খুনের ব্যাপারের সঙ্গে জড়ান কি না তাও আমরা কেউ জোর করে এখনো বলতে পারছি না। এই খেই ক'টা ছেঁড়া কাগজের টুকরো বলা যেতে পারে। মিঃ সরকারই প্রথম এগুলো দৈবাৎ লক্ষ করেন। এ কাগজগুলোর ভেতর সাংঘাতিক কিছু লেখা-টেখা পাওয়া যায়নি। যা দেখা গেছে তা পড়লে আজেবাজে কথা কেউ অন্যমনস্কভাবে এখানেসেখানে লিখেছে বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু মন দিয়ে পরীক্ষা করলে সন্দেহ হয় কথাগুলো একেবারে আবোল তাবোল নয়। যেমন এই কাগজের টুকরোটাই দেখা যাক।"

সামনের টেবিলটার ওপর একটি ছোট খোলা বাক্সের মধ্যে রাখা ছেঁড়া দলা-পাকান টুকরো কাগজগুলো আগেই চোখে পড়েছিল। মামাবাবু তা থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে খুলে ধরে বললেন—"এতে লেখা দেখছি, ইংরেজীতে 'সি আর ২৪নং ৫২.০১', তারপর নীচে এক জায়গায় বোলতার চাকের মত একটা ছবি আঁকা।"

মামাবাবু ছবিটা আমাদের দেখিয়ে বললেন—"সব সুদ্ধু জড়িয়ে অর্থহীন খামখেয়ালী লেখা আর আঁকা বলে মনে হলেও এগুলির একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই আরেকটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো দেখলেই সে তাৎপর্যটা কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে। এ কাগজটায় লেখা দেখছি 'মেটাল বুলেটিন, ১৯৩৮, ৭৮নং আউন্স ৩৬ ডলার'। এ লেখার 'মেটাল বুলেটিন ১৯৩৮'-এর মধ্যে ধোঁয়াটে কিছু নেই। তার পরের '৭৮নং আর আউন্স ৩৬ ডলার'-এরও একটু ভাবলেই মানে পাওয়া যায়। ৭৮নং কি? সেটা হল প্ল্যাটিনাম ধাতুর অ্যাটমিক নম্বর। অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের বিলেতের মেটাল বুলেটিন থেকে প্ল্যাটিনাম ধাতুর দর যে আউন্স পিছু ৩৬ ডলার তা টুকে রাখা হয়েছে। ওই কাগজের টুকরোর পাঠোদ্ধারের পর আগেরটাও বুঝতে অসুবিধে হয় না। সি আর হল ক্রোমিয়ম ধাতুর সিম্বল, তার অ্যাটমিক নম্বর হল ২৪, আর অ্যাটমিক ওজন হল ৫২.০১। কিন্তু এ সবের সঙ্গে ওই বোলতার চাকের মত ছবিটা কেন আর কিসের? ছবিটা ক্রোমিয়ম ও প্ল্যাটিনাম যার মধ্যে পাওয়া যায়, নাম না করে, সেই পাথরটা বোঝাবার জন্যে। ও পাথরের বৈজ্ঞানিক নাম হল পেরিডোটাইট। পৃথিবীর গভীর বুকে প্রচণ্ড উত্তাপে আর চাপে তৈরী হয়। রং খুব গাঢ় সবুজ বা কালো।"

হেলাফেলার বলে যা মনে হয়েছে, তাঁর কুড়িয়ে আনা সেই ছেঁড়া কাগজের মধ্যে এত রহস্য পাওয়াটা যেন তাঁরই বাহাদুরী মনে করে সরকার সাহেব তখন উত্তেজিত। মামাবাবু

boiRboi.net

একটু থামতেই তাঁকে আবার উসকে দিয়ে বললেন—"এসব কাগজে যা পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে তা হলে কি বোঝা উচিত?"

মামাবাবু যেভাবে হাসলেন, তাতে সরকার সাহেবের এ উৎসাহে তিনি খুশী হয়েছেন বলেই মনে হল। হেসে তিনি বললেন—"বোঝা উচিত যে এখানে কেউ পেরিডোটাইট আর তার মধ্যে ক্রোমিয়ম ত বটেই, এমন কি প্ল্যাটিনামেরও সন্ধান বোধ হয় পেয়েছে।"

"পাওয়াটা ত অপরাধ নয়!"—নিজের কথাটা বলবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেও মামাবাবুদের এই নিরর্থক আলোচনায়ও মন্তব্যটুকু না করে পারলাম না।

"পাওয়া অপরাধ নয়"—মামাবাবুর বদলে মহান্তীই হেসে জবাব দিলেন—"কিন্তু লুকিয়ে রাখাটা অপরাধ! এসব কাগজ দেখে মনে হয় কেউ এই রকম কিছু দামী খনিজের সন্ধান পেয়ে তা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে।"

"তাতে লাভ?"—অবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম—"খনি ত আর চুরি করে পকেটে নিয়ে পালান যাবে না!"

"তা যাবে না!" নাগাপ্পাই এবার আমাকে জ্ঞান দিলেন—"কিন্তু লুকিয়ে কিছু হাতিয়ে নিতে পারলে প্ল্যাটিনম-এর মত ধাতু বেচে বেশ কিছু লাভ করা যায়। তা ছাড়া সরকারের কাছে যে সব কোম্পানী এসব খনি চালাবার অধিকার নেয় তাদের কাছ থেকেও গোপন খবর দেবার দরুন মোটা টাকা আদায় করা যেতে পারে।"

"শুধু তাই কেন!"—মামাবাবুই বুঝিয়ে দিলেন এবার—"সেরকম ঠগ কোম্পানী হলে অন্য কিছুর নামে খনি চালিয়ে গোপনে এই দামী ধাতু পাচার করতে পারে। বেশী দিন তা পারা না গেলেও সেরকম চোরা দলের পক্ষে কিছুদিনের মধ্যেই যতখানি সম্ভব লুটে পুটে নিয়ে একেবারে হাওয়া হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।"

"কিন্তু লোধমা পাহাড়ে যারা আছে"—নাগাপ্পা এবার একটু তীব্র স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন—"তাদের মধ্যে এ কাজ কারুর পক্ষে সম্ভব বলে ত ভাবতে পারছি না।"

কয়েক মুহূর্ত সবাই একেবারে চুপ। মনের কথা কারুর যদি কিছু থাকে বলার দ্বিধা কেউ যেন কাটাতে পারছেন না।

দ্বিধা কাটালেন প্রথমে সরকার সাহেব।

টেবিলের ওপর নাগাপ্পার কোম্পানীর একটা ছাপান প্যাড পড়ে ছিল। তা থেকে হঠাৎ একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে নাগাপ্পাকে যেন চোখের দৃষ্টিতে গেঁথে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ প্যাড ত আপনার কোম্পানীর?"

প্রশ্নটা আমাদেরও অর্থহীন বলে মনে হল। কিন্তু নাগাপ্পা যেন তাতে জ্বলে উঠে কোনো রকমে নিজেকে সামলে তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বললেন—"আপনি ত পড়তে জানেন। নামটা যখন ছাপাই আছে ওপরে তখন জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

"জিজ্ঞাসা করছি এই কাগজটার জন্যে!"—সরকার সাহেব আমাদের সকলকে কাগজটা দেখিয়ে বললেন—"আপনাদের কোম্পানীর কাগজ যেমন-তেমন নয়, একটু বিশেষ ও উঁচু দরের কাগজ। আমি যত দূর জানি এ রকম কাগজের প্যাড লোধমা পাহাড়ে আর কেউ আমরা ব্যবহার করি না।"

"তাতে হল কি?"—নাগাপ্পার গলা এবার শান্ত! কিন্তু চোখ দুটো যেন ছুরির ফলা।

pathagar.net

"হয়েছে এই যে, এসব ছেঁড়া টুকরো আর আপনার প্যাডের কাগজ একই ব্রান্ডের। আপনারা মিলিয়ে দেখুন।"

সরকার সাহেব ছেঁড়া কাগজের বাক্স আর প্যাডটা টেবিলের মাঝখানে ঠেলে দিলেন।

কেউ কিন্তু সঙ্কোচের দরুনই বোধহয় কাগজগুলো মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করল না।

নাগাপ্পাই সেগুলো নিজের কাছে টেনে নিয়ে হেসে উঠে বললেন—"তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। আমার এ প্যাড টেবিলের ওপর অফিস ঘরে পড়ে থাকে। যে কেউ তা চুরি করতে পারে।"

"তা হয়তো পারে।"—সরকার সাহেব বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বললেন—"কিন্তু আপনি যে কোম্পানীর প্রতিনিধি হয়ে এখানে আছেন, তার কাজটা কি বলতে পারেন? কোম্পানীটা আসল না জাল তাই ত বোঝা যাচ্ছে না। আমি ত বড় বড় সব কটা ডিরেক্টরী ঘেঁটে কোথাও আপনাদের কোম্পানীর নাম পাই নি।"

ঘরের সবাই স্তম্ভিত বলে মনে হল। নাগাপ্পা কিন্তু এবার অবিচলিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন— "আপনি এত কষ্ট তাহলে করেছেন? কেন মিছে করতে গেলেন! তার বদলে আমায় জিজ্ঞাসা করলেই আমি বলে দিতাম আমাদের কোম্পানীর নামটা আসল নয়।"

নাগাপ্পার কথায় প্রায় সবাই কিছুক্ষণ একেবারে নির্বাক!

নাগাপ্পা স্বীকার করছেন যে তাঁর কোম্পানীর নামটা জাল!

সরকার সাহেব প্রথমটা বেশ একটু হতভম্বভাবে নাগাপ্পার বক্তব্যটাই আবার আওড়ালেন,—"আপনি বলছেন, আপনাদের কোম্পানীর নামটা আসল নয়? তার মানে মিথ্যে একটা কোম্পানীর নাম নিয়ে আপনি এখানে এতদিন ধরে আছেন!"

কথা বলতে বলতে সরকার সাহেবের গলা ও মেজাজ গরম হয়ে উঠল। রীতিমত তীব্রস্বরে তিনি জানতে চাইলেন—"আমাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে আপনি কি মতলব এখানে হাসিল করছেন? শুধু নিজের মুখে স্বীকার করেই ঠগবাজীর দোষ আপনি কাটাবেন ভাবছেন?"

"ধীরে, বন্ধু ধীরে!"

নিজের মুখে অপরাধ স্বীকার করেও নাগাপ্পা প্রায় নির্বিকারভাবে একটু হেসে ইংরেজীতে যা জবাব দিলেন তার বাংলাটা ওই রকমই দাঁড়ায়।

সরকার সাহেব উত্তেজিতভাবে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নাগাপ্পা একটু কৌতুকের স্বরেই বললেন—"এক দৌড়ে অতখানি যাবেন না! আমার কোম্পানীর নামটা আসল নয় বলে কি আমি ঠগবাজ হয়ে গেছি? আমাদের কোম্পানীর আগের নাম হল ভ্যলকান মিনারেলস লিমিটেড। বিদেশের কোম্পানী, ভারতবর্ষে এসে এখানকার অংশীদার নিয়ে নতুন করে গড়া হচ্ছে। এখন নাম হবে ইন্ডো ভ্যলকান মিনারেলস লিমিটেড। সে নামটা কিছুদিনের মধ্যেই রেজেস্ট্রী হয়ে যাবে, নিয়ম কানুনের ফ্যাকড়ায় একটু দেরী হচ্ছে। এই সময়টায় পুরোন নামে জরীপ-টরীপের প্রাথমিক কাজ চালিয়ে যাবার অনুমতি আমরা পেয়েছি। আমাদের আগের ও এখনকার দুটো নামের কোনোটাই ডিরেক্টরীতে না পাওয়ার কারণ এই।"

pathagar.net

এত ফলাও করে দেওয়া সত্ত্বেও নাগাপ্পার ব্যাখ্যাটা বেশ কাঁচাই মনে হল। মুখে নির্বিকার ভাব দেখালেও বিস্তারিতভাবে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টাটাই যেন একটু অস্বাভাবিক।

আচমকা ধরা পড়ে নাগাপ্পার এই সাফাই গাইবার দুর্বল চেষ্টায় মামাবাবুর মুখে পর্যন্ত সামান্য অধৈর্য ফুটতে দেখলাম।

"এসব কৈফিয়ত কেন দিচ্ছেন, মিঃ নাগাপ্পা?"—মামাবাবু একটু রুক্ষ স্বরেই বললেন—"আপনার কথা যাচাই করবার এখন ত উপায় নেই। সুতরাং কাগজগুলো আপনার প্যাড থেকেই ছেঁড়া বলে ধরে নিয়ে তার কোনো হদিস পাওয়া যায় কি না দেখা যাক।"

"আমি একটা প্রস্তাব করতে পারি?"

বেশ একটু অবাক হয়ে নাগাপ্পার শিকারী বিদেশী বন্ধু মিঃ কার্সনের দিকে তাকালাম। এতক্ষণ বাদে এই প্রথম তিনি মুখ খুললেন।

"নিশ্চয়ই পারেন!"—মহান্তীই তাঁকে উৎসাহ দিলেন।

কয়েক মুহূর্ত একটু যেন দ্বিধাভরে আমাদের সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কার্সন বললেন—"ওই কাগজের টুকরোগুলোতে যা লেখা আছে যার—তার পক্ষে তা লেখা নিশ্চয় সম্ভব নয়?"

"না, তা ত নয়ই।"—সরকার সাহেবই সায় দিলেন—"ওয়াকিবহাল ওপরওয়ালা বিশেষজ্ঞ কেউ ছাড়া বিজ্ঞান ও ব্যবসার এসব সাঙ্কেতিক খুঁটিনাটি জানে কে? এসব লেখার স্বার্থও নেই অন্য কারুর।"

"তা হলে"—একটু থেমে আবার যেন একটু অস্বস্তি জোর করে জয় করে মিঃ কার্সন বললেন—"ও লেখাগুলো এখানে যাঁরা উপস্থিত তাঁদের কারুরই হবে নিশ্চয়।"

হঠাৎ সবাই যেন হকচকিয়ে গেলাম প্রথম কথাটা শুনে। তারপর সকলেই বোধহয় বুঝলেন যেন কার্সন অন্যায় কিছু বলেন নি। মামাবাবু ত স্পষ্টই কার্সনকে সমর্থন করলেন।

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন মিঃ কার্সন। লোধমা পাহাড়ে যে ক'টি কোম্পানী আছে, তার সব কর্তা ব্যক্তিই এখানে হাজির। এঁরা ছাড়া আর কে ওসব লিখতে পারে? লেখার গরজই বা কিসের?"

"তাই"—মামাবাবুর সমর্থন পেয়ে কার্সন এবার একটু জোর দিয়েই বললেন—"আমি একটা অতি সহজ পরীক্ষায় আপনাদের রাজী হতে অনুরোধ করি।"

"কি পরীক্ষা?"—বন্ধু হলেও নাগাপ্পা সন্দিগ্ধভাবে কার্সনের দিকে চাইলেন।

"পরীক্ষা আর কিছু নয়,"—কার্সন সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন—"ওই ছেঁড়া কাগজগুলোয় যা লেখা আছে এখানকার প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে তা লিখবেন।"

"ও!"—নাগাপ্পাই একটু বিদ্রূপের হাসি হাসলেন—"তুমি হাতের লেখা মিলিয়ে দোষী ধরবে? হাতের লেখা মিলবে বলে তোমার ধারণা?"

"একেবারে হুবহু হয়ত মিলবে না!"—কার্সন একটু হেসে জানালেন—"কিন্তু চেষ্টা করলেও হাতের লেখা একেবারে লুকোন যায় না। কয়েকটা খোঁচ আর টানের ইসারা থেকে যায়ই। সুতরাং কারুর লেখার ধাঁচের সঙ্গে মিল পাবই বলে আশা করছি।"

boiRboi.net

"আপনি তা হলে শুধু শিকারী নন, হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্টও! হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ!"—সরকার সাহেবের গলায় স্পষ্টই উপহাসের সুর শোনা গেল।

কার্সন সে উপহাস গায়ে না মেখে বিনীতভাবেই জানালেন যে ঠিক বিশেষজ্ঞ না হলেও এ বিদ্যার চর্চা তিনি সৌখীনভাবে কিছু করেছেন।

এরপর আর কথা না বাড়িয়ে সবাই নাগাপ্পার কোম্পানীর প্যাডের কাগজেই ছেঁড়া কাগজের টুকরোর লেখাগুলো আলাদা আলাদ লিখলেন। মামাবাবু আর আমিও বাদ গেলাম না। লেখবার ত বেশী কিছু নেই, সামান্য কয়েকটা কথা আর গোটাকতক সংখ্যা মাত্র। সকলের লেখা হবার পর কার্সন কাগজগুলো যেরকম উত্তেজিত আগ্রহভরে কাছে টেনে নিলেন তাতে মনে হল লোধমা পাহাড়ের রহস্যের একটা খেই ধরা পড়তে বুঝি আর দেরী নেই!

কিন্তু বৃথা আশা! ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলোর সঙ্গে আমাদের লেখা কাগজগুলো মিলিয়ে দেখতে দেখতে মিনিট দশেক পরে কার্সনের ভ্রূকুঞ্চন দেখেই সন্দেহ হল তিনি তাঁর বিদ্যেতে আর থই পাচ্ছেন না।

"কি বুঝছেন, মিঃ কার্সন?"—মহান্তী ঠাট্টা করে বললেন—"দুষমন কে, তা ধরতে পারলেন?"

"না।"—কার্সন দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়লেন।

"কারুর লেখার সঙ্গেই মিল খুঁজে পাচ্ছেন না বুঝি?"—মামাবাবু হেসে প্রশ্ন করলেন।

"না, তা একটু পাচ্ছি।"—কার্সনকে বেশ কুণ্ঠিত মনে হল।

"মিল পাচ্ছেন!"

আমরা সবাই চঞ্চল আর উদগ্রীব হয়ে উঠলাম।

"তা হলে অমন হতাশভাব দেখাচ্ছেন কেন?"—আমিই খোঁচা দিয়ে বললাম—"দুষমন ত তাহলে ধরেই ফেলেছেন!"

"না, তা ধরা যাচ্ছে না"—কার্সন বেশ একটু সঙ্কুচিতভাবে জানালেন—"কারণ লেখাটা একটু যা মিলছে তা মিঃ নাগাপ্পার সঙ্গে।"

খানিকক্ষণ ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। যার যা বলবার যেন গলায় আটকে যাচ্ছে।

"তার মানে?"—মামাবাবুই প্রথম এ আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠে বললেন—"মিঃ নাগাপ্পার লেখার সঙ্গে মিলছে, অথচ বন্ধু বলে তাঁকে দোষী ভাবতে আপনার আটকাচ্ছে?"

"না, না, ঠিক তা নয়!"—কার্সন বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

"ঠিক তা নয় কেন বলছেন! ব্যাপারটা ঠিক তাই।"—মামাবাবু একটু হেসে বললেন—"কিন্তু নাগাপ্পা আপনার বন্ধু বলেই নির্দোষ হবেন এটা ঠিক উচিত কথা ত নয়।"

"না, মানে আমি বলতে চাইছি যে"—কার্সন বেশ একটু ফাঁপরে পড়ে তাঁর বক্তব্য গুলিয়ে ফেললেন—"সামান্য মিল যা পেয়েছি তার ওপর নির্ভর করে সঠিক কিছু বলা যায় না।"

"কিন্তু মিল যেটুকু পেয়েছেন তা মিঃ নাগাপ্পার লেখার সঙ্গেই এটুকু ত স্বীকার করছেন?" —সরকার সাহেব কার্সনকেই যেন আসামী খাড়া করলেন তাঁর জবরদস্ত জেরার ধরনে।

কার্সন কোনো জবাব দেবার আগে মামাবাবু এবার বাধা দিয়ে একটু দৃঢ়স্বরে বললেন—"মিঃ কার্সনের কথা আমরা শুনেছি, এখন মিঃ নাগাপ্পার নিজের এ বিষয়ে কিছু বলার আছে কি না সেটাই আগে আমাদের বোধ হয় জানা দরকার।"

"এইটুকু শুধু বলার আছে যে,"—বাঁকা বিদ্রূপের স্বরে বললেন নাগাপ্পা—"জন কার্সন আমার বন্ধু। কিন্তু বড় শিকারী হলেও 'হস্তলিপি বিশারদ' বলে ওর পরিচয় আমার জানা ছিল না। সে পরিচয় দিতে গিয়ে ওর এমন দুরবস্থা না হলে খুশী হতাম।"

"তার মানে আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রইলাম বলতে চান?"—সরকার সাহেব নিজের বিরক্তিটা না লুকিয়েই বললেন—"এতটা সময় আমাদের বৃথাই নষ্ট হল!"

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত!"—কার্সন সকলের কাছে মার্জনা চাওয়ার ভঙ্গীতে কিছু বোধহয় বলতে যাচ্ছিলেন! নাগাপ্পা তাতে বাধা দিয়ে বললেন—"না, দুঃখিত হবার তোমার কিছু নেই, জন! সময়টা আমাদের বৃথা নষ্ট হয়েছে বলে মনে করব কেন? দুটো অত্যন্ত দামী আবিষ্কার ত এঁরা করে ফেলেছেন। একটা হল এই যে, মিঃ সরকারের কুড়িয়ে পাওয়া কাগজের টুকরোগুলো আমার কোম্পানীর প্যাড থেকেই ছেঁড়া বলে ধরা যেতে পারে, কারণ দুটোই এক ব্র্যান্ডের কাগজ। দ্বিতীয়টা হল ছেঁড়া কাগজের লেখার সঙ্গে আমার হাতের লেখার মিল। এ দুটো গুরুতর আবিষ্কারের পর আমার সম্বন্ধে আরও নতুন কি বেরিয়ে পড়তে পারে কে জানে! আমি ত সেই অপেক্ষাতেই আছি।"

কথাগুলোয় নাগাপ্পার তাচ্ছিল্য আর উপহাসের সুরটাই আমার সবচেয়ে খারাপ লাগল! সুযোগটা যখন নাগাপ্পা নিজেই করে দিয়েছেন তখন আর নিজেকে সামলাবার দরকার বোধ করলাম না।

নাগাপ্পার সঙ্গেই প্রায় সুর মিলিয়ে বললাম—"অপেক্ষা আপনার বৃথা হবে না, মিঃ নাগাপ্পা। আপনার সম্বন্ধে আরও ক'টা আবিষ্কারের কথা আমিই জানাচ্ছি।"

নয়

আমার কথায় নাগাপ্পার চমকে ওঠাটা স্পষ্টই টের পেলাম। অন্য সকলেও তখন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে।

"কি আবিষ্কার?"—মামাবাবুই একটু যেন চড়া গলায় প্রশ্ন করলেন।

"প্রথম আবিষ্কার এই যে, সবাই যখন এখানকার নিষেধ মেনে লোধমা পাহাড় থেকে নামা বন্ধ করেছে নাগাপ্পা তখন লোধমা পাহাড় ছেড়ে ত গেছেনই, আদিবাসীদের নিষিদ্ধ এঞ্জা পাহাড়েও গোপনে উঠেছেন।"

আর সকলে তখন চুপ। আমার দিকে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে চেয়ে নাগাপ্পা শুধু বললেন—"তারপর দ্বিতীয় আবিষ্কার?"

"দ্বিতীয় আবিষ্কার হল, আদিবাসী পিয়ন যেখানে খুন হয়েছে আপনার সেখানে লুকিয়ে গিয়ে খুনের প্রমাণ সরিয়ে ফেলা।"

"কি বলছ, কি সেন?"—মহান্তীর রুক্ষস্বরে মনে হল আমার মাথা ঠিক আছে কি না তাই যেন তাঁর সন্দেহ হচ্ছে।

pathagar.net

নাগাপ্পা তখনো কিন্তু স্থির অবিচলিত ঈষৎ ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর দিকেই ফিরে বললাম—"বলুন, মিঃ নাগাপ্পা, আমার আবিষ্কারগুলো মিথ্যে কি না।"

"তার মানে",—আমার দিকে চেয়ে যেন অবিশ্বাসের সুরে বললেন নাগাপ্পা—"আপনি ও পাহাড়ে তখন ছিলেন?"

"হ্যাঁ, ছিলাম! আর খুনের জায়গা থেকে পাথুরে মাটি চেঁচে কিছু যে তুলে নিয়ে গেছলেন, তাও দেখেছি। সে জিনিষটা কি এবার বলবেন?"

"বলব কেন!"—আমার এতক্ষণের অভিযোগের যেন কোনো দামই না দিয়ে নাগাপ্পা উঠে পড়ে বললেন—"সে জিনিষটা দেখিয়েই দিচ্ছি।"

নাগাপ্পা সত্যিই তাঁবুঘরের একটা দেরাজ থেকে একটা কাগজের মোড়ক এনে সামনের টেবিলের ওপর খুলে ধরে বললেন—"এই হল সেই জিনিষ। জিনিষটা কি আপনারা কেউ বুঝতে পারছেন, কি?"

সকলেই বিস্মিত কৌতূহলে কাগজের মোড়কের জিনিষটা দেখতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সব চেয়ে হতভম্ব তখন আমি। আমার অভিযোগ অস্বীকার না করে, নাগাপ্পা যে তা খেলো আর ভোঁতা করে দেবার অমন একটা প্যাঁচ কষবেন তা ভাবতে পারিনি।

"জিনিষটা ত কোনো জন্তুর বিষ্ঠা বলে মনে হচ্ছে।"—প্রথম মন্তব্য করলেন মহান্তী।

"ঠিকই ধরেছেন।"—নাগাপ্পা সায় দিয়ে জানালেন—"কিন্তু কোন জানোয়ারের তা বুঝেছেন কি?"

মামাবাবু এ সভায় বেশীর ভাগ সময় একটু অস্বাভাবিক রকম নীরব হয়েই আছেন। এইবার একটু মুচকে হেসে বললেন—"কোন জানোয়ারের? হাতীর?"

"হ্যাঁ, ঠিক তা-ই!"—নাগাপ্পা যেন একটা তর্কে জেতার ভঙ্গিতে বললেন—"হাতের লেখা সম্বন্ধে না হোক, এ ব্যাপারে আমার বন্ধু জন কার্সনের মতামতের ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি। জনকে কালই আমি এ জিনিষটা দেখিয়েছি। ওর নিজের মুখেই ওর মতটা শুনুন।"

"হ্যাঁ",—কার্সন স্বীকার করলেন—"কালই আমি এটা পরীক্ষা করেছি। এটা যে হাতীর বিষ্ঠা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু হাতীর বিষ্ঠাই যদি হয় তা হলে আদিবাসী পিয়নের খুনের রহস্যটা প্রায় ভৌতিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে।"—মামাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন—"মিঃ কার্সনের কথায় জেনেছি, মহাবুয়াং-এর ক্ষ্যাপা হাতীটার পক্ষে সেদিন এ অঞ্চলে আসা অসম্ভব। পিয়নের খুনের জায়গায় তা হলে এ আবার কোন হাতী কোথা থেকে এল?"

"যেখান থেকেই আসুক"—সরকার সাহেব যুক্তির সামনে খানিকটা যেন নিরুপায় হয়েই স্বীকার করলেন—"বিষ্ঠা যখন পাওয়া গেছে তখন হাতী একটা নিশ্চয় ওখানে এসেছিল।"

"তা হলে আবার ত সব ধারণা পাল্টাতে হয়।"—মহান্তী বেশ দ্বিধার সঙ্গে বললেন—"পিয়নটিকে যদি কোনো ক্ষ্যাপা হাতী মেরে থাকে, তা হলে ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার কিছু ত নেই।"

pathagar.net

"একটু আছে।"—মামাবাবু ফ্যাঁকড়া তুললেন—"হাতীর বিষ্ঠা ঠিক ওই জায়গায় পাওয়া গেছে কি না সে বিষয়ে একটা সন্দেহ উঠতে পারে।"

"সে সন্দেহের বিরুদ্ধে আপনার ভাগনে মিঃ সেনই ত আমার সাক্ষী!"—নাগাপ্পা এক কথায় মামাবাবুকে চুপ করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও হতভম্ব করে দিলেন। যা আমার অভিযোগ তা-ই সাক্ষ্য হিসেবে নিজের কাজে লাগানটা নাগাপ্পার শয়তানী বাহাদুরীর চূড়ান্ত বলে মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম।

কিন্তু ওই প্যাঁচটুকুতেই হার মানবার পাত্র আমি নই। নাগাপ্পাকে যেন সমর্থন করেই বললাম—"হ্যাঁ, শুধু ওই একটা ব্যাপারে কেন, আমি আপনার আরেকটা বাহাদুরীরও সাক্ষী। পাছে কেউ আপনার লুকিয়ে ওখানে ঘোরা দেখে ফেলে সেই ভয়ে আপনার বেপরোয়া গুলি ছোঁড়াও আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর একটু হলে তার শিকারও হতাম।"

কামরার মাঝখানে একটা বোমা ফাটাবার মত খবরই ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু ফলটা যা আশা করেছিলাম তা পুরোপুরি পেলাম না।

নাগাপ্পাই বোমাটাকে কেমন যেন কাঁচিয়ে দিলেন, দিলেন অতি সস্তা একটি প্যাঁচে।

আমার মুখে নাগাপ্পার সেই নির্জন পাহাড়ী প্রান্তরে বেপরোয়া গুলি ছোঁড়ার খবর শুনে আর সকলে রীতিমত হতভম্বই হয়ে যাচ্ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু নাগাপ্পা হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে ওঠায় হাওয়াটা একেবারে হালকা হয়ে গেল।

"তা হলে ত খুব মজার নাটক হয়েছিল।"—নাগাপ্পা হাসতে হাসতেই বললেন—"আপনার হাত পা নিশ্চয়ই তখন ভয়ে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছল! অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যাননি ত?"

কথাগুলো বলার ধরনে অনেকের মুখেই তখন কৌতুকের হাসির রেখা একটু ফুটে উঠেছে। হাসি তামাসার সুরটা কাটাবার জন্যে যতদূর সম্ভব গম্ভীর ও কড়া গলায় বললাম—"ব্যাপারটা ঠাট্টার নয়, মিঃ নাগাপ্পা। ও গুলিতে একটা খুনজখমও হতে পারত!"

"হলে সেটা ভৌতিক ব্যাপার হত!" নাগাপ্পা আগের মতই হাসতে হাসতে বললেন—"কারণ পিস্তলে আসলে গুলি ত ছিল না। ফাঁকা আওয়াজ করেছিলাম মাত্র।"

"ফাঁকা আওয়াজ করেছিলেন!"—কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম শুধু এ মিথ্যের প্রতিবাদ করবার কোনো উপায় নেই বুঝে। ফাঁকা আওয়াজ করেছিলেন, না সত্যিই গুলি ছুঁড়েছিলেন তা এখন কেমন করে প্রমাণ হবে? নিরুপায় হয়ে নাগাপ্পার কথাটাই যেন মেনে নিয়ে তারপর গলাটা সমান রুক্ষ রেখেই জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু ফাঁকা আওয়াজই বা কেন করলেন বলতে পারেন?"

"কেন আর!"—নাগাপ্পা যেন আমার বুদ্ধির অভাবে অবাক—"ভয় দেখাবার জন্যে।"

"কাকে?"—এবার তীক্ষ্ণ প্রশ্নটা সরকার সাহেবের।

"ফাঁকা আওয়াজে ভয় পাওয়ানো যায় এমন কাউকে!" মুখে বিদ্রূপের হাসি থাকলেও এবার উত্তরটা দিতে নাগাপ্পার যেন দু-এক মুহূর্তের দ্বিধা দেখলাম—"জায়গাটা ত ভালো নয়। বুনো হাতীর ত তখনি চিহ্ন পেয়েছি, তা ছাড়া ভালুক কি চিতারও অভাব নেই। যেখানে বসেছিলাম তার কিছু দূরে কয়েকটা ঝোপ-ঝাড় পাথুরে টিবির পেছনে কি রকম

pathagar.net

একটা শব্দ যেন শুনতে পাই। সাবধানের মার নেই। সেদিকে এগিয়ে গিয়ে তাই দুটো ফাঁকা আওয়াজ করি। তেমন কোনো জানোয়ার থাকলে বেরিয়ে পড়ে ভয়ে ছুটে পালাবে।"

"জানোয়ার ত কিছু বার হয়নি?"—সরকার সাহেবই স্পষ্ট সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নাগাপ্পার দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

"তা ত হয়ই নি!" নাগাপ্পা এবার একটু বিরক্তির সঙ্গেই উত্তর দিলেন—"আর হয়নি বলেই ফিরে নিজের কাজে চলে যাই। ওখানে যে মিঃ সেন লুকিয়ে বসে আছেন তা ত তখন কল্পনাই করতে পারিনি।"

বলতে যাচ্ছিলাম যে, শুধু মিঃ সেন নয়, আরো একজন তার সঙ্গে সেখানে বসে তাঁর কীর্তিকলাপ সব দেখেছে। কিন্তু খুব সময়মত নিজেকে সামলে গেলাম। সত্যিই নাগাপ্পাকে এভাবে জেরা করে কোনো লাভ নেই।

সোজাসুজি তাঁকে মুঠোয় ধরতে গেলে পিছল পাঁকাল মাছের মত কিরকম হড়কে তিনি বেরিয়ে যেতে পারেন তা ত ভালো করেই দেখলাম। তাঁর শয়তানী প্রমাণ করবার জন্যে আরো তোড়জোড় ও কৌশল দরকার। প্রমাণের বেড়াজাল এমনভাবে তাঁর চারিদিক থেকে গুটোতে হবে যাতে পালাবার রাস্তা আর তিনি না পান।

মামাবাবুও সেই কথাই বুঝে নিশ্চয়ই এতক্ষণে একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললেন—"এ আলোচনা আর চালিয়ে কোনো লাভ আছে বলে ত মনে হচ্ছে না। যা যা সূত্র আমরা এ পর্যন্ত পেয়েছি সেগুলো নিয়ে সবাই আজকের দিনটা আমরা ভালো করে ভেবে দেখি। কাল সকালে আবার আমরা একসঙ্গে বসব। এবার বৈঠকটা আমাদের মহাস্তীর ছাউনিতেই হবে। ইতিমধ্যে এ রহস্যের নতুন কোনো সূত্র আর সমাধানের মালমশলা হয়ত আমাদের হাতে আসতে পারে।"

সেইরকম মালমশলাই মামাবাবুর হাতে তুলে দেবার সঙ্কল্প করে নাগাপ্পার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম।

তাঁবু থেকে বার হবার সময় নাগাপ্পার নির্লজ্জ অন্তরঙ্গতার চেষ্টায় বেশ একটু অবাক হতে হল। আর সকলের সঙ্গে তাঁবুঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেও তখন একলাই আলাদা রাস্তায় চলেছি। যতক্ষণ এ সভায় ছিলাম সেই সময়ের মধ্যে বঙ্কুবাবু ফিরে এসেছেন কি না খোঁজ নেওয়ার জন্যে সরকার সাহেবের তাঁবু আর ক্যান্টিনটা ঘুরে যাওয়াই উদ্দেশ্য।

কয়েক পা যেতে না যেতেই হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনে চমকে দাঁড়াতে হল। ডাকছেন আর কেউ নয়, স্বয়ং নাগাপ্পা।

আমার মুখের ভ্রূকুটিটা তখন খুব অস্পষ্ট নয়। কিন্তু নাগাপ্পা সেটা যেন লক্ষই না করে পরম আপ্যায়নের হাসি হেসে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন—"ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? ক্যান্টিনে? নাই গেলেন আর। লাঞ্চটা আজ আমার এখানেই সারুন-না!"

"না, ধন্যবাদ!"—ভদ্রতার হাসির ভানটুকু পর্যন্ত না করে জবাব দিলাম।

"কিন্তু জন কয়েকটা ভালো টিনের খাবার এনেছে।"—নাগাপ্পা তবু খাবারের ঘুষ দিয়ে জপাবার চেষ্টা করলেন—"ক্যান্টিনের সেই ত একঘেঁয়ে খানা! একটু মুখ বদলে যান-না!"

pathagar.net

"না, আমার এখন অন্য কাজ আছে।" বেশ রুক্ষভাবেই জানিয়ে এবার সোজা বেরিয়ে চলে গেলাম। নাগাপ্পার মুখের চেহারাটা এ জবাবে কিরকম হল, লোভ হওয়া সত্ত্বেও একবার ফিরেও দেখলাম না।

যেতে যেতে নাগাপ্পার এই নির্লজ্জ আপ্যায়নের কারণটা বোঝবার চেষ্টা করছিলাম।

আমাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করে কি মতলব সে হাসিল করতে চায়?

আমি যে তার গোপন গতিবিধি জেনে ফেলেছি সে সম্বন্ধে ত আর কোনো প্রশ্নই নেই। সকলের কাছেই তা আমি প্রকাশ করেছি। এরপর জানাটা আমার কতদূর, যেটুকু বলেছি তা বাদে আরো কিছু আমি হাতে রেখেছি কি না, তাই বার করাই কি তার উদ্দেশ্য?

শুধু লাঞ্চ খাইয়েই কি তা সে বার করবার আশা রাখে? আর বার করতে পারলেও তাতে তার লাভ কি হবে কিছু?

আমার মুখ ত তাকে বন্ধ করতে হবে! কেমন করে তা সে করবে ভেবেছিল? লাঞ্চের টিনের খাবারের চেয়ে আরো বড় কোনো ঘুষের ব্যবস্থায়?

একবার এমনও মনে হচ্ছিল যে, নাগাপ্পার লাঞ্চের নিমন্ত্রণটা নিলেও মন্দ হত না। বেকায়দায় পড়ে কি চাল সে চালে তা অন্তত জানা যেত।

কিন্তু নাগাপ্পা কি এমন সোজা লোক যে তার সব প্যাঁচ আমি এত সহজেই ধরে ফেলতাম!

সে একেবারে পাকা ঘুঘু। উদ্দেশ্যটা, তার যত স্পষ্টই হোক, তা সফল করবার জন্যে সামনাসামনি ঘুষ দেবার মত এমন একটা মোটা চাল সে চালবে না।

লাঞ্চটা সুতরাং তার মতলব হাসিলের একটা নির্দোষ ভূমিকা মাত্র। সে ভূমিকা থেকে তার গোপন চাল ধরবার আশা করাই ভুল। লাঞ্চের নিমন্ত্রণ না নিয়ে খুব লোকসান তাই হয়নি।

কিন্তু এখন আমার কি করা উচিত?

সরকার সাহেবের তাঁবু আর ক্যান্টিন, দু জায়গাতেই খোঁজ নিয়ে বঙ্কুবাবু এখনো ফেরেন নি জানবার পর সেইটেই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

নাগাপ্পার তাঁবুঘরের সভায় বঙ্কুবাবুর কথাটা শেষ পর্যন্ত চেপেই গেছলাম। ভালোই করেছিলাম এ বিষয়ে আমার নিজের কোনো সন্দেহ নেই। তার গোপন গতিবিধির সাক্ষী যে একজন নয়, দুজন, এ খবরটা অন্তত নাগাপ্পা এখনো জানতে পারেনি।

কিন্তু বঙ্কুবাবুর নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারটা আর ত শুধু নিজের কাছে চেপে রাখা উচিত নয়!

বঙ্কুবাবুর যদি গুরুতর কিছু হয়ে থাকে তা হলে তার জন্যে নিজেকে অনেকখানি দায়ী না করে যে পারব না!

সাঙ্ঘাতিক কিছু যদি না ও হয়ে থাকে তা হলেও অস্বাভাবিক কিছু যে ঘটেছে এ বিষয়ে ত সন্দেহ নেই। ওরকম একটা ভোজনরসিক বোকা-সোকা ভালো মানুষ সখ করে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ ত আর বিশ্বাস করবার নয়।

কি যে বঙ্কুবাবুর হতে পারে তা নিয়ে নিজের মনে জল্পনা কল্পনা করতেও যেন ভয় করে।

pathagar.net

আর যাই হোক আনাড়ী নতুন লোক ত নন যে, পাহাড়-জঙ্গলের রাস্তা ভুল করে পথ হারিয়ে বসে থাকবেন! বরং এ সব অঞ্চলের পথঘাট তাঁর অন্য অনেকের চেয়ে ঢের বেশী মুখস্থ। আদিবাসীদের পাহাড়ের অজানা পাকদণ্ডীর রাস্তায় তিনিই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

তাঁর এক দিন এক রাত না ফেরার কারণ তা হলে ত দুর্ঘটনা বলে ধরতে হয়। পাকদণ্ডীর পথে কোথাও বেকায়দায় পড়েটড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে আছেন? না, দুর্ঘটনাটা তার চেয়ে বেশী গুরুতর? কোনো হিংস্র প্রাণী, মানে সেই বুনো হাতীটাই—

এর বেশী আর ভাববার চেষ্টা করিনি।

মনে মনে তখনি সঙ্কল্প স্থির করে নিয়ে সোজা লোকনাথ মাইনিং সিন্ডিকেটের ছাউনিতে গিয়ে ঢুকলাম।

দশ

খাস তাঁবুঘরে মামাবাবু আর মহান্তী তখন লাঞ্চ খেতে বসেছেন।

তাঁদের সঙ্গে সরকার সাহেবও হয়ত জুটে গেছেন ভেবে যে ভয়টা পেয়েছিলাম তা অমূলক। ভাগ্য ভালো যে সরকার সাহেব এ বেলায় নিজের তাঁবুতেই খাওয়া সারতে গেছেন।

আমায় দেখে মহান্তী অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—"কোথায় ছিলে তুমি, সেন! আমরা ত কতক্ষণ অপেক্ষা করে এসে খেতে বসছি!"

মামাবাবু একটু হেসে বললেন—"লোধমা পাহাড়ের যা সব গোলমেলে ব্যাপার, তোর জন্যে তল্লাশি পার্টি পাঠাব কি না ভাবছিলাম!"

"আমার জন্যে নয়, সার্চ পার্টি সত্যিই পাঠান দরকার।"—খাবার টেবিলে একটা চেয়ার টেনে বসে জোর দিয়ে বললাম—"আর এক্ষুনি।"

"কার জন্যে!"—মহান্তী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"আচ্ছা, যার জন্যেই হোক সে পাঠান যাবেখ'ন!"—মামাবাবু কথাটাকে আমলই না দিয়ে যেন ছেলেমানুষকে প্রবোধ দেবার ভঙ্গীতে বললেন—"তুই এখন খেতে বোস দেখি!"

"না, খেতে বসতে পারব না!"—সত্যিই অস্থির হয়ে উঠলাম—"আমায় যখন আরাম করে খেতে বসতে বলছ তখন একটা লোক কত বড় সাঙ্ঘাতিক বিপদের মধ্যে যে পড়েছে তা ভাবতেও পারছি না। এখনো বেঁচে আছে কি না তাই বা কে জানে!"

"কার কথা বলছিস?"—মামাবাবুর মুখে সে তাচ্ছিল্যের ভাব আর নেই।

"বলছি বঙ্কুবাবুর কথা।"—তীক্ষ্ণস্বরেই জানালাম।

"বঙ্কুবাবু! বঙ্কুবাবুর কথা বলছিস!"

মামাবাবু যেভাবে নামটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে উচ্চারণ করলেন তাতে তিনি যে রীতিমত বিচলিত হয়েছেন তা স্পষ্টই বোঝা গেল। তাঁর টনক এতক্ষণে নড়াতে পেরেছি জেনে খুশী হলাম।

"কি হয়েছে বঙ্কুবাবুর?"—মহান্তী একটু বিমূঢ়ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন।

pathagar.net

"আজ দু দিন ধরে তিনি লোধমা পাহাড়ে ফেরেন নি।"—বলে সেদিন সকালে আদিবাসীদের পাহাড়ে আমাদের অভিযানটার প্রায় পুরোপুরি বিবরণই দিলাম।

মামাবাবু আর মহান্তী দুজনেই অত্যন্ত গম্ভীর চিন্তিতমুখে সমস্ত বিবরণ শুনলেন।

মামাবাবুর প্রথম মন্তব্যটা বেশ একটু তীক্ষ্ণই শোনাল তারপর। অভিযোগটা যেন আমার বিরুদ্ধেই—"এসব কথা আগে বলিস নি কেন?"

"আপনাকে পাচ্ছি কোথায় যে বলব!" আমিও অভিমানটা প্রকাশ করলাম—"তাছাড়া নাগাপ্পার ওখানে এ কথা জানাতেই ত গেছলাম। কিন্তু সেখানে যা দেখলাম, শুনলাম তাতে এ কথাটা চেপে যাওয়াটাই ঠিক হয়েছে মনে হচ্ছে।"

"হুঁ!"—স্পষ্ট কোনো উত্তর না দিয়ে মামাবাবু তখন তন্ময় হয়ে আর একটা কি যেন ভাবতে ভাবতে উঠে পড়েছেন।

আমি যে হাজির আছি তা যেন ভুলেই গিয়ে মামাবাবু মহান্তীকে তাড়া লাগিয়ে বললেন—"নাও, মহান্তী, তাড়াতাড়ি তৈরী হও। এখুনি বেরুতে হবে। নাগাপ্পার শুধু একবার খোঁজ নাও।"

'নাগাপ্পার খোঁজ আবার কেন?'—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার দরকার হল না।

নাগাপ্পার সেই হেডবেয়ারা একটা চিঠি নিয়ে তখন সেলাম দিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

চিঠিটা তার হাত থেকে নিয়ে খুলে পড়তে পড়তে মামাবাবুর মুখের চেহারা যা দেখলাম তাতেই চিঠিটায় গুরুতর কিছু আছে বলে সন্দেহ হল।

সে সন্দেহ আরো দৃঢ় হল নাগাপ্পার বেয়ারা চলে যাবার পর মামাবাবুর উত্তেজনাটুকু দেখে।

"মস্ত বড় একটা ভুল করে ফেলেছি, মহান্তী!" নাগাপ্পার চিঠিটা মহান্তীর হাতে দিয়ে মামাবাবু যেন বেশ একটু অস্থির যন্ত্রণার সঙ্গে বললেন—"এই একটা ভুলের জন্যে আমাদের এত সব চেষ্টা বানচাল হয়ে গিয়ে সাঙ্ঘাতিক একটা সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। চল, আর এক মুহূর্ত দেরী করা নয়।"

আমাকে দুজনে মিলেই সম্পূর্ণ আগ্রাহ্য করায় সত্যিই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম—"কিন্তু ব্যাপারটা কি! কি লিখেছেন নাগাপ্পা তা আমি জানতে পারি না?"

"নিশ্চয়ই পার!" মহান্তী চিঠির চিরকুটটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—"আজ সন্ধ্যায় নাগাপ্পার আমাদের সঙ্গে ল্যাবরেটরীতে একটা কাজে থাকবার কথা ছিল। নাগাপ্পা চিঠিতে জানিয়েছে যে, অন্য বিশেষ দরকারে তাকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে বলে সন্ধ্যায় সে ল্যাবরেটরীতে আসতে পারবে না।"

"তার মানে নাগাপ্পা এর মধ্যেই বেরিয়ে গেছে?" আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"হ্যাঁ।"—মামাবাবু যেন নিজেকে ধিক্কার দিয়েই বললেন—"আর একটু আগে হুঁস হলে এই যাওয়াটা বন্ধ করতে পারতাম। এখন যে কোনো দুঃসংবাদের জন্যে তৈরী থাকতে

pathagar.net

হবে। চল মহান্তী, আজ রাত্তিরটা খোলা আকাশের নীচেই কাটাতে হবে। সামান্য যা একটু দরকার সঙ্গে নাও।"

মামাবাবুর কথাবার্তা শুনে আর ভাবগতিক দেখে আমি তখন যেমন অবাক তেমনি দস্তুরমত ক্ষুব্ধ। মহান্তী মামাবাবুর ফরমাস রাখতে যাওয়ার পর বেশ গম্ভীর হয়ে বললাম—"আপনারা কোথায় কেন যাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। তা বোঝবারও এখন দরকার নেই। কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি ত?"

"তুই?"—মামাবাবু বেশ একটু ফাঁপরে পড়েছেন মনে হল। একটু ইতস্ততঃ করে শেষে একটু যেন অপ্রস্তুতভাবেই বললেন—"তুই—মানে—তুই গেলে এ লোধমা পাহাড়ে পাহারায় থাকবার আর কাউকে পাব না যে! মহান্তীর এ অঞ্চল ভালো করে চেনা বলে তাকে সঙ্গে নিতে হচ্ছে। কিন্তু এখানেও হুঁশিয়ার বিচক্ষণ কারুর থাকা ত দরকার! এ ভার নেবার মত আর কেউ যে নেই!"

কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়, কিন্তু যুক্তির খাতিরে নয়, অভিমানেই টঙ-হয়ে-যাওয়া-মেজাজে গোমড়া মুখে মামাবাবুর অনুরোধটা তখনকার মত বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলাম।

লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে পাহারা দেবার ভার চাপিয়ে দিয়ে মামাবাবু শুধু মহান্তীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

মুখে প্রতিবাদ না করলেও মনে মনে এ ব্যবস্থায় গুমরেছি।

লোধমা পাহাড়ে পাহারা দেবার জন্যে কারুর যে থাকা দরকার মামাবাবুর এ যুক্তির বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই। কিন্তু এ পাহারার দায় কি আর কারুর ওপর চাপান যেত না? এ ভার নেবার সবচেয়ে উপযুক্ত লোক ত মহান্তী! তিনি এখানকার কর্তাব্যক্তিদের একজন। লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে এ সময়ে তাঁরই ত থাকা দরকার ছিল।

তাছাড়া আদিবাসীদের পাহাড়ের রহস্যভেদের সব চেয়ে দামী হদিস আমি যে কষ্ট করে যোগাড় করেছি এটুকু গর্ব নিশ্চয় করতে পারি।

বঙ্কুবাবুর দু'দিন ধরে নিখোঁজ হবার খবরটা আমার কাছেই পেয়ে আমাকেই এখানে ফেলে রেখে যাওয়াটা কি মামাবাবুর উচিত হয়েছে? কোথায় কি কি দেখেছি তা আমি সঙ্গে থাকলে ত ভালো করে বোঝাতে পারতাম।

শুধু তাই নয়, বঙ্কুবাবুর খোঁজ করবার জন্যে কোথায় তাঁর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল সে জায়গাটা জানা ত একান্ত দরকার। বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে। আমি সঙ্গে না থাকলে এখন থেকে সন্ধে পর্যন্ত মামাবাবুদের এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়ানই ত সার হবে! রাত্রের অন্ধকারে খোঁজাখুঁজি তাঁরা নিশ্চয় করবেন না।

মামাবাবু যাবার সময় বাইরে রাত কাটাবার কথা অবশ্য বলেছেন। তখন রাগে অভিমানে কথাটা ভালো করে খেয়াল করিনি। এখন কিন্তু ভাবতে গিয়ে মামাবাবুর মতলবটার কোনো মানে পেলাম না।

মামাবাবুর ওপর যতই অভিমান হোক, তাঁর প্রতি অবিচার করতে পারব না। একেবারে কিছু না বুঝে-সুঝে নেহাত ঝোঁকের মাথায় অকারণে কিছু করবার মানুষ তিনি নন। অত

pathagar.net

ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে রাত পর্যন্ত পাহাড়ে জঙ্গলে কাটাবার মতলব যখন তিনি করেছেন তখন কিছু একটা উদ্দেশ্য তার পেছনে নিশ্চিয় আছে।

সে উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে বোঝবার চেষ্টায় এ পর্যন্ত আদিবাসী-খুনের রহস্য সম্বন্ধে যা যা যতটুকু জানা গেছে মনের মধ্যে একবার আউড়ে নিলাম।

গোড়া থেকে এ পর্যন্ত পরপর সমস্ত ব্যাপার সংক্ষেপে এইভাবে সাজান যায়।

প্রথম : মহান্তীর লোকনাথ মাইনিং সিন্ডিকেটের একজন আদিবাসী চাপারাশি বুনো ক্ষ্যাপা হাতীর আক্রমণে মারা যাওয়ার খবর।

দ্বিতীয় : আদিবাসীদের পবিত্র যে এঞ্চা পাহাড়ে কারুর ওঠা বারণ তাতে দূরবীনের সাহায্যে আমার কাউকে উঠতে দেখা। এই গোপন আরোহী নাগাপ্পা বলে পরে সন্দেহ হওয়া।

তৃতীয় : লোধমা পাহাড়ে সরকার সাহেবের কিছু ছেঁড়া বাজে কাগজের দলা কুড়িয়ে পাওয়া। মামাবাবুর বিচক্ষণতায় সে কাগজে সাঙ্কেতিক অক্ষরে প্ল্যাটিনামের বাজারদর আর যে পাথর থেকে তা পাওয়া যায় তার আঁকা ইঙ্গিত আবিষ্কার।

চতুর্থ : নাগাপ্পার বন্ধু ইংরেজ শিকারীর মারফত আদিবাসীদের খুন হওয়ার দিন মহাবুয়াং-এর ক্ষ্যাপা হাতীর এ অঞ্চলে আসা অসম্ভব বলে জানা।

পঞ্চম : আমার ও বঙ্কুবাবুর কাছে আদিবাসীর খুনের জায়গায় নাগাপ্পার গোপন রহস্যজনক গতিবিধি ধরা পড়া।

ষষ্ঠ : বঙ্কুবাবুর আশ্চর্যভাবে নিখোঁজ হওয়া।

সপ্তম : মহাবুয়াং-এর ক্ষ্যাপা হাতী এ অঞ্চলে আসা অসম্ভব হলেও আদিবাসীদের পাহাড়ে নাগাপ্পার সযত্নে সংগ্রহ করা জিনিস হাতীর বিষ্ঠা বলেই প্রমাণ হওয়া।

অষ্টম : সরকার সাহেবের কুড়িয়ে পাওয়া কাগজের দলার হাতের লেখার সঙ্গে নাগাপ্পার লেখার কিছুটা মিল পাওয়া। সে কাগজও নাগাপ্পার অফিসের প্যাডের বলে সন্দেহ হওয়া।

নবম : নাগাপ্পা যে কোম্পানীর প্রতিনিধি, তার নামটা সম্বন্ধেই সন্দিগ্ধ হওয়ার কারণ পাওয়া।

দশম : তাঁর গোপন গতিবিধি আমি লক্ষ করেছি জানবার পর নাগাপ্পার আমাকে আপ্যায়িত করবার চেষ্টা।

একাদশ : বঙ্কুবাবু দুদিন ধরে নিখোঁজ জানবার পর মামাবাবুর অকস্মাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজনা।

দ্বাদশ : বিকেলে মামাবাবুদের সঙ্গে ল্যাবরেটরীতে যোগ দেবার কথা দিয়েও নাগাপ্পার হঠাৎ লোধমা পাহাড় ছেড়ে যাওয়া আর সে খবরে মামাবাবুর যেন বেশী রকম শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠা।

মোটামুটি এই বারো দফা খেই থেকে আপাতত একটি মাত্র ইঙ্গিত যা পাওয়া যাচ্ছে তা ত এই, সুস্পষ্ট অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ এখনো না থাকলেও সমস্ত রহস্যের মধ্যে নাগাপ্পার নিশ্চিত একটা সন্দেহজনক ভূমিকা আছে।

pathagar.net

বঙ্কুবাবু নিখোঁজ জেনে মামাবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু নাগাপ্পা হঠাৎ লোধমা পাহাড় ছেড়ে চলে গেছে জেনে সে উত্তেজনা যেন অস্থির আতঙ্ক হয়ে উঠেছে।

কেন?

নাগাপ্পার কোনো ভয়ঙ্কর মতলব তিনি কি তা হলে আঁচ করতে পেরেছেন? বাইরে সারা রাত কাটাবার কথা তাঁকে কি নাগাপ্পার শয়তানী ব্যর্থ করবার জন্যেই ভাবতে হয়েছে?

তাই হওয়াই সম্ভব। কিন্তু সারারাত বাইরে কাটালেই নাগাপ্পাকে কি তিনি ঠেকাতে পারবেন?

নাগাপ্পার শয়তানী মতলবই বা এখন কি হতে পারে?

কথাটা ভাবতে ভাবতেই পোড়ান কাগজ-পত্রের ছাইয়ে ভর্তি করা আদিবাসীদের পাহাড়ের সেই লুকোন গর্তটার কথা মনে পড়ল। সেই লুকোন গর্তে সমস্ত রহস্যের খুব দামী কিছু সূত্র যে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আহাম্মক বঙ্কুবাবুর যুক্তি শোনাই সেদিন ভুল হয়েছে। গর্তটা আরো ভালো করে হাতড়ে তার কিছু মাল-মশলা সেদিন সঙ্গে নিয়ে আসাই উচিত ছিল। নাগাপ্পার বিরুদ্ধে কিছু জোরালো প্রমাণ হয়ত তাহলে হাতে থাকত।

সেই গোপন গর্তটাই যে নাগাপ্পার এখন প্রধান লক্ষ্য হবে এ বিষয়ে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। আদিবাসী খুন হওয়ার ব্যাপারের এমন একটা সাক্ষ্য প্রমাণের পুঁজি নাগাপ্পা অন্যের হাতে নিশ্চয় পড়তে দেবেন না। তাঁর ওপর সন্দেহ যখন জেগেছে বলে তিনি টের পেয়েছেন তখন সামান্য কিছু সূত্রও কোথাও থাকলে তিনি তা নষ্ট করবার চেষ্টাই আগে করবেন।

কিন্তু আর যাই বুঝে থাকুন, মামাবাবু এই গোপন গর্তের কথা ত কিছু জানেন না। সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে বললেও নিজে থেকে এ গর্ত খুঁজে পাওয়া মামাবাবুর পক্ষে অসম্ভব।

নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে এরপর মনে আর কোনো দ্বিধা থাকে না। মামাবাবুর আমাকে সঙ্গে না নেওয়া ভুল হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমারও অভিমান করে তাঁবুতে বসে থাকা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। এতক্ষণে নাগাপ্পা অনেকখানি এগিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু বঙ্কুবাবুর দেখান পাকদণ্ডীর পথ যদি তাঁর জানা না থাকে, তা হলে এখনো হয়ত ঘুরপথে মাঝামাঝির বেশী তিনি পৌঁছন নি। একবার মাত্র দেখা পাকদণ্ডীর পথ ঠিক মত চিনতে পারলে তাঁর আগে না হোক প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গায় আমি পৌঁছতে পারি।

এগারো

এক মুহূর্ত আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লাম। সারারাত বাইরে কাটাবার সম্ভাবনায় একবার একটা কম্বল গোছের কিছু সঙ্গে নেওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু চড়াইয়ের পথে তাড়াতাড়ি যাওয়ায় তাতে বাধা হতে পারে ভেবে সে ইচ্ছাকে আর প্রশ্রয় দিইনি!

আমি যখন বেরিয়েছি তখন রোদের তেজ কমতে শুরু করে একটু লাল আভা তাতে লেগেছে। পাহাড়ের যে পিঠটা দিয়ে উঠতে হবে ভাগ্যক্রমে সেটা পশ্চিম ঢাল। ঘণ্টা দুইয়ের মত দিনের আলোয় পথ দেখে ওঠবার সুযোগ তাই পাওয়া যাবে। পাকদণ্ডীর পথ

চিনতে ভুল না হলে এই ঘণ্টা দুয়েকই যথেষ্ট। তার মধ্যেই ওপারের উপত্যকায় পৌঁছন শক্ত হবে না।

প্রথম দিকটায় একটু ধুকধুকুনি থাকলেও কিছুদূর ওঠবার পর মনের জোর বেড়েছে। জংলা পাহাড়ে একবার মাত্র উঠে নির্ভুল পথের চিহ্ন মনে করে রাখা প্রায় অসম্ভব। তবু মাঝে মাঝে দু-একটা সেরকম চিহ্নই যেন পেয়েছি বলে মনে হয়েছে।

পাহাড়ের পথে উঠতে মামাবাবুর আর মহান্তীর জন্যেও চারিদিকে নজর রেখেছি। কোনোরকমে তাঁদের সঙ্গে একবার দেখা হয়ে গেলে এখন সব চেয়ে ভালো হয়, ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়ার সময় কম্বল ত নয়ই, সঙ্গে একটা টর্চ বা অস্ত্র-শস্ত্র গোছের কিছুও নিই নি। পাহাড়ের ওপরে ঠিক সময়ে পৌঁছে নির্বিঘ্নে কাজ হাসিল করতে পারলেও তারপর রাতের কথা ভাবতে হবে। চিতা বা ভালুকের মত হিংস্র জন্তু-জানোয়ার এ পাহাড়ে ত আছেই, তার ওপর নাগাপ্পা যার বিষ্ঠার নমুনা দেখিয়েছেন সে ক্ষ্যাপা হাতী থাকাও অসম্ভব নয়। আত্মরক্ষার কোনো কিছুই যখন সঙ্গে নেই তখন মামাবাবুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ওপরই একমাত্র ভরসা।

কিন্তু সে আশাই শুধু বিফল হল না, ওপরে ওঠবার পর চারিদিকে একেবারে শূন্য দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

ওপরের উপত্যকায় পৌঁছেই নাগাপ্পার সাড়া পাব জেনে শেষের দিকটা বেশ সন্তর্পণে উঠছিলাম। ভেবেছিলাম নাগাপ্পাকে একেবারে যথাস্থানে যদি না দেখি, তা হলে খানিকটা অপেক্ষা করলেই তিনি উদয় হবেন। গোপনে নিঃশব্দে তাঁর ওপর নজর রাখবার জন্যে জংলা গাছ আর পাথরের বড় বড় চাঁইয়ের আড়াল দিয়ে গুঁড়ি মেরে গর্তের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে ছিলাম।

কিন্তু কোথায় নাগাপ্পা! প্রায় আধ ঘণ্টা বৃথাই অপেক্ষা করার পর চিন্তিত হয়ে উঠলাম। আমি পৌঁছবার আগেই কি নাগাপ্পা তাঁর কাজ সেরে চলে গিয়েছেন? কিন্তু তা ত অসম্ভব!

তা হলে আমার সমস্ত অনুমানই কি ভুল? এই লুকোন গর্তের মালমশলা সম্বন্ধে নাগাপ্পার কোনো মাথাব্যথা নেই? অন্তত আজই সেগুলো সরাবার জন্যে তিনি ব্যস্ত হননি?

নাগাপ্পা তা হলে কোথায় কি মতলবে এসেছেন? মামাবাবুই বা মহান্তীকে নিয়ে কি কাজে কোথায় ঘুরছেন? নিজের বুদ্ধির দোষে এক আজগুবি ধান্দায় এখানে এসে যে আহাম্মকি করেছি তারপর কি এখন আমি করতে পারি? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ পাহাড় থেকে নেমে লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা। এখনো পা বাড়ালে কিছুটা আলোয় আলোয় অবশ্য নামা যাবে, কিন্তু তারপর? লোধমার ছাউনি পর্যন্ত পাহাড় জঙ্গলের একেবারে জনমানবহীন পথ ত আগাগোড়া অন্ধকার।

অস্বীকার করব না যে, ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরটা বেশ একটু কেঁপে উঠল।

কিন্তু ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় যখন নেই তখন সেইটাই মেনে নিতে হবে।

যাবার আগে শুধু লুকোন গর্তটা একবার নিজের চোখে দেখে যেতে চাই। প্রায় অসম্ভব হলেও নাগাপ্পা আমার আগে এসে কাজ সেরে গেছেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। এখনো পর্যন্ত যদি তা না পেরে থাকেন, তা হলে সেদিনকার ভুলটা সংশোধনও

pathagar.net

করতে হবে। গর্তটা ভালো করে তলা পর্যন্ত ঘেঁটে কাজে লাগাবার মত যা কিছু পাই, আজ আর সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলব না।

সেই উদ্দেশ্যেই টিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে লুকোন গর্তটার কাছে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

চমকটা ভয়ের নয়। তার বদলে বিস্ময়, উল্লাস আর সেই সঙ্গে গভীর বিমূঢ়তার বললে কিছুটা বোঝান যাবে।

চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম আমার বাঁ দিকে কিছু দূরে ক'টা জংলী গাছের জটলার মধ্যে বেশ চড়া গলার একটা বচসা শুনে। বচসা না বলে তাকে এক তরফা বকুনিই বলা উচিত। এক পক্ষ জ্বলন্ত স্বরে ধমক দিচ্ছে, আর অন্য পক্ষ ভয়ে ভয়ে যেন একটু প্রতিবাদ করে থেমে যাচ্ছে।

দু'পক্ষের গলাই আমার চেনা। তার মধ্যে একটি গলা আর কারুর নয়—বঙ্কুবাবুর।

বিস্ময় আর প্রায় অধীর উল্লাসটা সেই কারণে।

বঙ্কুবাবু তা হলে বেঁচে আছেন। শুধু বেঁচে নেই রীতিমত বহাল তবিয়তে যে আছেন তাঁর ছুঁচের মত সরু তীক্ষ্ণ গলার জোরেই তার প্রমাণ।

হ্যাঁ, বঙ্কুবাবুই রেগে কাঁই হয়ে কান ফুটো করা গলায় ধমক দিচ্ছেন আর ভয়ে ভয়ে তার মৃদু প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করছেন সরকার সাহেব।

আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে রীতিমত বিস্ময়-বিমূঢ়তাটা এই উল্টো পালার দরুন।

বিমূঢ়তাটা যত বেশীই হোক, তার সঙ্গে বেশ একটু খুশীও তখন আমার মনে মেশান। আজীবন অন্যায় জুলুম সয়ে সয়ে বঙ্কুবাবুও তা হলে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন, অসহ্য খোঁচানিতে নিরীহ পোকা যেমন রুখে দাঁড়ায়!

সরকার সাহেবের নাকাল অবস্থাটা চাক্ষুষ দেখবার লোভ হচ্ছিল। কিন্তু কাছে যেতে গিয়ে ওঁদের চোখে পড়লে সরকার সাহেবের চেয়েও বঙ্কুবাবুই বেশী অপ্রস্তুত হবেন। তাই গর্তটা খুঁজে নিয়ে সেটার ছাই মাটি সরিয়ে ঘাঁটতে ঘাঁটতে দূর থেকেই বঙ্কুবাবুর বকুনি থেকে তাঁর রাগের কারণটা বোঝার চেষ্টা করলাম।

তাঁর এ দুদিনের অন্তর্ধানের রহস্য থেকে শুরু করে বঙ্কুবাবুর কাছে অনেক কিছুই এখন জানবার আছে। কিন্তু তাঁর পাত্তা যখন পেয়ে গেছি তখন আমি নিশ্চিন্ত। লোধমা পাহাড়ে ফেরা সম্বন্ধে আর কোনো ভাবনা নেই। নির্ভাবনায় এই লুকোন গর্তের মালমশলা যা যা দরকার আপাতত বাছাই করে নিতে পারি।

লুকোন গর্তটায় ইতিমধ্যে আর যে কারুর হাত পড়েনি এটা সত্যিই আশ্চর্য।

সৌভাগ্যটা সত্যিই আশাতীত বলতে হয়।

নাগাপ্পার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসেই এটা হয়েছে বুঝলাম। এ গর্ত যে আর কেউ খুঁজে বার করে তার আসল মর্মটা আঁচ করতে পারে নাগাপ্পা তা কল্পনাই করেন নি। সুবিধা ও সময় মত এ গর্তের জিনিস সরালেই হবে এই বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে না থাকলে এ গর্তের জিনিস দ্বিতীয়বার ঘাঁটবার সুযোগ আমি পেতাম না।

ওপরের শুকনো পাতা-টাতার জঞ্জাল সরিয়ে গর্তটার ভেতরে হাত চালাতে চালাতে বঙ্কুবাবুর প্রায় ক্ষেপে-ওঠা গলার ধমক আর বকুনি শুনতে পাচ্ছিলাম।

pathagar.net

ওপর ওপর যেটুকু শুনলাম, তাতে বঙ্কুবাবুর রাগের কারণটা ঠিক স্পষ্ট অবশ্য বোঝা না গেলেও এই দু'দিন ধরে তাঁর পাহাড়ে জঙ্গলে কাটাতে হওয়ার জন্যেই সরকার সাহেবের ওপর মেজাজটা যে খিঁচড়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না।

তাঁর এক-আধটা কথায় সেই গায়ের জ্বালাই প্রকাশ পাচ্ছিল।

"বড় চাকরে হয়েছেন! সাহেব সেজে ডাঁট দেখাচ্ছেন অফিসে। ভাবছেন উনি একটা মস্ত কেওকেটা! ওঁকে ঘাড়ধাক্কায় একেবারে পাহাড়ের তলায় গড়িয়ে দেবার কেউ নেই! কোন মাতব্বরী করছিলেন ওখানে যে একবার খবর নিয়ে যাবার ফুরসত হয়নি!"

জবাবে সরকার সাহেব কি যেন একটা বললেন। তাতে যেন আগুনে ঘি পড়ল। বঙ্কুবাবুর গলা আরো ছুঁচোল হয়ে উঠল—"হ্যাঁ, আমি ত একটা হেঁজি পেঁজি আরদালী! ম্যানেজার সাহেব তাই আমার কথা ভুলেই গেছলেন—"

শুনতে শুনতে বঙ্কুবাবুর কথাগুলো যেন কোথায় হারিয়ে গেল। গর্তটা হাঁটকাতে হাঁটকাতে তখন এমন কিছু পেয়েছি যে সমস্ত মন তাতেই মগ্ন হয়ে গেছে।

জিনিষটা সামান্য একটা পেতলের চাকতি। কিন্তু এই খুনের রহস্যের ব্যাপারে তার দাম যে কত তা আমার বুঝতে বাকী নেই।

পেতলের চাকতিটা পিয়ন বা আরদালীদের ব্যাজ গোছের। তাদের জামায়, কোমরবন্ধে বা হাতার ওপরে লাগান থাকে। এ চাকতিটা বিশেষভাবে আমার চেনা। মহান্তীর লোকনাথ মাইনিং সিন্ডিকেটের চাপরাসী পিয়নদের পোষাকে এ চাকতি আমি দেখেছি।

চাকতিটা পাবার পর উদগ্রীব হয়ে গর্তটা আরো তাড়াতাড়ি হাঁটকাতে লাগলাম।

বেশীর ভাগই শুধু ছাইপাঁশ। তার ভেতর থেকে অর্ধেক-পোড়া ক'টা কাগজের টুকরো মাত্র উদ্ধার করা গেল। কিন্তু সেই একটা টুকরোই ভালো করে লক্ষ করে স্থান কাল সব ভুলে যেতে আমার দেরী হল না।

কাগজের টুকরোটার ওপর ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরের লেখাগুলো কোনোটাই সম্পূর্ণ পড়বার উপায় নেই। কাটাকাটা ক'টা শব্দ আর সংখ্যা মাত্র তা থেকে পড়া যায়।

কিন্তু সেই সামান্য শব্দ আর সংখ্যাই মাথার টনক নড়াবার পক্ষে যথেষ্ট।

এক জায়গায় একটা শব্দ পাওয়া গেল ইংরাজীতে—"Olivi..."

শব্দটা সম্পূর্ণ নয়, তার বাকী অংশটা পুড়ে গেছে। সেই টুকরো কাগজটাতেই আর একটা সংখ্যা লেখা—"৩.৪!"

সংখ্যাটার শেষে এই বিস্ময়ের চিহ্নটাই অদ্ভুত। আর তার চেয়ে বেশী অদ্ভুত আরেকটা আধ-পোড়া কাগজের টুকরোয় বোলতার চাকের মত একটা ছবির অংশ।

পোড়া কাগজে যেটুকু আছে তা দেখেই ছবিটা কিসের তা আমি এক নিমেষে বুঝলাম। এই ছবির মর্মই নাগাপ্পার আস্তানায় মামাবাবু আজই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ছবিটার নীচে একটা নতুন শব্দও পাওয়া গেল। শব্দের সামনের একটা অক্ষর নেই। পরে যা লেখা আছে তা হল "... imberlite।"

তন্ময় হয়ে এই কাগজগুলো দেখতে দেখতে বঙ্কুবাবু আর সরকার সাহেবের কথা ভুলেই গেছলাম। হঠাৎ একেবারে ঘাড়ের কাছে একটা নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেয়ে চমকে ফিরে দেখি, বঙ্কুবাবু।

কখন যে তাঁদের ঝগড়া থামিয়ে বঙ্কুবাবু আমার পেছনে এসে কৌতূহলের উঁকি দিতে বসেছেন তা টেরই পাই নি।

উৎসাহভরে বললাম—"কি পেয়েছি দেখছেন?"

"তা ত দেখছি!" বঙ্কুবাবু পাশে এসে বসে তার পেটেন্ট কাঁদুনে গলায় বললেন—"কিন্তু আপনি কখন এখানে এলেন?"

পোড়া কাগজের টুকরোগুলো সযত্নে পকেটে রাখতে রাখতে হেসে বললাম—"এসেছি বেশ কিছুক্ষণ। তখন আপনি সরকার সাহেবকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছেন! সত্যি এত দিনের অত্যাচারের শোধ যা নিয়েছেন তাতে কি খুশী হয়েছি কি বলব!"

বঙ্কুবাবুর মুখখানা এবার দেখবার মত। আমার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ছুঁচোল গলায় যেন অভিযোগের সুরে বললেন—"আপনি আমাদের ঝগড়াও তাহলে শুনেছেন?"

"সব কি আর শুনেছি!"—বঙ্কুবাবুকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলাম—"শুনতে শুনতে এই গর্তে যা পেলাম তাতে আর কোনো কিছুর হুঁসই রইল না।"

"পেয়েছেন ত ওই দুটো পোড়া কাগজকুচি!"—বঙ্কুবাবুর বিদ্রূপের চেষ্টা কাঁদুনে গলায় ঠিক ফুটল না।

"শুধু পোড়া কাগজকুচি!"—এবার বঙ্কুবাবুকে অবাক করবার জন্যেই পকেট থেকে চাকতিটা বার করে বললাম—"দেখেছেন, এটা কি?"

এবার বঙ্কুবাবুর চোখ দুটো সত্যিই বিস্ফারিত হল।

তাঁকে আরো ভালো করে আমার কৃতিত্বটা জানাবার জন্যে বললাম—"এ চাকতিটার মানে বুঝতে পারছেন? এ হল লোকনাথ মাইনিং সিন্ডিকেটের পিয়ন চাপরাসীদের চিহ্নিত করবার চাকতি। আদিবাসী পিয়নটির এ চাকতি এই গর্তের ভেতর কে পুঁতে রাখতে পারে? ক্ষ্যাপা হাতী গোদা পায়ে থেঁতলে মেরে এখানে গর্ত খুঁড়ে চাকতি পুঁতে নিশ্চয় রাখেনি। এ কাজ কোনো মানুষের আর এরকমভাবে লুকোবার চেষ্টা থেকেই আদিবাসী পিয়নকে খুন করার আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়তে পারে।"

"তা হলে আদিবাসী পিয়নকে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ খুন করেছে, আপনি মনে করেন?" বঙ্কুবাবুর জিজ্ঞাসার ধরনে মনে হল আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে বলেই তাঁর সন্দেহ—"কিন্তু একটা সামান্য জংলী পিয়নকে এত প্যাঁচ কষে খুন করবার সত্যি কোনো কারণ থাকতে পারে কি?"

"নিশ্চয় পারে।"—জোর দিয়েই বলতে পারলাম এবার—"আর সে কারণ যে কি তা এই পোড়া কাগজকুচির মধ্যে পাওয়া অসম্ভব নয়। মামাবাবুর সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে গেলে এখুনি হয়ত ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যেত।"

"এখানে মামাবাবুর সঙ্গে দেখা!" বঙ্কুবাবু বেশ হতভম্ব—"এখানে তিনি কোথা থেকে আসবেন! তাঁর ত আপনার মত মাথায় পোকা ঢোকেনি!"

"ঢুকেছে আরও বেশী!"—বলে দুপুরে নাগাপ্পার ছাউনির সভায় যা যা হয়েছে ও তারপরে মামাবাবু ও মহান্তী যেভাবে এ পাহাড়ের দিকেই রওনা হয়েছেন তার মোটামুটি বিবরণ বঙ্কুবাবুকে দিলাম।

pathagar.net

এ বিবরণ সত্যি কথা বলতে গেলে বঙ্কুবাবুর খাতিরে দিই নি। নিজের মনেই সমস্ত ব্যাপারটা আরো ভালো করে গুছিয়ে নেবার জন্যে প্রায় স্বগতভাবে মুখে বলে গিয়েছি।

বিবরণ দিয়ে নিজের আশাটার ওপর আর একবার জোর দিয়ে বললাম—"সরকার সাহেবের ওই ছেঁড়া কাগজের দলা থেকে মামাবাবু যা উদ্ধার করেছেন, এ পোড়া কাগজকুচি পেলে তার চেয়ে বেশী কিছু পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।"

"দেখি কাগজগুলো!"—এতক্ষণে বঙ্কুবাবু আগ্রহ প্রকাশ না করে পারলে না।

"না, আর এ কাগজ আপনার হাতেও দিচ্ছি না!"—হেসে পকেটটায় হাত চাপা দিয়ে বললাম—"আর এ কাগজ নিয়ে আপনি করবেনই বা কি। আপনি খনিজ বিশারদও নন, গোয়েন্দাও নন।"

"না, তা কিছুই নই!"—করুণ কাঁদুনে গলায় স্বীকার করলেন বঙ্কুবাবু—"আমি ত একটা আরদালীর বেশী কিছু না!"

সরকার সাহেবের ওপর বঙ্কুবাবুর খানিক আগেকার তড়পানির কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় হেসে ফেলে বললাম—"কিন্তু যেমন-তেমন আরদালী নন! ক্ষেপলে বড় সাহেবকে পর্যন্ত কেঁচো বানিয়ে ছাড়েন! আচ্ছা, সত্যি আপনার ব্যাপারটা কি বলুন ত? সেই আমার সঙ্গে এই পাহাড়ে ছাড়াছাড়ি হবার পর এ পর্যন্ত করছিলেন কি? ছিলেনই বা কোথায়?"

"কোথায় ছিলাম জিজ্ঞাসা করছেন! জিজ্ঞাসা করতে পারছেন? আপনার লজ্জা করছে না!"—বঙ্কুবাবুর কাঁদুনে গলা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল অভিযোগে—"একবার খোঁজ নিতে আসার কথাও মনে হয়েছিল কি? তিন দিন যে ফিরে যাই নি তা খেয়ালও বোধহয় করেন নি।"

বিরক্তি নয়, বঙ্কুবাবুর অভিযোগে তাঁর ওপর সহানুভূতিই হল। সত্যিই তাঁর পক্ষে নিজেকে সকলের এরকম পায়ে-ঠেলা ভাবা কিছু অন্যায় ত নয়। তিনি যে এ ক'দিন লোধমা পাহাড়ে নেই তা নিয়ে কারু ত এতটুকু মাথাব্যথা দেখি নি।

মাথাব্যথা বেশীরকম থাকা সত্ত্বেও কেন যে তাঁর খোঁজ নিতে আসতে পারিনি, সে কথা যথাসাধ্য বঙ্কুবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম এর পর।

প্রথমতঃ, তিনি যে সেদিন সকালে আমার গোয়েন্দাগিরির ধান্দায় সহায় হয়ে গিয়েছিলেন, সে কথাটা জানালে সরকার সাহেবের কাছে তাঁর লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না বলেই অনুমান করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত হয়ত তাঁর চাকরী নিয়েই টানটানি হতে পারে বলে ভয় হয়েছিল। অথচ তাঁর নিরুদ্দেশ হওয়া স্কন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে আমার সঙ্গে তাঁর আদিবাসীদের পাহাড়ে যাওয়ার কথাটা লুকোন যেত না।

অত্যন্ত অস্থির হলেও এ বেলা কি ও বেলা ফিরে আসবেন আশা করে তাই দুটো দিন বাধ্য হয়ে নিশ্চেষ্ট থাকতে হয়েছে।

আমার কৈফিয়তে বঙ্কু বাবুর মুখে একটু প্রসন্নতার আভা দেখে আগের প্রশ্নটাই আবার করলাম।

"আচ্ছা, সত্যি কি হয়েছিল বলুন ত এবার! দু'দিন দু রাত ছিলেন কোথায়?"

"হয়েছিল যা তা ভয়ানক, আর"—বঙ্কুবাবু আমায় একেবারে স্তম্ভিত করে দিয়ে বললেন— "ছিলাম এঞ্জা পাহাড়ে।"

pathagar.net

"এঞ্জা পাহাড়ে!" আমি অবিশ্বাসভরে বেশ একটু ভ্রূকুটির সঙ্গে বঙ্কুবাবুর দিকে তাকালাম।

কিন্তু বঙ্কুবাবু ত ঠাট্টা করবার মানুষ নন। তাই কথাটা ঠিক শুনেছি কি না যাচাই করবার জন্যে আমার জিজ্ঞাসা করতে হল—"এঞ্জা পাহাড়ে কি বলছেন? সেখানে পা দেওয়া বারণ আপনি জানেন না?"

"খুব জানি।"—বঙ্কুবাবু এক কথায় স্বীকার করে বললেন—"কিন্তু ওই বারণ বলেই সেখানে গিয়ে উঠেছিলাম, আর তাতেই এ পর্যন্ত প্রাণটা ধড়ে আছে।"

"তার মানে!"—রীতিমত বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"প্রাণ যাবার মত কি হয়েছিল আবার এর মধ্যে?"

যা হয়েছিল বঙ্কুবাবুর সঙ্গে যেতে যেতে সংক্ষেপে শুনলাম এরপর। শুনে সত্যিই অবাক হলাম।

আমায় সোজা পথ ধরিয়ে দিয়ে বঙ্কুবাবু সেদিন সাধারণের অজানা পাকদণ্ডীর পথে আদিবাসীদের পাহাড় থেকে নামছিলেন। হঠাৎ এক জায়গায় বন্দুকের শব্দে তিনি চমকে থেমে যান।

পাহাড়ে জঙ্গলে কাছাকাছি কোনো শিকারীর বন্দুকের আওয়াজ শুনেছেন বলে ভাববার তখন আর উপায় নেই। বন্দুকের গুলিটা তাঁর মাত্র হাত কয়েক দূরের একটা পাথরে লেগে ছিটকে গেছে।

এ গুলিটা আকস্মিকও যে নয়, একটু অপেক্ষা করার পর আবার নামতে গিয়েই তা টের পাওয়া গেছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও আরেকটা গুলির শব্দ তখন প্রতিধ্বনি তুলেছে পাহাড়ময়। গুলিটা যে তাঁর উদ্দেশেই ছোঁড়া এ বিষয়ে তখন আর কোনো সন্দেহ নেই।

গুলিটা নীচে থেকে কেউ ছুঁড়ছে, এই হয়েছে বঙ্কুবাবুর পক্ষে মুশকিল। ওপর থেকে কেউ ছুঁড়লে পাকদণ্ডীর পথে তাড়াতাড়ি নেমে গুলির নাগালের বাইরে পৌঁছে যাবার আশা করতে পারতেন। কিন্তু দুষমন নীচে থাকায় নামতে গিয়ে তার খপ্পরেই পড়বার ভয় হয়েছে।

অনেক ভেবেচিন্তে বঙ্কুবাবু ওপরেই ওঠবার চেষ্টা করেছেন এবার। যতদূর সম্ভব ঝোপ-জঙ্গলে আর চাঁই-পাথরের আড়াল দিয়ে ওপরে উঠতে কম সময় লাগেনি, কিন্তু দু-একবার গুলির নিশানা হলেও শেষ পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় আদিবাসীদের পাহাড়ের মাথায় উঠে আসতে পেরেছেন।

ওপরে উঠে বঙ্কুবাবু আর দ্বিধা করেন নি। লোধমা পাহাড়ে ফিরে যাবার চেষ্টা তখন বাতুলতা মনে হয়েছে। নীচে থেকে যে তাঁকে গুলি করতে চেষ্টা করেছে, সে এবারে হার মেনেই হাল ছেড়ে দেবার পাত্র বোধহয় নয়। এখানে বিফল হলেও লোধমা পাহাড়ে যাবার পথে কোথাও সে ওত পেতে থাকবেই। কোথায় যে থাকতে পারে তা ঠিকমত জানা যখন অসম্ভব তখন লোধমা পাহাড়ে যাবার ইচ্ছেটা অন্তত তখনকার মত চেপে থাকাই উচিত বলে বঙ্কুবাবুর মনে হয়েছে।

লোধমা পাহাড়ে ফিরে না গেলে কোথায় বা নিরাপদে থাকা যায় ভাবতে গিয়ে হঠাৎ এঞ্জা পাহাড়ের বিদঘুটে চুড়োটার দিকে তাঁর দৃষ্টি গেছে। আর সেই সঙ্গে মনে হয়েছে

BanglaBook.org

আদিবাসীদের অভিশাপে ঘেরা হওয়ার দরুণই এঞ্জা পাহাড় তাঁর পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ গোপন আশ্রয়।

বঙ্কুবাবুর সমস্ত কথা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু আপনাকে এভাবে গুলি করার চেষ্টা কে করতে পারে? যার পক্ষে করা সম্ভব সে ত আদিবাসীদের গাঁয়ের দিকেই উঠে গেছল!"

"উঠে যেতেই আমরা দেখেছি।"—বঙ্কুবাবু কাঁদুনে গলায় বললেন—"তার সঙ্গে আমাদের চোখ দুটো ত আর পাঠাই নি। কিছুদূর যাবার পর অন্য পথে পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে নেমে ওত পেতে থাকা শক্ত কিছু নয়।"

"কিন্তু কেন আপনার ওপর এ আক্রোশ?"

"এঞ্জা পাহাড়ে গেলে বুঝবেন।"—বলে বঙ্কুবাবু হাসলেন।

"এঞ্জা পাহাড়!"—সবিস্ময়ে বললাম—"সেখানেই যাচ্ছি নাকি?"

বারো

হ্যাঁ, এঞ্জা পাহাড়েই শেষ পর্যন্ত সেদিন গেলাম।

নিয়েই গেলেন অবশ্য বঙ্কুবাবুই। তিনি না পথ দেখালে আদিবাসীদের বসতির পাহাড় থেকে তাদের পবিত্র এঞ্জা পাহাড়ে যাবার গোপন রাস্তা সাত দিন সাত রাত খুঁজেও আমার পক্ষে বার করা সম্ভব হত না।

দুটো পাহাড়ের একটা জোড় অবশ্য এ অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করলে আমাদের মত আনাড়ীর চোখেও পড়তে পারে। কিন্তু বিরাট কোনো দানবীর ক্ষুরের খোলা ফলার মত সে ত খানিকটা খাড়া আর সম্পূর্ণ ন্যাড়া পাথরের ফালি মাত্র। সে জোড়ের পাহাড়ের গা-টা একেবারে মসৃণ আর মাথাটা ধারাল ফলার মত এমন সঙ্কীর্ণ যে মানুষ ত ছার পাহাড়ী ছাগলও তার ওপর দিয়ে যেতে পারে না।

সেই জোড়ের মাথার ওপর দিয়ে নয়, নীচের এক জায়গার আধা-সুড়ঙ্গ আধা-খাঁজ গোছের একটা লুকোন অজানা পথ দিয়ে বঙ্কুবাবু যখন আমাকে এঞ্জা পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে তুললেন তখন হাত পা শুধু নয় বুকের ভেতরটা পর্যন্ত আমার ঠান্ডা হয়ে গেছে।

শুধু যে অত্যন্ত দুর্গম সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী পথে প্রতি মুহূর্তে একেবারে অতলে পড়ে গুঁড়িয়ে যাবার ভয়েই হাত পা আর বুকের ভেতরটা হিম হয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টিরও বেশ একটু সাহায্য আছে।

আদিবাসীদের বসতির পাহাড় থেকে এঞ্জা পাহাড়ে যাবার গোপন রাস্তার মাঝামাঝি পৌঁছবার পরই হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। তখন এগোন আর পেছন দুই সমান। মরীয়া হয়ে তাই সামনেই কখনো কুঁজো হয়ে কখনো রীতিমত হামাগুড়ি দিয়েই এগোতে হয়েছে। আগে আগে পথ দেখিয়ে গেলেও বঙ্কুবাবুকে আমার চেয়ে খুব সাহসী মনে হয় নি। এক-আধবার খুব অতল খাড়াইয়ের ধারে তাঁর মুখের চেহারা যা দেখেছি তাতে মনে হয়েছে অতি বড় গরজ না থাকলে সখ করে এরকম বিপদের রাস্তায় তিনি আসতেন না।

গরজটা যে কত বড় এঞ্জা পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছবার খানিক বাদেই তা বোঝা গেছে। শুধু পাহাড়ের দুর্গম রাস্তায় আমাদের বিপদে ফেলবার জন্যেই ঝড়-বৃষ্টিটা যেন কোথায় ওত পেতে ছিল। আমরা রাস্তাটা পেরিয়ে আসবার পরই তখন প্রায় থেমে এসেছে।

বিপদ কাটিয়ে বঙ্কুবাবুর চেহারাও তখন অন্য রকম। যেতে যেতে আমাকে উৎসাহভরে এঞ্জা পাহাড়ের পরিচয় দিচ্ছিলেন।

আদিবাসীদের এ পবিত্র পাহাড়টা সম্বন্ধে এখনকার মত কড়াকড়ি বছর কুড়ি আগেও নাকি ছিল না। ইংরেজদের আমলে খনির কাজ-কারবারে প্রথম যে বিদেশীরা এ অঞ্চলে আসে তারা লোধমার বদলে এই পাহাড়েই তাদের ঘাঁটি বসিয়েছিল। তাদের তৈরী দু-একটা বাড়ীঘরের চিহ্ন এখনো এ পাহাড়ে দেখা যায়। পাহাড়ের এক-একটা জায়গার ইংরেজী নামেও সেকালের ছোঁয়া লেগে আছে, যেমন—ক্যামেল-হিল, পীক-ভিউ, স্নেক-ভ্যালি ইত্যাদি।

উটের পিঠের কুঁজের মত একটা পাথুরে ঢিবির তারা নাম দিয়েছিল ক্যামেল-হিল। চারিদিকের পাহাড় জঙ্গলের মাঝে কিছুটা সমতল একটা আঁকাবাঁকা উপত্যকা গোছের জায়গাকে বলত স্নেক-ভ্যালি আর প্রায় খাড়া অতলে নেমে যাওয়া একটা খাদের পাহাড়ের খানিকটা খাঁজ তাদের কাছে ছিল পীক-ভিউ! প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু এ পীক-ভিউয়ের নামটা ভুল দেওয়া হয়নি। সেখান থেকে দূরের দিকচক্রবাল ঘেরা যে দৃশ্য নীচে দেখা যায় তা সত্যিই অপূর্ব।

এঞ্জা পাহাড় যে আদিবাসীদের কাছে পবিত্র তা বিদেশীদের বোধহয় জানাই ছিল না, কিংবা জানলেও তারা গ্রাহ্য করেনি। এ পাহাড়ে মৌরসী পাট্টা নিয়ে একটা মনোরম সাহেবী আস্তানা গড়ে তুলবে এই ছিল তাদের কল্পনা। যে সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না কোনোদিন তার সত্যি সত্যি গণেশ ওল্টাবে তা কি তারা তখন ভাবতে পেরেছে?

কিন্তু সত্যিই অসম্ভব একদিন সম্ভব হল। রাজ্যপাট একদিন উঠল। সেই সঙ্গে কপালের দোষে কিংবা চেষ্টার ত্রুটিতে খনির কাজেও সুবিধে করতে না পেরে একদিন পাত্তাড়ি গুটিয়ে বিদেশীর দল আর কোথাও পাড়ি দিলে।

দেশ নিজেদের হাতে আসবার পর আর কিছু না হোক আদিবাসীদের ওপর সুবিচারের চেষ্টা হয়েছে। তাদের পবিত্র এঞ্জা পাহাড়ের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার এখন তাদেরই।

বঙ্কুবাবুর বিবরণ শুনতে ভালোই লাগছিল, কিন্তু হঠাৎ সন্দেহ হল কথা বলার উৎসাহে কোথায় যাচ্ছেন বঙ্কুবাবু তা বোধহয় ভুলেই গেছেন।

এদিকে ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলেও মেঘগুলো আরো ছড়িয়ে আকাশটা প্রায় ঢেকে ফেলেছে। সূর্য ডুবতে তখন আর দেরী নেই। তার ওপর এই মেঘের আবরণের দরুণ এই পাহাড়ের মাঝখানেও যেন সন্ধ্যার অন্ধকার আগে থাকতেই ঘন হতে শুরু করেছে।

দাঁড়িয়ে পড়ে বঙ্কুবাবুকে বাধা দিয়ে সেই কথাই জানালাম—"সন্ধ্যা হয়ে এল টের পাচ্ছেন?"

"সন্ধ্যা!" বঙ্কুবাবুর যেন সত্যিই এতক্ষণে সে হুঁস হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন— "তা সন্ধ্যে হলে ক্ষতিটা কি? সন্ধ্যে ত সময় মত হবেই।"

"কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়? এরপর আর কিছু দেখা যাবে?"—একটু অধৈর্যের সঙ্গেই বললাম—"মনে আছে এঞ্জা পাহাড়ে কি যেন আমায় দেখাবেন বলেছিলেন যা দেখলেই নাগাপ্পার কেন আপনার ওপর এত আক্রোশ বুঝতে পারব?"

বঙ্কুবাবু প্রথমে আমার দিকে যেভাবে চাইলেন তাতে মনে হল আমি আবোলতাবোল কিছু বকছি বলেই তাঁর সন্দেহ হচ্ছে। তারপর নিজের প্রতিশ্রুতিটা মনে পড়ায় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উঠলেন, বললেন—"সত্যি, সে কথাটা ভুলেই গেছলাম। তবে নিরাশ হবার কিছু নেই। এঞ্জা পাহাড়ে যখন এসেছেন তখন যা দেখবার সবই দেখবেন। আর আমি যা দেখাবার কথা বলেছি রাত্রেও তা দেখা আটকাবে না।"

"রাত্রেও দেখা যাবে!"—আমি সন্দিগ্ধভাবে বঙ্কুবাবুর দিকে চাইলাম। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবার স্পর্ধা ত বঙ্কুবাবুর হবার কথা নয়!

ঠাট্টা নিশ্চয় বঙ্কুবাবু করেন নি, কিন্তু তাঁকে সে বিষয়ে জেরা করার ফুরসত তখন আর হল না। হঠাৎ আমার একটা হাত সজোরে চেপে ধরে তিনি হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে যেখানে দাঁড় করালেন, সেটা আগেকার সেই বিদেশী খনি-সন্ধানীদের একটা প্রায় ধসে-পড়া পোড়ো বাংলো। নেহাত তখনকার দিনের সরেস মশলায় মজবুত করে তৈরী বলে একেবারে ধূলিসাৎ হয়নি। ওপরের টালির ছাউনি নিয়ে থামসমেত একটা চওড়া বারান্দার খানিকটা অংশ এখনো খাড়া আছে।

সেই বারান্দারই একটা থামের আড়ালে দাঁড়াতে বাধ্য হয়ে হতভম্ব হয়ে চাপা গলাতেই জিজ্ঞাসা করলাম—"কি হল কি হঠাৎ?"

কোনো উত্তর না দিয়ে বঙ্কুবাবু অত্যন্ত সন্তর্পণে বকের মত পা বাড়িয়ে বারান্দার ধার থেকে একবার ঘুরে এলেন। তারপর সেই কাঁদুনে গলারই অদ্ভুত ফিস ফিস সংস্করণ শুনিয়ে বললেন—"এখানেও এসেছে!"

"এখানেও এসেছে!"—শুধু কথাটা নয়, বঙ্কুবাবুর বলার ধরনেও আপনা থেকেই একটু শিউরে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম—"কে এসেছে? নাগাপ্পা?"

বঙ্কুবাবু করুণভাবে মাথা নাড়লেন।

"আমাদের দেখতে পেয়েছে?"—উদ্বেগের তীব্রতায় গলার স্বরটা চেপে রাখাই তখন শক্ত হয়ে উঠেছে।

"না, তা বোধহয় পায়নি।" বঙ্কুবাবু কিছুটা আশ্বস্ত করে জানালেন যে নাগাপ্পা কোনো কাজ সেরে এঞ্জা পাহাড় থেকে ফিরে যাচ্ছে বলেই মনে হয়। সুতরাং কিছুক্ষণ এই পোড়ো বাংলোতে লুকিয়ে থাকতে পারলে তাকে এখনকার মত এড়ান যেতে পারে।

বঙ্কুবাবুর যুক্তিটা না মেনে পারলাম না। বারান্দার এক কোণের ভেঙে-পড়া একটা থামকে বেঞ্চি করে বসে প্রথমে দুর্ভাবনার কথাটাই বঙ্কুবাবুকে জানালাম। বললাম—"রাতটা ত এ পাহাড়েই কাটাতে হবে মনে হচ্ছে। লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে আজ ফেরবার কোনো আশা বোধহয় নেই?"

"লোধমা পাহাড়ের ছাউনি!"—বঙ্কুবাবু যেন আমার বিরুদ্ধে করুণ নালিশ জানালেন—"আপনি এখন ছাউনির কথা ভাবতে পারছেন! ক্যান্টিনের খাবার, ক্যাম্প খাটের মশারী দেওয়া বিছানা, পেট্রোম্যাক্সের আলোর জন্যে মন কেমন করছে বোধহয়

pathagar.net

আপনার! গোয়েন্দাগিরি করবেন অথচ গায়ে আঁচড়টি সহ্য করতে পারবেন না! এদিকে আমি, এই তিন দিন তিন রাত এই পাহাড়ে জঙ্গলে প্রাণ হাতে করে তাড়া-খাওয়া জন্তুর মত ওই জল্লাদ নাগাপ্পার—"

বঙ্কুবাবু মনের দুঃখে আরো অনেক কিছু নিশ্চয় বলে যেতেন। একটু হেসে তাঁকে থামিয়ে বললাম—"থামুন! থামুন! আরামের জন্যে নয়, ওই জল্লাদ শয়তান নাগাপ্পার শেষ ব্যবস্থা করবার জন্যেই লোধমার ছাউনিতে ফিরে যেতে চাইছি তাড়াতাড়ি। নাগাপ্পার মরণ-কাঠি এখন আমার হাতের মুঠোয়।"

"খুব ত বাহাদুরী তখন থেকে শুনছি।"—বঙ্কুবাবু এবার একটু তেতো গলাতেই বললেন— "আমাকে ত একবার ছুঁতেই দিলেন না! কিন্তু ওই ছাইপাশ ঘেঁটে মরণ-কাঠির মত সত্যি কি পেয়েছেন শুনি! ওই আরদালীর পেতলের চাকতিটা—ওরই জোরে নাগাপ্পার গলায় ফাঁস টেনে দেবেন!"

"শুধু চাকতিটা নয়, বঙ্কুবাবু!"—এবার তাঁকে একটু বোঝাবার চেষ্টা করলাম—"আমার কাছে সামান্য যা সব প্রমাণ এখন আছে তা আর কিছু না হোক, নাগাপ্পাকে কাঠগড়ায় তুলে দায়রা সোপর্দা করবার পক্ষে যথেষ্ট। মামাবাবুর হাতে পড়লে এ সব জিনিষ গলা ছেড়ে কথা কইবে!"

"তিনি যখন নেই তখন আপনিই একটু বুঝিয়ে দিন না!"

বঙ্কুবাবুর অবিশ্বাসের সুরটাই মেজাজ গরম করে দিলে। অবজ্ঞার হাসিটা পুরোপুরি লুকোবার চেষ্টা না করেই বললাম—"বোঝালেই কি বুঝতে পারবেন! তবু শুনুন।"

পকেট থেকে বোলতার চাকের মত জিনিষের ছবিটা বার করে দেখিয়ে বললাম—"এটা কিসের ছবি, জানেন?"

বঙ্কুবাবুর বিদ্যেবুদ্ধিকে অতটা তাচ্ছিল্য করা উচিত হয় নি। ছবিটাকে তিনি বোলতার চাক বললেন না। দু এক সেকেন্ড, বেশ মন দিয়ে দেখে বললেন—"না জানার কি আছে! এ ত একরকম নুড়ি। এর ভেতর লোহাটোহা গোছের ধাতু পাওয়া যায়। পাহাড়ে জঙ্গলে এরকম নুড়ি আগেও দেখেছি।"

"দেখেছেন!"—এবার বঙ্কুবাবুর ওপর একটু ভক্তি নিয়েই বললাম—"আপনার ত তাহলে দেখবার চোখ আছে। অবশ্য খনির কাজেই এতকাল কাটাবার পর নজর একটু তীক্ষ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক।"

আমরা নিচু গলাতেই আলাপ করছিলাম। তবু তার মধ্যেই হঠাৎ ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে আমায় চুপ করিয়ে বঙ্কুবাবু সাবধানে পোড়ো বাংলোর বাইরে উঁকি দিয়ে এলেন।

"কি? আবার আসছে নাকি?"—বঙ্কুবাবু ফিরে আসবার পর সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"না, তা আসছে না!" বঙ্কুবাবু আশ্বস্ত করে বললেন—"তবে তাড়াতাড়ি এখান থেকে বার হওয়া ঠিক হবে না।"

তাড়াতাড়ি বার হওয়ার জন্যে আমিও তখন ব্যস্ত নই। বঙ্কুবাবুকে ব্যাপারটা বোঝাবার উৎসাহই আমার তখন বেশী।

আগের কথার খেই ধরে ছবিটা আরেকবার দেখিয়ে বললাম—"এ ধরনের নুড়ি আপনি দেখেছেন বটে, কিন্তু তার দাম যে কী হতে পারে কিছুই বোঝেন নি। এ জাতের নুড়ির

pathagar.net

পরিচয় আজই অবশ্য দুপুরে মামাবাবুর কাছে পেয়েছি। বোলতার চাকের মত এ নুড়ির নাম হল পেরিডোটাইট। এর ভেতরে নিকেল ক্রোমিয়ম গোছের ধাতু ত বটেই সোনার সমান দামী প্লাটিনামও পাওয়া যায়। জঙ্গলের লুকোন গর্তের মধ্যে আদিবাসী আরদালীর পেতলের চাকতির সঙ্গে এই আধ-পোড়া কাগজের ছবিটা আর টুকিটাকি লেখা পাওয়ার মানেটা এবার ধরতে পারছেন?"

হতভম্ব নয়, এবার বেশ একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বঙ্কুবাবু ধীরে ধীরে বললেন—"আপনি তা হলে সন্দেহ করছেন যে আদিবাসী আরাদালীকে খুন করার আসল কারণ এই কাগজগুলো? সে এগুলো পেয়ে তার মনিব মহান্তীকেই সম্ভবত দেখাতে যাচ্ছিল। সেই দেখানটা বন্ধ করবার জন্যে কেউ তাকে এই নির্জন পাহাড়ী রাস্তাতেই শেষ করে কাগজগুলো পুড়িয়ে দূরের ওই গর্তে পুঁতে রেখেছে!"

"ঠিক ধরেছেন!"—বঙ্কুবাবুর বুদ্ধির তারিফ করে বললাম—"শুধু তাই নয়, ক্ষ্যাপা হাতীর কাজ বলে আদিবাসীর খুনটাকে একটা দৈব দুর্ঘটনার চেহারাও দিতে চেষ্টা করেছে।"

"কিন্তু আপনাদের নাগাপ্পা ত ওখান থেকে সত্যিই হাতীর বিষ্ঠা চেঁচে পেয়েছে!"

বঙ্কুবাবুর কথাটায় বেশ একটু চমকে উঠলাম। শুধু বিচার বুদ্ধি নয়, তাঁর স্মরণশক্তিরও পরিচয় পেয়ে। নাগাপ্পার হাতীর বিষ্ঠা পাওয়ার কথাটা আমি যে তাঁকে বলেছি তাই আমার মনে ছিল না।

খুশী হয়ে উৎসাহভরে বললাম—"খুব ভালো একটা পয়েন্ট ধরেছেন। কিন্তু ওই হাতীর বিষ্ঠা পাওয়াই নাগাপ্পার একটা কারসাজী। মহাবুয়াং-এর ক্ষ্যাপা হাতী এ অঞ্চলে সেদিন আসেনি বলে প্রমাণ পাবার পর, ব্যাপারটা নতুন করে ঘোরাল করবার জন্যে সে এই চাল চেলেছে বলে আমার বিশ্বাস। একটার জায়গায় আরেকটা ক্ষ্যাপা হাতীর এ পাহাড়ে এসে দৌরাত্ম্য করা অস্বাভাবিক হলেও একেবারে অসম্ভব ত নয় এই যুক্তিটাই সে কাজে লাগাতে চেয়েছে।"

"ব্যাপারটা তা হলে বেশ গুরুতর মনে হচ্ছে?"—বেশী রকম গম্ভীর হওয়ার দরুণ বঙ্কুবাবুর গলার কাঁদুনে ভাবও যেন অনেকটা কেটে গেছে মনে হল—"এ কাগজগুলো যার কাছে অত দামী সে এগুলো বাইরের কারুর হাতে না পড়তে দেওয়ার জন্যে একটার ওপর দুটো খুন নিশ্চয় করতে পারে। আপনার কাছে এখন এগুলো আছে জানতে পারলে আপনি যাতে আর লোধমা পাহাড়ে ফিরতে বা কারুর হাতে এসব দিতে না পারেন সে চেষ্টা কেউ করবে না মনে করেন?"

বুকের ভেতরটা একটু কেঁপে উঠলেও মুখে সে ভয় ফুটতে না দিয়ে হেসে বললাম—"জানলে নিশ্চয় করবে! কিন্তু জানতে ত এখনো পারে নি।"

"তাও জোর করে বলা যায় কি?"—বঙ্কুবাবু চিন্তিতভাবে বললেন—"আমায় সে যখন গুলি করবার চেষ্টা করেছে, আর আপনি যে আমার সঙ্গে সেদিন ওখানে ছিলেন তা আপনার কাছেই জেনেছে, তখন দুই দুইয়ে চার করে গর্তের জিনিষ আমরাই হাতড়ে বার করেছি বলে ধরে নেওয়া তার পক্ষে সহজ। আমরা দুজনই যখন তার চোখে দুষমন তখন বিপদের ঝুঁকিটাও ভাগাভাগি করে নেওয়া উচিত। তাই বলছি আপনার কাছে যা আছে তার

কিছু অন্তত আমাকে দিন। একজনের কিছু নেহাতই যদি হয় ত সমস্ত প্রমাণ খোয়া যাবে না।"

আমায় একটু দ্বিধা করতে দেখেই বোধহয় বঙ্কুবাবু আবার বললেন—"আপনি না হয় চাকতিটা রাখুন, আমাকে কাগজগুলো দিন।"

আমি কিন্তু ততক্ষণে মনঃস্থির করে ফেলেছি। বিপদের ঝুঁকি যা নেবার একলাই নেব! অকারণে বঙ্কুবাবুকে তার মধ্যে জড়াব না। শক্ত হয়েই তাই বললাম—"না, বঙ্কুবাবু। নেহাত আমার অনুরোধে পথ দেখাতে এসে এর মধ্যেই যা ভোগান্তি আপনার হয়েছে তার জন্যেই আমি লজ্জিত, দুঃখিত। আর বিপদে আপনাকে ফেলতে চাই না। কিন্তু এ কি!"

চমকটা এবার ভয়ের নয়, বিস্ময়ের সঙ্গে খুশীর। চারিদিকের অন্ধকার এতক্ষণে বেশ গাঢ় হয়ে এসেছিল। হঠাৎ সে অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠাতেই চমকে উঠেছিলাম। অবাক হয়েই হেসে বললাম—"সূর্য আবার উল্টো চলছে নাকি!"

সূর্য উল্টো চলে নি। বঙ্কুবাবু সাবধানে একবার দেখে আসবার পর বাইরে বেরিয়ে দিনের আলো হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার কারণটা বুঝতে পারলাম। প্রায় সারা আকাশ যে মেঘ ছেয়ে এসেছিল পশ্চিমের দিকে সেটা অনেকখানি ফাঁক হয়ে যাওয়ার দরুণই পড়ন্ত সূর্যের আলোও এতখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সে আলোয় এঞ্জা পাহাড়ের ওপরকার রূপ সত্যিই অপূর্ব আর আরো পবিত্র বলে মনে হল। তারই মধ্যে দারুণ এক শয়তানীর খেলা যে চলছে তা বিশ্বাস করাই শক্ত।

কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাসে কুৎসিত সত্যকে ত আর ভুলে থাকা যায় না। তাই বঙ্কুবাবুকে একটু ব্যাকুলভাবেই জিজ্ঞাসা করতে হল—"আলো যা হয়েছে তাতে লোধমা পাহাড়ে ফেরবার চেষ্টা করলে হয় না? মহান্তী আর মামাবাবুর কাছে এগুলো পৌঁছে দেওয়া সব চেয়ে এখন জরুরী তা বুঝছেন ত?

"খুব বুঝছি!"—বঙ্কুবাবু আমার বলার ধরনেই যেন একটু মজা পেয়ে বললেন—"কিন্তু তার চেয়ে জরুরী একটা কাজ আগে না সারলে নয়। নাগাপ্পার কেন আমার ওপর এত আক্রোশ এঞ্জা পাহাড়ে গিয়ে বোঝাব বলেছিলাম। চলুন, এমন কিছু আপনাকে দেখাচ্ছি, যার পর এখানকার কোনো রহস্য সম্বন্ধে আর আপনার জানবার কিছু থাকবে না বলে আমার বিশ্বাস।"

বঙ্কুবাবুর মত মানুষের মুখে এ ধরনের আস্ফালন শুনে মনে মনে একটু হাসি যে পেয়েছিল তা অস্বীকার করব না। সেই সঙ্গে কিছুটা হতভম্বও হয়েছিলাম।

কোনো প্রশ্ন আর না করে তাই তিনি যা যা বলেছিলেন, শুনেছি।

বঙ্কুবাবু একটা বনের পথ দেখিয়ে একা একাই আমায় এগিয়ে যেতে বলেছিলেন। পথটা যে পীক-ভিউয়ে শেষ হয়েছে তাও তিনি জানাতে ভোলেন নি। পীক-ভিউয়ে গিয়ে তিনি আমায় খানিক অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিয়ে নাগাপ্পা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি আমার কাছে এসে যা দেখাবার, দেখাবেন।

বৃষ্টি তখন আবার একটু ঝির ঝির করে পড়তে শুরু করেছে। আকাশের আলোও বেশ ম্লান হয়ে এসেছে। একা একা পীক-ভিউয়ে দাঁড়িয়ে একটু অস্বস্তিই লাগছিল। বঙ্কুবাবু

এখান থেকে কি এমন দেখাতে পারেন বুঝে উঠতে পারছিলাম না। নীচের দূর সমতল পর্যন্ত প্রায় সোজা দেয়ালের মত যে ঢাল নেমে গেছে তাতে কিছু দেখতে গেলে ত কোমরে দড়ি বেঁধে নামতে হয়।

"কিছু পেলেন দেখতে?"

হঠাৎ বঙ্কুবাবুর মিহি কাঁদুনে গলায় চমকে উঠেছিলাম। তিনি কখন এসে পৌঁছেছেন টের পাইনি।

"কি আবার দেখতে পাব?" একটু রুক্ষ হয়েই বলেছিলাম—"যা দেখলে এখানকার কোনো রহস্য সম্বন্ধেই আর কিছু জানবার থাকবে না, তাই দেখাবেন ত বলেছিলেন। কই দেখান?"

তেরো

বঙ্কুবাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন।

হঠাৎ আচমকা আমায় প্রচণ্ড এক ঠেলা দিয়ে বলেছিলেন—"দেখুন এবার!"

আর কিছু যদি তিনি বলে থাকেন, শুনতে পাইনি। কারণ তখন আমি পা হড়কে সেই ভয়ঙ্কর খাড়াই বরাবর পড়তে পড়তে বৃথাই পাহাড়ী ঢালের গাছপালা লতাপাতা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছি।

কতক্ষণ বেহুঁস হয়েছিলাম জানি না, কিন্তু প্রথম যখন চোখ খুলে তাকালাম তখন কি, কেন, কোথায় ঠিক মত স্মরণ করতেই বেশ একটু সময় গেল।

শরীরটার কোথায় কি হয়েছে বা সেটা এখনো আস্ত আছে কি না তা বোঝবার ক্ষমতা তখন নেই। তার ওপর মাথাটাও বেশ একটু যেন গুলিয়ে গেছে।

মাথাটা একটু পরিষ্কার হতেই কোথায় আছি বোঝবার চেষ্টা করলাম। ঠিক বুঝতে পারলাম না প্রথমটায়। লতাপাতার ভেতর দিয়ে সন্ধ্যের আকাশ একটু দেখা যাচ্ছে, কিন্তু নীচে বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ একটা পাঁকাল জঞ্জালের রাশের মধ্যে যেন আধ-ডোবা অবস্থায় আছি।

যেটুকু সাড় ছিল তাতে ক্রমশ বুঝলাম শরীরটায় যা মাখামাখি হয়ে গেছে বিশ্রী দুর্গন্ধটা সেই নোংরা পাতলা গোছের কাদাটে জলের। জংলী লতাপাতা ডালপালা পচেই পাতলা নোংরা কাদাটা তৈরী হয়েছে। আর দুর্গন্ধ তার যত বিদঘুটেই হোক প্রাণটা যে আমার তাইতেই আপাতত বেঁচেছে তা বুঝতেও এবার দেরী হল না।

খাড়া পাহাড়ের তলার দিকে কোথাও একটা গভীর ডোবা বড় ইঁদারা গোছের গর্ত বর্ষার জল আর পাহাড়ী জঙ্গল থেকে খসে পড়া ডালপালা লতাপাতা জমে পচা জঞ্জালের কুণ্ড গোছের হয়েছে। ওপর থেকে সবেগে গড়াতে গড়াতে সেই খাদের মধ্যে না পড়লে বোধহয় গুঁড়ো হয়ে যেতাম।

ওপর থেকে হঠাৎ আচমকা কেন পড়ে গিয়েছি সেটা মনে করতে গিয়ে আর একবার যেন শিউরে উঠলাম।

আর কেউ নয়, স্বয়ং বঙ্কুবাবুই আমায় ঠেলে দিয়েছেন! তাঁর ঠেলে দেওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এ-রকম একটা ব্যাপার আমার কাছে কল্পনাতীত ছিল বললেও কম বলা হয়।

pathagar.net

ব্যাপারটা এমন আজগুবী ও অবিশ্বাস্য যে এখানো তা নিয়ে ভাবতে গেলে দিশহারা হতে হয়। তাঁর হাতের ঠেলা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোধমা পাহাড়ের ব্যাপারে যা কিছু এ পর্যন্ত বুঝেছি সব কিছুর মানে এক মুহূর্তে কতখানি যে বদলে গেছে, যত জরুরীই হোক, সে বিচারের তখন কিন্তু আর সময় নেই।

পচা জঞ্জালের কুণ্ডটা কত গভীর জানি না, কিন্তু ক্রমশঃই তার মধ্যে একটু একটু করে যে ডুবছি সেটা টের পেয়ে বুকের ভেতরটা যেন হিম হয়ে এল। অত উঁচু থেকে পড়েও প্রাণে বেঁচে গেছি বলে মনে যে আশটুকু জেগেছিল তা আতঙ্ক হয়ে উঠল এবার। খাড়া পাহাড় থেকে পড়ে নীচে চুরমার হওয়ার বদলে এই পচা জঞ্জালের কুণ্ডে একটু একটু করে দম বন্ধ হয়ে ডুবে মরাই কি আমার নিয়তি? তা যে আরো ভয়ঙ্কর!

এর মধ্যেই পচা, আধ-পচা আব কাঁচা ও শুকনো লতাপাতার নোংরা জঞ্জালে আমার নাক মুখ পর্যন্ত চাপা পড়তে শুরু করেছে! মুখের ওপর থেকে সেগুলো সরাবার চেষ্টা করতে গিয়ে এইটুকু শুধু দেখলাম যে হাত দুটো ক্ষত-বিক্ষত হলেও একেবারে অকেজো হয়নি।

কিন্তু পঙ্গু না হলেও সে হাত দিয়ে করব কি! চিৎ অবস্থা থেকে কোনো রকমে কাত হয়ে কুণ্ডটার ধারের দিকে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সভয়ে টের পেলাম যে প্রাণপণে হাত চালিয়েও এক চুল এগোবার বদলে ধীরে ধীরে আরও তলিয়ে যেতেই শুরু করেছি। তরল পাতা কাদা আর লতাপাতার পচানির মধ্যে ধরবার ত কিছু নেই। আঁকু-পাঁকু করে সাঁতারের মত হাত চালাতে গেলে নাড়া খাবার দরুণই নীচের জঞ্জাল দেহের ভারে আরো নেমে যায়।

কোনো রকম নড়াচড়া না করে যতক্ষণ সম্ভব ভেসে থাকবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু সুতরাং করবার নেই। শেষ পর্যন্ত তাতেও তলিয়ে যেতেই হবে। একটি মাত্র আশা এই যে সে পরিণামের আগে যদি কেউ দৈবাৎ এদিকে এসে আমাকে দেখতে পায়। আকুলভাবে কয়েকবার নিজের বিপদ জানাতে চীৎকার করলেও আমার সাহায্যে কারুর ছুটে আসা যে প্রায় অলৌকিক ব্যাপার মনে মনে তা অবশ্য বুঝতে তখন আমার বাকী নেই। এই পাহাড়ী অঞ্চলেই মানুষজনের চলাফেরা একান্ত বিরল। তার ওপর এই এঞ্কা পাহাড়ের তলায় ঠিক আমি যেখানে জংলা জঞ্জালের খাদে ডুবে মরতে বসেছি সেখানে হঠাৎ কার বেড়াতে আসার দায় পড়বে!

শেষ যা হবে তার জন্যে মনটা তৈরী করবার চেষ্টাই করতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলাম।

অবিশ্বাস্য আশাতীত অলৌকিক ব্যাপারই সত্যি ঘটেছে। কিছুদূরে ক'টা পাথুরে ঢিবির পেছন থেকে দুটি মানুষ আমার দিকেই এগিয়ে আসছে।

একজন নয়, একেবারে দুজন মানুষ!

তাও আদিবাসীদের কেউ নয়। চেহারা পোষাকে রীতিমত সভ্য মানুষ বলেই বোঝা যাচ্ছে।

আরো কাছে আসার পর মানুষ দুজনকে চিনতেও অসুবিধা হল না।

এই কি শেষ পর্যন্ত আমার আশাতীত অলৌকিক সৌভাগ্যের ব্যাপার?

pathagar.net

আশায় উত্তেজনায় বুকের ধুকধুকানি যেমন বেড়ে গেছল তেমনি যেন হঠাৎ থেমে যাবার উপক্রম হল। কারণ প্রায় অলৌকিকভাবে যাঁরা আমার এই সর্বনাশা বিপদের মুহূর্তে এসে দেখা দিয়েছেন তাঁদের একজন হলেন সরকার সাহেব, আরেকজন বঙ্কুবাবু।

এঁদের দেখবার পরও মনের মধ্যে ক্ষীণতম আশা যদি জেগে থাকে দুজনের প্রথম কথাতেই তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এঁরা পাহাড়ী খাদটার ধারে এসে দাঁড়াবার আগেই খানিকটা ভয়ে খানিকটা কি করব ঠিক করতে না পারার বিমূঢ়তায় আমি চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলেছিলাম।

খাদের পাড় থেকে চোখ বোজা অবস্থাতেই দুজনের আলাপ শুনতে পেলাম!

প্রথমেই সরকার সাহেবের গলা—"শেষ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে!"

"হওয়ারই কথা, তবে প্রাণটা একেবারে না গিয়ে থাকতে পারে। এখনো একটু ধুকধুকুনি হয়ত আছে!"

"তা হলে কি তোলবার চেষ্টা করবেন?"

"তোলবার চেষ্টা করবে! আহাম্মক ইডিয়ট! ওই খাদের মধ্যে তোমারও কবরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

কথাগুলো যা শুনলাম তা বুক কাঁপিয়ে দেবার মত কিন্তু ওই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যেও বক্তা দুজনের ভূমিকার অদল-বদল আমায় তখন বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়েছে।

চেহারা ত আগেই দেখেছি। দুজনের গলাও আমার নিতান্ত চেনা। প্রথমটা যে সরকার সাহেবের আর দ্বিতীয়টা বঙ্কুবাবুর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশই নেই।

কিন্তু তাঁদের পরস্পরের সম্পর্কটা হঠাৎ এমন অদ্ভুতভাবে পাল্টে গেল কি করে!

যাঁকে মনিব ও ওপরওয়ালা বলে জানি সেই সরকার সাহেবের গলা থেকে কথাবার্তার ধরন ত একেবারে বশম্বদ হাত-কচলানো গোলামের মত, আর বঙ্কুবাবুর ঠিক যেন জাঁদরেল জবরদস্ত মালিকের।

গলার স্বরটা সরু খনখনে ধরনের হলেও তাঁর আওয়াজই এখন আলাদা।

পোড়া কাগজপত্র লুকোন গর্তটা ঘাঁটবার সময় বঙ্কুবাবুর এই ধরনের গলার আভাস যে পেয়েছিলাম এতক্ষণে সেটা খেয়াল হল। বঙ্কুবাবু তখন সরকার সাহেবকে ধাঁতাচ্ছিলেন। দুর্বল উৎপীড়িত অসহায়ের মরীয়া বিক্ষোভের জ্বালা বলে যা মনে করেছিলাম তাতেই যে বঙ্কুবাবুর আসল চেহারার প্রকাশ তা তখন বুঝতে পারিনি।

বুঝলে অমন আহাম্মকের মত তাঁর শিকার হবার আগে একটু বোধহয় সাবধান হতে পারতাম।

দুজনের কথাবার্তা তারপর যা শুনেছি তাতে আমার শেষ ধুকধুকুনিটুকুও ওইখানেই খতম করে দেওয়া যে বঙ্কুবাবুর মতলব তা বুঝতে তখন বাকী থাকেনি।

সরকার সাহেব ভয়ে ভয়ে তখন শুধু জানিয়েছেন যে এদিকে লোকজনের যাতায়াত প্রায় না থাকলে খাদের জঙ্গলের ওপর আমার ভেসে থাকা লাশটা দৈবাৎ কারুর নজরে পড়েও যেতে পারে।

বঙ্কুবাবু তার উত্তরে ধমক দিয়ে বললেন—"তা হলে একটা বড় ডাল খুঁজে নিয়ে এসো, ইডিয়ট! খুঁচিয়ে ঠেলে, যেমন করে হোক ওর লাশটা খাদের তলায় নামিয়ে দিতে হবে।"

pathagar.net

বুকের ভেতর একটা যেন বরফের চাঁই নিয়ে আমি তখন চোখ খুলে তাকিয়েছি।

বঙ্কুবাবুর ধমক খেয়েও সরকার সাহেব তখনো কিন্তু কেমন অসহায় কাঁচুমাচুভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।

"দাঁড়িয়ে আছ যে!"—একটা অত্যন্ত কুৎসিত গাল দিয়ে বঙ্কুবাবু এবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন— "কি বললাম তোমাকে?"

"আজ্ঞে!" সরকার সাহেব যেন ফাঁসীর আসামীর মত কাঁপতে কাঁপতে বললেন—"ডাল আমি এখুনি আনছি। কিন্তু আমার একটা কথা যদি শোনেন!"

"কি কথা?"—বঙ্কুবাবু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সরকার সাহেবের দিকে তাকালেন—"চটপট বলে ফেল। এখানে নষ্ট করবার মত আমার সময় নেই।"

"আজ্ঞে"—অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সরকার সাহেব এবার বললেন—"খুঁচিয়ে লাশটা খাদের তলায় নামিয়ে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু খাদটা খুব গভীর নয়। এ দিকের আদিবাসী চাষীরা এ খাদ থেকে কখনো কখনো জমির সারের জন্যে পাতা পচানি নিয়ে যায় তা ত আপনিও জানেন। তাদের কেউ তলার লাশটা দেখে ফেলতে পারে।"

"যখন দেখবে তখন আমাদের পাচ্ছে কোথায়!"

মুখে ধমক দিলেও বঙ্কুবাবুকে এবার একটু গুম হয়ে খানিক চুপ করে থাকতে দেখলাম।

তারপর কি ভেবে তিনি আমায় খাদ থেকে পাড়ে তোলার হুকুমই দিলেন।

"যাও, লম্বা ডাল একটা—না, না, চোরা সুড়ঙ্গ থেকে রশিটাই নিয়ে এসো। সাড় যদি এখনো কিছু থাকে ত ছুঁড়লে দড়িটা ধরে নিতে হয়ত পারবে। তখন টেনে তোলা শক্ত হবে না। আর এর মধ্যেই যদি খতম হয়ে গিয়ে থাকে ত মাথা গলিয়ে ফাঁস লাগিয়ে টেনে তুলতে হবে।"

বঙ্কুবাবুর এই বিস্তারিত নির্দেশ পেয়েও সরকার সাহেব যেন অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে মরীয়া হয়ে বলে ফেললেন—"কিন্তু তারপর?"

"আবার তারপর কিসের?"—বঙ্কুবাবু যেন জল বিছুটির ঘা দেওয়ার মুখ ভঙ্গী করে বললেন— "মাথায় ষাঁড়ের গোবর নিয়ে এসেছ এ কারবার করতে! মরা আধ-মরা যাই হোক এখান থেকে টেনে তুলে নিয়ে চোরা সুড়ঙ্গে ফেলে রাখব। আমরা হাওয়া হয়ে যাবার পর যুগ-যুগান্তের মধ্যেও ও সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়ে ওর হাড় ক'খানা কেউ সেখানে খুঁজে বার করতে পারবে না। বুঝলে এবার গবেট?"

বুঝুন বা না বুঝুন সরকার সাহেব এবার বঙ্কুবাবুর হুকুম মানতেই চলে গেলেন। বঙ্কুবাবু একাই রইলেন খাদের পাড়ে পাহারায় দাঁড়িয়ে।

আমি চোখ খুলে তাঁকে দেখছি কি না বঙ্কুবাবুর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। লতাপাতা ডালপালায় আমার মুখটা তখন প্রায় ঢাকাই পড়ে গেছে। তা ছাড়া মরা না হোক, বেহুঁস আধ-মরা বলেই তখন আমায় ধরে নিয়ে বাতিলদের খাতায় তিনি নিশ্চয় আমার নাম তুলে দিয়েছেন।

আমি কিন্তু একাগ্র দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ করতে করতে তখন তাঁর যথার্থ পরিচয়টা বোঝবার চেষ্টা করার সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার কোনো উপায় থাকা সম্ভব কি না তাই নিয়ে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করছি।

pathagar.net

সরকার সাহেব আর বঙ্কুবাবু, দুইয়ের জুটির মধ্যে, বঙ্কুবাবুই যে সর্বেসর্বা ও মাথা সেটা ত অনেক আগেই জলের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিজের পরিচয় লুকোবার জন্য সরকার সাহেবের অনেক অত্যাচার-সওয়া সামান্য বেয়ারা গোছের লোক সেজে থাকাও তাঁর খুব বড় চালাকী সন্দেহ নেই।

মানুষটা শুধু প্যাঁচাল বুদ্ধিতেই শয়তান নয়, নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাপারে পিশাচের মত যে নির্মম নিষ্ঠুর হাড়ে হাড়ে সে কথা বোঝবার পরও এত সব কাণ্ডকারখানায় মূলে আসল উদ্দেশ্যটা তাঁর কি সে বিষয়ে একটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর প্রশ্ন কিন্তু থেকে যায়। মামাবাবু যা অনুমান করেছেন তাই কি সব? সেই পেরিডোটাইট পাথরের ভেতরকার প্লাটিনামের লোভ দিয়েই কি বঙ্কুবাবুর চরিত্র আর তাঁর জটিল সমস্ত শয়তানী কাণ্ডকারখানা ব্যাখ্যা করা যায়? মন কেমন যেন তা মানতে চায় না।

অথচ সেই মুহূর্তেই সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়াটা আমার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী, কারণ বঙ্কুবাবুর আসল উদ্দেশ্যটা না জানলে তাঁর হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোনো উপায় ভাবাই বুঝি সম্ভব হবে না।

এত কথা এমন গুছিয়ে সেই সময়টুকুর মধ্যে অবশ্য ভাবিনি। সামনে বঙ্কুবাবুকে খাড়া দেখে অস্থির মনের মধ্যে ঝড়ের বেগে চিন্তার স্রোত যেন বয়ে গেছে।

সরকার সাহেব বঙ্কুবাবুর হুকুমে কোথাও কোনো চোরা সুড়ঙ্গ থেকে আমায় খাদ থেকে তোলবার জন্যে দড়ি আনতে গেছেন।

সেটা আনবার পর কি কি হতে পারে তা একটু কল্পনা করবার চেষ্টা করছি। দড়ি এনে খাদ থেকে আমায় যেমন করে হোক ওঁরা টেনে তুলবেন। তারপর চোরা সুড়ঙ্গে আমায় নিয়ে গিয়ে ফেলবার কথা বঙ্কুবাবু জানিয়েই দিয়েছেন।

চোরা সুড়ঙ্গ বলতে কি বোঝায়, জায়গাটাই বা কোথায় কিছুই আমার জানা নেই। কিন্তু সেখানে নিয়ে গিয়ে ফেলা মানেই দুনিয়ার চোখের আড়াল করে দেওয়া এ কথা বঙ্কুবাবু জোর গলায় শুনিয়েছেন। এ জোর তিনি পাচ্ছেন কোথায়?

চোরা সুড়ঙ্গের সঙ্গেই কি বঙ্কুবাবুদের শয়তানী কাণ্ড-কারখানার আসল রহস্য জড়িত? সেখানে গেলে আর কিছু না হোক সমস্ত দুর্বোধ ভয়ঙ্কর ব্যাপারের সঠিক ব্যাখ্যা কি পাওয়া যাবে?

তা যদি যায়, তাহলে চিরকালের মত মানুষের জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার বিপদ মাথায় নিয়েই সেখানে যাবার জন্যে আমি তখন উদগ্রীব।

সবসুদ্ধ মিলে কতখানি জখম আমি যে হয়েছি তখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, কিন্তু কি করে জানি না মনে এই বিশ্বাসটুকু জেগেছে যে একেবারে পঙ্গু যদি না হয়ে থাকি তাহলে বঙ্কুবাবুদের গোপন আসল ঘাঁটিতে একবার কোনো রকমে ঢুকতে পারলে তাঁদের শয়তানীর রহস্যভেদের সঙ্গে সেখান থেকে উদ্ধার পাবার একটা উপায়ও করতে পারব।

pathagar.net

চোদ্দ

বঙ্কুবাবুদের আসল গোপন ঘাঁটি এঞ্জা পাহাড়ের চোরা সুড়ঙ্গে শেষ পর্যন্ত সত্যিই ঢুকতে পারলাম।

কিন্তু ওই ঢোকা পর্যন্তই সার। সেখানে একবার ঢুকতে পারলে বঙ্কুবাবুদের শয়তানী চক্রান্ত ভেদ করে উদ্ধার পাবার উপায় একটা বার করে ফেলতে পারব বলে যে অদ্ভুত ধারণা হয়েছিল সেটা নেহাত আশার ছলনা।

চোরা সুড়ঙ্গে ঢোকবার পরই নিজের যথার্থ অবস্থাটা বুঝতে পারলাম। কোনো ফাঁক দিয়ে গলে পালাবার এতটুকু সুযোগ থাকলে বঙ্কুবাবুর মত পাকা শয়তান আমায় এখানে যে নিয়ে আসত না এ কথা অবশ্য আগেই বোঝা উচিত ছিল। এই চোরা সুড়ঙ্গে একবার ঢোকান মানেই জীবন্ত কবর দেওয়া। বিশেষ করে আমার মত এই আধা পঙ্গু অবস্থায় বঙ্কুবাবু ও সরকার সাহেবের মত দুজন সুস্থ এবং নিশ্চয়ই সশস্ত্র জোয়ান মানুষের সঙ্গে যুঝে পালাবার কথা ভাবা যখন বাতুলতা।

যে খাদের মধ্যে একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছিলাম তা থেকে উদ্ধার পাবার সময় চোরা সুড়ঙ্গের রহস্য জানবার আগ্রহ উত্তেজনাতেই বোধহয় মনে অমন অবুঝ আশা জেগেছিল। আশা এই যে, গায়ের জোরে না হলেও বুদ্ধির প্যাঁচে বঙ্কুবাবুদের ওপর হয়ত টেক্কা দিতে পারব। নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে নেহাত আহাম্মকের মত এ গর্বও চুরমার হতে দেরী হয়নি।

সরকার সাহেব দড়ি নিয়ে আসবার পর সামান্য একটু নড়ে চড়ে একটু যেন সাড় ফেরবার ভান করেছিলাম। যেটুকু লক্ষ করে আমার গলায় ফাঁস লাগিয়ে টানবার চেষ্টা আর বঙ্কুবাবু করেন নি। দড়িটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন শুধু।

এবার আর ভান করতে হয়নি। আপনা থেকেই ব্যাকুল হয়ে সেটা দু'হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছিলাম।

বঙ্কুবাবু আর সরকার সাহেব সে দড়ি ধরে টেনে আমায় পাড়ে এনে তোলবার পর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে যাওয়াটা অবশ্য বেশীর ভাগই অভিনয়। পাড়ে এসে পৌঁছবার পর দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম সর্বাঙ্গ বেশ একটু ক্ষত-বিক্ষত হলেও হাড়গোড় কোথাও ভাঙেনি। ইচ্ছে করলে দাঁড়াতে শুধু নয়, একটু কষ্ট করে হেঁটে যেতেও পারি।

বঙ্কুবাবুদের সেটা বুঝতে না দিলে পরে সুবিধে হতে পারে ভেবেই পঙ্গু হবার অভিনয় করেছিলাম। কিন্তু চালাকীটা একেবারেই সফল বোধহয় হয়নি। বঙ্কুবাবু কেমন একটু বাঁকা বিদ্রূপের সঙ্গে বলেছিলেন—"ছোটবাবুর পা দুটোর দফা রফা দেখছি যে! তবু সাবধানের মার নেই। চোরা সুড়ঙ্গে গিয়েই পা দুটোয় দড়ির একটা বাঁধন দিও। আপাতত টেনে হিঁচড়েই নিয়ে চল।"

হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার কথায় মনে মনে ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু একবার পঙ্গু সেজে তারপর হঠাৎ খাড়া হয়ে ওঠা ত যায় না। বেশ কিছুক্ষণ কাতরাতে কাতরাতে অতি কষ্টে যেন খাড়া হবার চেষ্টার ভান তাই করতে হয়েছিল।

pathagar.net

বঙ্কুবাবুকে তাতেও ফাঁকি দেওয়া যায়নি। বেশ একটু নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলেন—"অত কষ্ট করে দাঁড়াবার দরকার নেই ছোটবাবু। পা আপনার খোঁড়া হলেও যা, মজবুত থাকলেও তাই। চোরা সুড়ঙ্গে ঢোকবার পর ও দুটো আর আস্ত রাখব না।"

সরকার সাহেব তখন আমায় ধরে নিয়ে চলেছেন। তাঁর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যেতে যেতে, কিছুই যেন বুঝতে পারছি না এমনি আচ্ছন্নের মত বঙ্কুবাবুর দিকে তাকিয়েছি। এ অভিনয়ও অবশ্য বৃথাই।

বুকের ভেতরটা তখন একেবারে হিম হয়ে গেছে। এই শয়তানের সঙ্গে বুদ্ধির প্যাঁচে জেতবার কথা ভাবার স্পর্ধার জন্যেই নিজেকে তখন ধিক্কার দিচ্ছি। উদ্ধার পাবার কি বঙ্কুবাবুদের ধরিয়ে দেবার সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে চোরা সুড়ঙ্গের রহস্যটুকুই শুধু জেনে মরবার জন্যে মনকে তখন প্রস্তুত করেছি।

চোরা সুড়ঙ্গটা কোথায় আর কি রকম তা দেখবার পর সেখান থেকে মুক্তি পাবার আশা আপনা থেকেই মরীচিকার মত মিলিয়ে গেল। নিজের চোখে না দেখলে ওরকম একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গের অস্তিত্ব কল্পনাই করতে পারতাম না।

যে খাদের মধ্যে আমি পড়েছিলাম তা থেকে পাহাড়ী জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শ'খানেক গজ পায়ে চলার সরু আঁকাবাঁকা পথে যাবার পর আবার একটা পাহাড়ের ঢাল সামনে পড়ে। ওপরের চূড়া থেকে আমি প্রায় হাজার দুই ফুট নীচের খাদে পড়েছি। পাহাড়ের এ ঢালটা সেখান থেকে আরো প্রায় দু হাজার ফুট নীচের সমতলে গিয়ে শেষ হয়েছে! পাহাড়ের এ ঢালটার খাড়াই ওপরের তুলনায় কম নয়, শুধু গাছপালা লতাপাতার জঙ্গল তাতে প্রায় নেই বললেই হয়। ওপরের খাঁজ থেকে তলার দিকে চাইলে হাত দশেক নীচে পাহাড়ের গায়ের একটা ফাটল চোখে পড়ে। তার ভেতর থেকে ক্ষীণ একটা জলের ধারা বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। বর্ষাকালে এ জলের তোড় বেড়ে বেশ জমকালো চেহারাই নিশ্চয় নেয়। এখন ধারাটা নেহাত সুতোলী। গ্রীষ্মকালে হয়ত শুকিয়েই যায় একেবারে।

এ দিকের জংলা পাহাড়ের গায়ে এ ধরণের ক্ষুদে ঝরণা একেবারে বিরল নয়। এ ঝরণার মুখের ফাটলটাও নেহাত ছোট। ওপরে নীচে পাথরের খোঁচ-টোচ সমেত মোটামুটি ট্রেনের একটা জানলার মাপই হবে।

এই ফাটলটুকুই বঙ্কুবাবুদের গুপ্ত সুড়ঙ্গের দ্বার।

বঙ্কুবাবু আর সরকার সাহেব আমায় নিয়ে সেই ফাটলের ওপর পাহাড়ের খাঁজে দাঁড়াবার পর নীচের দিকে চেয়ে দেখেও এ রকম একটা ব্যাপার সম্ভব বলে আমি ভাবতেই পারি নি।

ওই ফাটল দিয়েই প্রায় সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে ভেতরে গিয়ে ঢোকবার পরও সত্যিই সেটা গুপ্ত সুড়ঙ্গ বলে বিশ্বাস করা শক্ত হচ্ছিল। একবার এমন সন্দেহও হল যে চোরা সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গ কিছু নয়, আমায় চিরকালের মত গুম করে রাখার এটা একটা সুবিধেমত জায়গা মাত্র।

কিন্তু আমার মত একটা অসহায় শিকারকে তাঁদের ধোঁকা দেবার দরকারই বা কি! আর তার জন্যে নিজেরাই বা অত কষ্ট তাঁরা করতে যাবেন কেন?

pathagar.net

ও ফাটলের মুখে পৌঁছতেই কম কসরৎ ত করতে হয় নি। ওপরের খাঁজ থেকে নীচের ঝরনার মুখ পর্যন্ত পাহাড়ী জংলা ডালপালা লতাপাতা জড়িয়ে এমন ভাবে বাঁধা যে সঠিক জানা না থাকলে তা দিয়ে লুকোন সিঁড়ির কাজ যে হয় তা বোঝবার উপায় নেই। পাহাড়ের গায়ে জংলা লতাপাতার জট বলেই তা মনে হয়।

এই লুকোন সিঁড়ি দিয়ে প্রথমে নেমে গেছেন সরকার সাহেব। তারপর বঙ্কুবাবুর হুকুমে জখম শরীর নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমায় নামতে হয়েছে। নীচে ঝরণার মুখে দাঁড়িয়ে সরকার সাহেব অবশ্য আমাকে ধরে নিয়ে সাহায্য করেছেন।

ঝরণার মুখটা যে কত ছোট জংলী লতার ঝুরি ধরে তার ধারে দাঁড়াবার পর বেশ ভালো করেই বোঝা গিয়েছে। সরকার সাহেব নিজেই প্রথমে সে ফাঁক দিয়ে বুকে হেঁটে ঢুকে না গেলে নিষ্ফল জেনেও একটু প্রতিবাদের চেষ্টা বোধহয় করতাম।

প্রথমে সরকার সাহেব, তারপর আমি, আর শেষ বঙ্কুবাবু শ্যাওলায় পেছল ঝরণার খাতের নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে মিনিট দুয়েক একভাবে বুকে হেঁটে গিয়েছি। তারপরই সঙ্কীর্ণ ফাটলটা নীচে ওপরে দুটো তলায় যেন ভাগ হয়ে গিয়েছে। জলের ধারাটা বেরিয়ে এসেছে নীচের ফাটল দিয়ে। তার ওপরের তাকটা কয়েক হাত পরেই হঠাৎ বেশ বড় সড় গুহা হয়ে উঠেছে।

বুকে হাঁটা ছেড়ে মাথা তুলে এবার একটু দাঁড়াতে পারাটাই সৌভাগ্য মনে হয়েছে, সেই সঙ্গে চারিদিকে চেয়ে অবাকও হয়েছি।

জায়গাটা যে শুধু একটা গুহা নয়, কোনো দীর্ঘ সুড়ঙ্গের একটা অংশ সামনের দিকে বহু দূরে অন্ধকারে তা মিলিয়ে যেতে দেখেই বোঝা গিয়েছে।

কিন্তু যেখানে উঠে দাঁড়িয়েছি সে জায়গাটাই যে অবিশ্বাস্য! পাহাড়ের বুকের ভেতর এরকম একটা লুকোন ঘাঁটির কথা ভাবাই যায় না। হ্যারিকেনের আলো কাগজপত্রের ফাইল, নানা রকম পাথরের নমুনার কাঁড়ি থেকে জলের ঘড়া, স্টোভ বেশ কিছু খাবারের টিন গোছের বহু জিনিষ মজুদ।

পনেরো

"কি বুঝছেন ছোটবাবু!"

হঠাৎ বিদ্রূপের খোঁচারই উপযুক্ত বঙ্কুবাবুর ছুঁচোল সরু গলার স্বরে চমকে উঠলাম।

তাঁর দিকে ফিরে তাকাতে বঙ্কুবাবু আবার ঘায়ের ওপর যেন নুনের ছিটে দিয়ে বললেন—"জায়গাটা পচ্ছন্দ হচ্ছে? এইখানেই আপনাকে থাকতে হবে কি না।"

সব জেনেশুনেও ন্যাকা সেজে জিজ্ঞাসা করলাম—"কতদিন?"

অজ্ঞানের মত খাদের ভেতর পড়ে থাকার সময় বঙ্কুবাবুদের প্রথম দিকের আলাপ যে আমি সব শুনেছি, তা তখন জানতে দিতে চাইনি।

বঙ্কুবাবু কিন্তু লুকোচুরির ধার দিয়েও গেলেন না। বেশ স্পষ্ট করেই নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের সুরে জানিয়ে দিলেন—"কতদিন আর থাকবেন! ওই টিনের খাবারগুলো আর কলসীর জলটা

pathagar.net

দিয়ে যতদিন চালাতে পারেন! তারপর আপনার হাড় ক'খানা অবশ্য যুগযুগান্তর এখানেই পড়ে থাকবে।"

"তার মানে",—স্থির ধীরভাবে কোনোরকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে জিজ্ঞাসা করলাম— "আপনারা আমায় এখানে ফেলে চলে যাবেন?"

"সেই রকমই ত ইচ্ছে!" বঙ্কুবাবু হেসে উঠলেন খনখনে মিহি গলায়—"শুধু ফেলে যাব না, যাবার আগে যে মুখ দিয়ে ঢুকেছি সেটা একটি ডিনামাইটের কাঠি ফাটিয়ে চিরকালের মত ধ্বসে-পড়া পাথরে বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করে যাব।

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলেও বাইরে সেটা যথাসাধ্য গোপন করে যেন সহজ আলাপের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু আপনারা তাহলে যাবেন কি করে?"

"আমরা?"—বঙ্কুবাবুর মুখে শয়তানী দম্ভের হাসি ফুটে উঠল—"আমাদের জন্যে মিছে ভাবনা করবেন না। আমরা এই সুড়ঙ্গের অন্য মুখের এমন গুপ্ত পথ দিয়ে যাব, এখনো পর্যন্ত কারুর যা জানা নেই। আমরা চলে যাবার পর সে পথ খুঁজে বার করার মিথ্যে কষ্ট আপনাকে করতে হবে না। যাবার আগে আপনার পা দুটো সত্যিই খোঁড়া করে দিয়ে যাব।"

নিরুপায় রাগে বুকের ভেতরটা তখন জ্বলছে। তবু মুখে একটু অবজ্ঞার হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বললাম—"আমায় এই চোরা সুড়ঙ্গে কবর দিয়ে গেলেই কি আপনাদের কাজ হাসিল হবে আশা করেন!"

"তা করি বই কি!"—বঙ্কুবাবু তাঁর পেটেন্ট গলায় হেসে বললেন—"আপনি এখানে নিপাত্তা হয়ে থাকলে আমাদের কাজ হাসিলের আর বাধা কোথায়। আপনি অবশ্য নিজের আহাম্মকিতেই নিজেই নিজের এ সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। গোয়েন্দাগিরির বাহাদুরীতে গর্তটর্ত ঘেঁটে ও সব গোলমেলে জিনিষ যদি না খুঁজে বার করতেন তাহলে আপনাকে এমন করে জ্যান্ত কবর দিয়ে যেতে হত না। এখন ও সব বাহাদুরীর আবিষ্কার আপনার সঙ্গে এই সুড়ঙ্গেই পচবে। কেউ কোনোদিন আর খোঁজ পাবে না। আমাদের পথও একেবারে পরিষ্কার।"

উদ্ধারের কোনো আশাই যখন নেই তখন বঙ্কুবাবুদের আর ভয় করবার কি আছে! মরীয়া হয়ে তাই বেপরোয়া বিদ্রূপের সঙ্গে বললাম—"স্বপ্নটা একটু বেশী রঙিন দেখছেন না কি বঙ্কুবাবু? আমাকে এখানে কবর দিলেই আপনাদের রাস্তা সাফ হবে না। ভুলে যাচ্ছেন কেন যে আপনাদের ওই পেরিডোটাইট নুড়ির রহস্য আমার মামাবাবুর কাছে আর লুকোন নেই।"

"আপনার মামাবাবু!"—গা রী-রী করে তোলা তাচ্ছিল্যের হাসির সঙ্গে বঙ্কুবাবু বললেন— "আপনার মামাবাবু পেরিডোটাইট পাথরের রহস্য ধরে ফেলেছেন? তা হলে শুনুন, ছোটবাবু। যা এবার করব, তাতে এই চোরা সুড়ঙ্গে প্রাণটা বেরুতে যে ক'টা দিন লাগবে সেই সময়টা মনে মনে জাবর কাটার অন্তত একটা কিছু পাবেন। আপনার কাছ থেকে দু'কান হবার আর যখন ভয় নেই তখন সার সত্যটা আপনাকে অনায়াসে জানিয়ে দিতে পারি। প্রথমতঃ আপনি নিজে একটি পয়লা নম্বরের উজবুক আর আপনার মামাবাবু তার চেয়ে এক কাঠি কম।"

pathagar.net

কথা বলতে বলতে সরকার সাহেব ও বঙ্কুবাবু দু'জনেই এ গুহা ছেড়ে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন। বেশ লম্বা হাঁটা পথের পাড়ি যে তাঁদের দিতে হবে আধা মিলিটারী সাজ-পোষাক আর পিঠে বাঁধা হ্যাভারস্যাক বাঁধার ধরন থেকেই তা বুঝতে পারছিলাম। সাজগোজ প্রায় শেষ করে এবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বঙ্কুবাবু বেশ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শেষ কথাগুলো শোনালেন!

"হ্যাঁ, সত্যিই উজবুক! পেরিডোটাইট পাথরের মর্ম আপনার মামাবাবু ঘণ্টা বুঝেছেন। বোলতা চাকের মত ওই পাথরের ডেলার ভেতর ক্রোমিয়ম আর প্ল্যাটিনাম ধাতু পাওয়া যায় ঠিকই। আপনার মামাবাবুকে এটুকুও নিজের চেষ্টায় জানতে হয়নি। তথ্যটা আমি-ই জুগিয়েছিলাম। নজরটা যাতে ওর বেশী না যায় তার জন্যে নাগাপ্পার প্যাডের কাগজে তার হাতের লেখার সঙ্গে নকল রেখে ইসারা দেবার মত কিছু টুকে ছেঁড়া কাগজের দলার মত পাকিয়ে সরকারের কাছে দিয়ে রেখেছিলাম। আসলে আরেক আহাম্মক হলেও সরকার ঠিক সময়েই কাগজের দলাগুলো কাজে লাগিয়েছিল। কাগজের দলা দিয়ে এক ঢিলে দু'পাখী মারা হয়েছে। এক, বিলেতের মেটাল বুলেটিনের ছিটে ফোঁটা বাজার দর তুলে দেবার দরুন পেরিডোটাইটের খাস রহস্য থেকে দৃষ্টিটা ঘুরে গিয়েছে, আর দ্বিতীয়ত লোধমা অঞ্চলের সব ব্যাপারে গোপনে খবরদারী করবার জন্যে ছদ্ম পরিচয়ে যাকে আনিয়ে রাখা হয়েছে, সন্দেহটা ফেলা হয়েছে সেই গোয়েন্দা বাহাদুরের ওপর।"

"তার মানে?"—এই অবস্থাতেও মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল,—"নাগাপ্পা গোয়েন্দা!"

"হ্যাঁ, ছোটবাবু!"—নিজের বাহাদুরী শোনাবার নেশা বঙ্কুবাবুকে এবার ধরেছে মনে হল—"এই ধড়িবাজ গোয়েন্দাটাকে শেষ করবার জন্যেই দু'দিন দু'রাত্রি এই পাহাড় জঙ্গলে লুকিয়ে ওত পেতে ছিলাম। আদিবাসী পিয়নটা কি ভাবে কে জানে এ গুপ্ত সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়ে এখানে ঢুকেছিল। আসল ব্যাপার কিছু না বুঝলেও কাগজপত্রের ফাইল দেখে অবাক হয়ে সে মহান্তীর কাছে যাচ্ছিল সেগুলো দেখাতে। খুব সময় মত তাকে খতম করেছিলাম। নাগাপ্পার বন্ধু, ওই হতভাগা সাহেব শিকারীটা আচমকা উদয় হয়ে বেয়াড়া খবরটা ফাঁস না করে দিলে ক্ষ্যাপা হাতীর নামেই ব্যাপারটা চালিয়ে দেওয়া যেত। নাগাপ্পা এ সব পাহাড় জঙ্গল চষে ফেলেও আর কোনো হদিস তাহলে পেত না। সাহেব বন্ধুর কাছে মহাবুয়াং-এর ক্ষ্যাপা হাতীর খাঁটি খবর পেয়ে নাগাপ্পা সন্দিগ্ধ হয়ে নতুন করে তল্লাসী শুরু করে, আর তাইতেই আমাদের আসল ধান্দাটার কিছুটা আঁচ পেয়েছে বলে আমার ধারণা। নাগাপ্পাকেই আগে খতম করা তাই খুব দরকার ছিল। কিন্তু তার বদলে নিয়তি আপনাকেই টেনেছে। নাগাপ্পার হিসেবটা না চুকিয়েই তাই চলে যেতে হচ্ছে। তাতে অবশ্য এমন কিছু ক্ষতি নেই। আমাদের আসল যা কাজ তা আমরা গুছিয়ে নিয়েই যাচ্ছি।"

বঙ্কুবাবু যতক্ষণ তাঁর আস্ফালন শুনিয়েছেন, তার মধ্যে মাথার ভেতর আকাশপাতাল ভয়-ভাবনার মধ্যে শেষ একটা চাল আমি ভেবে নিয়েছি।

বঙ্কুবাবু থামতেই যথাসম্ভব টিটকিরির সুর গলায় ফুটিয়ে আমি বললাম—"গুছিয়ে নিলেও এখান থেকে যাওয়া আর আপনাদের বোধহয় ভাগ্যে নেই। খাদের মধ্যে পড়বার পর আপনারাই প্রথম আমায় দেখেন নি। তার আগে মামাবাবু এসে আমার সঙ্গে কথা বলে

গেছেন। তাঁর পরামর্শেই পঙ্গু সেজে আপনাদের অপেক্ষায় পড়ে ছিলাম। বুঝতেই পারছেন আপনাদের এ চোরা সুড়ঙ্গ মামাবাবুদের আর অজানা নয়। এতক্ষণে তাঁরা চুপ করে নিশ্চয় বসে নেই। সুতরাং এখন আর তাঁদের হাত থেকে ছাড়া পাবার আশা করেন কি?"

বঙ্কুবাবু যে রকম একটা অদ্ভুত মুখ করে আমার কথাগুলো শুনলেন, তাতে তাঁর মনে একটু ভয় ধরাতে পেরেছি বলে আশা হচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর ছুঁচোল গলার বিদঘুটে হাসিতে সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হল। হতাশার আশা আমার শেষ প্যাঁচটা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছে।

বঙ্কুবাবু হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের হুলটা দ্বিগুণ ছুঁচোল করে ফুটিয়ে বললেন—"আপনার মামাবাবু চোরা সুড়ঙ্গটা জেনে ফেলে তৈরী হয়ে আছেন? তাহলে ত সর্বনাশ! এক মুহূর্ত আর দেরী করবার সময় নেই। যাও সরকার, ঝরণার মুখে ডিনামাইটের কাঠিগুলো ঠিক মত সাজিয়ে এসো। লোহার ডান্ডাটাও দাও। ছোটবাবুর পা দুটো ভেঙে দিয়ে যেতে হবে ত! আর সেই আসল থলিটাই শেষে ভুলে না যাই!"

এই পর্যন্ত বলে বঙ্কুবাবু থামলেন। তারপর চোরা সুড়ঙ্গের একটা কোণ থেকে ক'টা পাথর সরিয়ে সত্যিই একটা ছোট চামড়ার থলে বার করে এনে আমার সামনে নেড়ে বললেন, "কিছু বুঝতে পারছেন, ছোটবাবু?"

সত্যিই কিছু না বুঝে আমি চুপ করেই রইলাম। বঙ্কুবাবু নিজেই আবার বললেন—"এ থলির ভেতর কি আছে তা দেখলে আপনার ত বটে-ই, আপনার মামাবাবুর চোখও চড়কগাছ হবে।"

বঙ্কুবাবুর মুখের ভাব ও গলার স্বর দুই-ই তখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যেন চাবুক মেরে শিক্ষা দেবার ভঙ্গীতে তিনি বলে গেলেন—"হ্যাঁ, ছোটবাবু আপনার ধুরন্ধর মামাবাবু ওই বোলতার চাকের মত পাথর থেকে ক্রোমিয়ম আর বড় জোর প্ল্যাটিনামের বেশী কিছু পাবার কথা ভাবতে পারেন নি। পেরিডোটাইটে কিন্তু শুধু ক্রোমিয়ম প্ল্যাটিনাম নয়, ম্যাগ্নেটাইট অলিভিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়। আর সব চেয়ে আশ্চর্য যা পাওয়া যায় তা হল হীরে। দক্ষিণ আফ্রিকার হীরের খনির অঞ্চল থেকেই পেরিডোটাইটের আর এক নাম হয়েছে কিম্বারলাইট। এই নামের প্রথম অক্ষর Kটা পুড়ে যাওয়াতেই গর্ত থেকে বার করা কাগজে imberlite শব্দটা আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে। এই হীরে সমেত পেরিডোটাইট সব জায়গায় পাওয়া যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় খুব বেশী, আমেরিকার আরাকানসাসে আর পাওয়া যায় আমাদের ভারতবর্ষে। এঞ্জা পাহাড়ের এই চোরা সুড়ঙ্গের ভেতরে এ পাথরের একটা শিরা আছে। উঁচু দরের হীরে খুব বেশী সে শিরায় না থাকলেও যা আছে তা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আপাতত যতগুলো সম্ভব যোগাড় করে এই থলিতে নিয়ে যাচ্ছি। ইউরোপ আমেরিকার হীরের চোরাবাজারে এগুলো বেচে যা পাওয়া যাবে তা বড় কম নয়। সে টাকার কাঁড়ি দু'দিনে উড়িয়ে দিয়েও আবার এখানে আসবার পথ আমাদের খোলা। গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ শুধু আমাদেরই জানা। তা দিয়ে কখন আসব যাব কেউ জানতেও পারবে না। আপনার মনে কি হচ্ছে তা বুঝতে পারছি, ছোটবাবু। এত কথা জেনেও নিজের পোঁড়া বরাত আর বুদ্ধির দোষে এখানে খাঁচা কলে বন্দী ইঁদুরের মত পচে মরবেন। এত দুঃখের মধ্যে একটু সান্ত্বনার জন্যে হীরেগুলোর চেহারা একবার দেখে একটু চক্ষু সার্থক করুন।"

চামড়ার থলে খুলে হীরে বার করতে গিয়ে বঙ্কুবাবুরই কিন্তু চক্ষুস্থির।

থলে থেকে দু' একটা যা তিনি বার করেছেন তা আমিও তখন দেখতে পেয়েছি।

হীরে কোথায়! সেগুলো ত নুড়ি পাথরের টুকরো।

বঙ্কুবাবুর কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখে আর্তনাদের সঙ্গে রাগের গর্জন মেশান একটা আওয়াজ বার হয়ে এল—"কে? কে এ কাজ করেছে!"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর গলার স্বরে সমস্ত সুড়ঙ্গও যেন গম গম করে উঠল—"করেছি আমি! এঞ্চা পাহাড়ের পবিত্রতা যে নষ্ট করেছে তার কোনো ক্ষমা নেই, নিস্তারও সে পাবে না!"

হতভম্ব হয়ে আমার হাত পা তখন সত্যি অবশ হয়ে আসছে। সরকার সাহেবের অবস্থাও তথৈবচ।

বঙ্কুবাবু শুধু আরও কড়া ধাতুতে তৈরী। এই বিহ্বলতার মধ্যেও এক মুহূর্তে পকেট থেকে পিস্তল বার করে তিনি শব্দের উৎস লক্ষ্য করে সুড়ঙ্গের অন্য মুখে বার বার গুলি ছুঁড়লেন।

তাতে অপ্রত্যাশিত ফলই কিন্তু ফলল। গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুড়ঙ্গ গুহায় আমাদের কাছেই ঝলক দিয়ে একটা বিদ্যুৎ শিখাই যেন জ্বলে উঠল, সেই সঙ্গে আবার এক ঘোষণা—

"গুলি ছুঁড়ে কোনো লাভ নেই, বঙ্কুবিহারী! এ পাহাড়ের নাম করালী তা ভুলো না। তোমার সব খেল এবার খতম। বুঝতেই পারছ, তোমার এ চোরা সুড়ঙ্গ এখন সম্পূর্ণভাবে আমাদের দখলে। তোমার পালাবার কোনো পথই আমরা রাখি নি।"

ঘোষণার বক্তব্যের চেয়ে গলার স্বরে আমি তখন বিমূঢ় বিহ্বল। এবার গলা ত স্পষ্ট মামাবাবুর!

আমার মিথ্যে কল্পনাই তা হলে সত্য হয়ে উঠল?

হল সত্যিই তাই, মামাবাবুই মহান্তী আর নাগাপ্পাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্কুবাবু আর সরকার সাহেবকে ওই চোরা সুড়ঙ্গের ভেতরেই ধরলেন।

বঙ্কুবাবু পালের গোদা বলে গোড়ায় সন্দেহ না করলেও এই চোরা সুড়ঙ্গের পেরিডোটাইটের রহস্য ভেদ করে মামাবাবু গোপনে অনেক দিন থেকেই তৈরী হচ্ছিলেন। আমিই আহাম্মকের মত তাঁকে ভুল বুঝেছি।

pathagar.net

পরচুলা সাহেব ও মামাবাবু

মামাবাবুর প্রায় চিরজীবনের সঙ্গী সেই মঙপো।

কিন্তু এখন সে আর সেই পাহাড়-জ্বালা-করা মঙপো অবশ্য নয়। পাহাড়ে আগুন জ্বলছে বোঝাবার মত বাংলা ভাষা এখন সে ভালোই আয়ত্ত করেছে বলা যায়।

কিন্তু তবু নিজস্ব থাই প্রয়োগে তার বক্তব্য বোঝা একটু কঠিনই হয়ে পড়ে।

যেমন হয়েছে আমার এখন।

খেলাধূলাটা মাঠে নেমে আর করতে না পারলেও তার নেশাটা ছাড়তে পারিনি।

আমার সবচেয়ে পেয়ারের দুটি টীমের একটির সঙ্গে তাই ম্যালেশিয়ায় তাদের টুর্নামেন্টের খেলার বিবরণ দিতে দলের সঙ্গে গেছলাম।

টুর্নামেন্টে আমাদের টীমের খেলাটা ঠিক খুশী হবার মত হয়নি, তাই বেশ একটু মনমরা অবস্থাতেই মামাবাবুর বাসায় তাঁর সঙ্গে কিছুকাল কাটিয়ে মনটা হালকা করবার আশায় গেছলাম।

কিন্তু কোথায় মামাবাবু!

বাড়ীতে তিনি নেই। কেন, এই কলকাতা শহরই তিনি ছেড়ে গেছেন মাস খানেক আগে।

মাস খানেক আগে গেলেন আর এখনো ফেরেন নি! আমার বিস্মিত জিজ্ঞাসার উত্তরে মঙপো জানাল—"কেমন করে ফেরা করবেন্? মামলা খতম না হোলে পরচুলা সাহাব কি যাবে কুথাও!"

মামলা খতম, পরচুলা সাহেব— এসব বলছে কি মঙপো।

তার বাংলা বলায় ভুল চুক হত, কিন্তু মাথাটা ত তার খারাপ হয়নি আগে। এখন ভাষাটা অনেকখানি ঠিক হওয়ার সঙ্গে মাথাটাই গোলমাল হয়ে গেল নাকি?

মাথায় যদি সত্যি একটু গোলমাল হয়ে থাকে তাহলে তাকে ধমকধামক করে লাভ নেই। তার বদলে মিষ্টি কথায় কায়দা করে আসল খবরটা বার করা যায় কি না তাই দেখবার চেষ্টা করলাম।

যেন সবই বুঝেছি এমন ভাব করে বললাম—"ঠিক! ঠিক! পরচুলা সাহেব যা মামলায় জড়িয়েছেন তাতে তার ছাড়া পাওয়াই শক্ত, শুধু—"

pathagar.net

"না, না,"—কথাটা আমায় শেষ করতে দিলে না মঙপো, বেশী বুদ্ধি দেখাতে গিয়ে আমি যা আবোলতাবোল বকছি তা থামিয়ে বকুনিটার সঙ্গে একটু অনুকম্পা মিশিয়ে বললে—"পরচুলা সাহাবকে নিয়ে কুছু মামলা নেই। ই মামলা হোলো সাহাবের এক নেশা! যেমন ওর কীড়া—"

"ব্যস্! ব্যস্! হয়েছে"—মাথার ঘিলুটা আর গুলিয়ে যেতে না দিয়ে বললাম—"ঠিক আছে—" মামাবাবুর এক মাস বাড়ী ছেড়ে বিদেশে থাকা, কে এক 'কীড়া'-পাগল পরচুলা সাহেবের মামলা মকদ্দমা শোনার জন্যে আদালতে থাকার নেশা—এ জড়ানো রহস্যের খেই খুঁজে পাবার আসল হদিস যেখানে মেলা সম্ভব সেই ঠিকানাটাই জানতে চাইলাম—"তা মামলাটা হচ্ছে কোথায়?"

"মামলা?" মঙপো আমার অজ্ঞতায় বেশ একটু অবাক হয়ে বললে—"কুথা আবার হোবে! মামলা চলছে আদালতে। আগে হোলো জব্বলপুর, এখন ভুপাল।"

"ওঃ ভুপাল!"—যেন সব বুঝে নিয়েছি এমন ভাব দেখিয়ে ভুপালে মামাবাবুর বর্তমান আস্তানার ঠিকানাটা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা না করে সেদিন চলে এসেছিলাম মামাবাবুর ওপরে মনে মনে একটু অভিমান নিয়েই। কিছুদিনের জন্যে না হয় বাইরে গেছলাম, কিন্তু সে যাওয়া মানে আমি কি আর ফিরব না বুঝেছিলেন মামাবাবু? তা না হলে—নিজে এখন কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার আগে আমার জন্যে একটা চিঠিও ত লিখে মঙপোর কাছে রেখে যেতে পারতেন!

তিনিও যেমন আমার কথা মনে রাখেন নি, আমিও তেমনি তাঁর খোঁজ খবর না নিয়ে একেবারে চুপ মেরে যেতে পারি।

কিন্তু তা আর পারলাম কই?

মামাবাবু সম্বন্ধে স্বাভাবিক যা আগ্রহ তা কিছুদিন না হয় চাপা দিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু কি-না-কি মামলা শুনতে উদ্‌গ্রীব কে-না-কে এক 'কীড়া'-র নেশা ধরা পরচুলা সাহেবের ব্যাপার- ট্যাপারগুলো মনটাকে কেমন অস্থির করে তুলল।

এ সব কিছু নিয়ে আসল ব্যাপারটা যে কি হচ্ছে তা জানবার চেষ্টা না করে যেন আর স্বস্তি নেই।

মামাবাবুর ইদানীংকার কাজকর্ম ইত্যাদি আমার একেবারে অগোচর থাকে বললেই হয়। এই ক'মাস তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকলেও 'কীড়া' পাগল বলতে কার কথা মঙপো বোঝাতে চাইছে তা বোধ হয় আমার একেবারে অজানা নয়।

ডন পেরন নামে এক ক্ষ্যাপাটে বৈজ্ঞানিকের কথা মামাবাবুর কাছে অনেকবার শুনেছি। মানুষটার বৈজ্ঞানিক হিসাবে সুনামের সঙ্গে কিছু একটু দুর্নামও যেন দক্ষিণ আমেরিকার পণ্ডিত মহলে আছে। যার জন্যে নিজের বিষয়ে গুণী গবেষক হলেও, কোথাও কোনো পণ্ডিত সমাজে তার বিশেষ খাতির নেই। ইউরোপ কি উত্তর আমেরিকায় ত নয়ই, তার নিজের দেশ দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা চিলি কি ব্রেজিলেও সে কোথাও বেশীদিন

pathagar.net

আস্তানা পাততে পারেনি। মঙপো তাকে 'কীড়া'-পাগল বলে খুব ভুল.করেনি। কীড়া মানে পোকামাকড়। ডন পেরন সে দিক দিয়ে পোকামাকড়ের এক দিক দিয়ে বিশেষজ্ঞ মানে এনটোমোলজিস্ট ত বটেই, তার চেয়ে আরো বেশী কিছু, মানে একজন ভাইরাস তাত্ত্বিক বা ভাইরোলজিস্ট।

এত গুণ নিয়ে যে ক্ষ্যাপাটে বৈজ্ঞানিক কোথাও যথাযোগ্য খাতির না পেয়ে সারা দুনিয়ায় এখানে সেখানে ভেসে বেড়ায়, সে হঠাৎ আমাদের এই ভারতবর্ষে এসে কোথায় কিসের মামলা নিয়ে এমন মেতে আছে যে মামাবাবুকে কাজ ছেড়ে তার পেছনে লেগে থাকতে হয়েছে আঠা-লাগানো লেবেলের মত!

এ ধাঁধার মীমাংসা করার জন্যে কলকাতায় বসে মঙপোকে জেরা করে মামাবাবুর কাগজপত্র ঘাঁটতে হবে না। তাই আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে পরের দিনই বোম্বে মেলে ভূপাল রওনা হয়ে গেলাম। রওনা হবার পরের দিন বিকেলেই ভূপাল গিয়ে পৌঁছলাম বটে, কিন্তু সেখানে পৌঁছন মানেই ত মামাবাবুর খোঁজ পাওয়া নয়। ভূপাল মধ্যপ্রদেশের রাজধানী শুধু নয়, বিরাট শিল্পনগরীও হয়ে উঠেছে সামান্য, নোংরা, ঘিঞ্জি চৌক্-ঘেরা ক'টা মহল থেকে চারিদিকে খুশীমত ছড়িয়ে। শহরের এধার ওধার হেটেল ইত্যাদিও এত গজিয়ে উঠেছে যে তাদের ঠিকমত খোঁজ খবর নিতেই এমন এক-দু হপ্তা কেটে যাবে।

তবু অন্য কোনো উপায় না দেখে সে চেষ্টাও করিনি এমন নয়। স্টেশনের বাইরে একটা বড় রেস্তোরাঁ থেকে ভূপালের কোনো গাইড নিয়ে যে-ক'টা হোটেলের নম্বর পেয়েছি সব ক'টাতেই প্রথমে শুধু মামাবাবুর, তারপর ডন পেরনেরও যথাসাধ্য খোঁজ করেছি। লাভ কিছু হয়নি।

এরপর সরাসরি ওখানকার ফৌজদারী আর দেওয়ানী বড় আদালতগুলোতেই খোঁজ করতে হয়। কিন্তু সে অনেক হ্যাঙ্গামার ব্যাপার। কবে কোথায় কি মামলা হচ্ছে বা তার হদিস করা চট্‌পট্ সেরে-ফেলার কাজ নয়।

হয়ত এবারের ভূপাল পর্যন্ত ছুটে আসাটা নেহাত আহাম্মকী-ই হয়েছে ধরে নিয়ে দিন তিনেকের জন্যে একটা সাধারণ হোটেলের একটা ঘরভাড়া নিয়ে পুরোন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার আশায় একটা অটো রিক্‌শা ভাড়া নিয়ে শহরের নতুন গড়ে-ওঠা পাড়া টি.টি নগরে রওনা হলাম।

ঠিকানা যা জানতাম সেখানে গিয়ে পুরোন বন্ধুর খোঁজ পেলাম না, কিন্তু এই ব্যর্থ খোঁজাখুঁজিতে যা অভাবিত তাই ঘটে গেল, আর ঘটল ভূপালে ডন পেরন বা মামাবাবুকে খুঁজে বার করার যে সূত্রটা নেহাত তুচ্ছ ভেবে হিসাবের মধ্যে আনিনি, সেইটিরই সাহায্যে।

সূত্রটা আর কিছু নয়, মঙপোর ডন পেরনকে সাহাব বলে বর্ণনা।

'পরচুলা সাহাব' যে একটা অদ্ভুত বর্ণনা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে বর্ণনার গুণেই শুধু পেরন সাহেবের সঙ্গে আশাতীতভাবে যোগাযোগ হয়ে গেল সেই তখনই।

pathagar.net

টি.টি নগরে বন্ধুর আস্তানা খুঁজে বার করতে না পেরে হতাশ হয়ে আবার সদ্য ভাড়া করা হোটেলের আস্তানাতেই ফিরছিলাম। নতুন রাজধানী হিসেবে চারিদিকে নতুন নতুন বসতি ছড়াতে শুরু করলেও রাস্তাঘাটের বিস্তার তার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। দু-চার জায়গায় ঘনবসতির আর দোকান বাজার বেশ আলো ঝলমল আর জমজমাট হয়ে উঠলেও অনেক জায়গা সবে তৈরী হয়ে-ওঠা কিছু বাংলো গোছের বাড়ী নিয়ে ফাঁকা প্রান্তর হয়েই আছে। শহরের চেহারা সেখানে আর নেই—অন্ধকার ফাঁকা প্রান্তরের মাঝে মাঝে এক-একটা বাংলো যেন দ্বীপের মত ভাসছে। এধরনের বাংলো বাড়ী শহরের নতুন-বড়লোক-হওয়া বাসিন্দাদের। বিস্তীর্ণ অন্ধকার প্রান্তরের মধ্যে একটা দুটো এরকম সৌখীন বাংলো নিজেদের রোশনাইতে চারিদিকে অন্ধকারকে আরো গাঢ় করে তুলেছে।

টি.টি নগর থেকে পুরোন শহরে নির্জন পথে অটো-রিক্শার মৃদু ঝাঁকুনি সত্ত্বেও অন্ধকার থেকে এক-একটা ঝলমলে বাংলো পার হয়ে আবার অন্ধকারে হারিয়ে যেতে যেতে কেমন একটু তন্দ্রাই আসছিল। কিন্তু তারই মধ্যে একটা বাংলো বাড়ী পেরিয়ে যাওয়ার পরই চমকে উঠে প্রায় চীৎকার করে ড্রাইভারকে রিক্শা থামাতে বললাম।

রিক্শা-ড্রাইভার আমার হঠাৎ চীৎকারে যে রকম চমকে উঠে সজোরে ব্রেক কষে গাড়ী থামিয়েছিল তাতে গাড়ীটার সঙ্গে আমিও রাস্তার ওপর উল্টে আছাড় খেয়ে পড়তে পারতাম।

আমার দুর্ঘটনার ভয় যতটা না হোক, সে রকম কিছু হলে রিক্শা চালক হিসাবে তার নিজের ও তার গাড়ির অপয়া বলে দুর্নাম হবার ভাবনাতেই কোনো রকমে বিপদ এড়িয়ে সে যেন একটু রুক্ষ গলাতেই চেঁচিয়ে উঠে বললে—"ক্যা হুয়া কিয়া? খামোখা কেঁও রোখনে বোলা!"

"খামোখা নয়, খামোখা নয়।"—যতদূর সম্ভব মোলায়েম গলায় তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করে বোঝালাম যে অকারণে নয়, একটু বিশেষ দরকারেই তাকে থামিয়েছি।

বিশেষ দরকারটা যে কি তারও একটু আভাস তাকে দিয়ে বললাম, এইমাত্র যে বাংলো বাড়ীটা আমরা পেরিয়ে এসেছি তাতে আমার এক চেনা মানুষকে আমি দেখতে পেয়েছি মনে হচ্ছে। তাই সেখানে গিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে আসতে চাই। ড্রাইভার তার গাড়ী নিয়ে এখানে ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করুক। তার এই অপেক্ষা করার দাম আমি বাড়তি ভাড়ায় পুষিয়ে দেব।

ড্রাইভারকে এসব কথা বুঝিয়ে রিক্শা থেকে নামার মধ্যেই আমি কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে নিশ্চিত হয়ে গেছি।

নির্জন অন্ধকার রাস্তা দিয়ে আলো ঝলমলে বাংলোটা পার হবার সময় অটো-রিক্শা থেকে বাড়ীটার বাইরের বারান্দার উপরে একটা আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একটি মানুষকে বেরিয়ে আসতে দেখার পর প্রথমে না হলেও দু-এক সেকেন্ড যেতেই একেবারে চমকে উঠেছিলাম। বাংলো বাড়ী থেকে বারান্দায় যাঁকে বেরিয়ে আসতে

pathagar.net

দেখেছি সে লোকটা যে এদেশী নয়, ইউরোপীয়, প্রথম দেখাতেই তা অনায়াসে বোঝা গেলেও সেটা আমার চমকাবার কারণ নয়। চমকাবার কারণ তার মাথার উইগ্ অর্থাৎ পরচুলা।

এই তা হলে মঙপোর পরচুলা-সাহাব! ভূপালে এ-ই কি তাহলে সেই মাথায় উইগ্-পরা ডন পেরনের অস্থায়ী আস্তানা।

এ অনুমান ঠিক হোক বা না হোক, একবার মাথায় আসবার পর আর ত অগ্রাহ্য করে এখান থেকে চলে যাওয়া যায় না। আমার ড্রাইভারকে সেইজন্যই অমন আচমকা অস্থিরভাবে গাড়ী থামাতে বলেছিলাম। এখন তাকে শান্ত করে কারণটা বুঝিয়ে নামতে নামতে আমার ধারণা যে সম্পূর্ণ নির্ভুল তার অকাট্য প্রমাণ আমি তখন পেয়ে গেছি।

ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলার সময় আমার দৃষ্টিটা আগাগোড়া বাংলো বাড়ীর বারান্দার মাথায় উইগ-পরা শ্বেতাঙ্গের দিকেই ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে সে যেন বাইরে বারান্দাতেই স্ট্যান্ডে রাখা একটা মোটর বাইকে স্টার্ট দেওয়ার নিষ্ফল চেষ্টা করছিল। তার সেই চেষ্টার মধ্যেই ভেতর থেকে আরেকজন যিনি বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং মামাবাবু।

আমার অটো-রিক্শা ড্রাইভারকে শেষ কথাগুলো প্রায় ছুঁড়ে বলে দিয়ে আমি "মামাবাবু" বলে চেঁচিয়ে ডাকতে ডাকতে বাংলো বাড়ীটার দিকে এবার ছুটে গেলাম।

এরপর যা হল সংক্ষেপে তা মধুর অপ্রত্যাশিত মিলন দৃশ্য বলা যায়। মামাবাবু আমায় দেখে যেমন সত্যি অবাক, আমিও তার চেয়ে কম নই। শুধু আমি যে নিজে থেকে তাঁরই খোঁজে এ শহরে এসেছি তা গোপন করে যেন এখানকার মৌলানা আজাদ কলেজের কোনো অধ্যাপক বন্ধুর নিমন্ত্রণে শহরটা একবার ঘুরে যেতে এসেছি বলে জানালাম। পরচুলা সাহেব ডন পেরনের সঙ্গেও মামাবাবু পরিচয় করিয়ে দেবার পর সে রাত্রের মত ডন পেরনের ওখানে ডিনার খেয়ে যাওয়ার নিমন্ত্রণ অনেক ধন্যবাদের সঙ্গে সকৃতজ্ঞভাবে প্রত্যাখ্যান করার পর মামাবাবুকে আমার ভাড়া-করা অটো-রিক্শাতেই সঙ্গে নিয়ে শহরে ফিরে গেলাম। ডন পেরন বারান্দায় বেরিয়ে এসে এর আগে মামাবাবুর জন্যে তাঁর মোটর বাইকটায় স্টার্ট দেবার কস্রৎ করছিলেন বলেই প্রথমে তাঁকে ও পরে মামাবাবুকে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

অটো-রিক্শায় শহরে মামাবাবুর নিজের যেখানে আস্তানা সেই স্টেশনে ফিরতে ফিরতে পথে ও পরে মামাবাবুর নিজের কামরায় তাঁরই সঙ্গে রাতের খাওয়া খেতে খেতে ডন পেরনের সমস্ত বিবরণ যতটা সম্ভব শুনলাম। শুনে যা বুঝলাম তা এই যে মানুষটা খুব বড় বিজ্ঞানী হলেও বেশ ছিটগ্রস্ত। যতদূর বুঝলাম, তার মাথার এই ছিটই বোধ হয় তার বৈজ্ঞানিক হিসাবে দুর্নাম হবার কারণ। যে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সে গবেষণা চালাচ্ছিল সেখানে তার গবেষণার যথার্থ ফলাফল ঠিক মত না জানিয়ে সে নাকি কিছু ভুল তথ্য ও তত্ত্ব সাজিয়ে তার গবেষণার বিবরণ লিখেছিল।

pathagar.net

সত্য হোক মিথ্যা হোক, একটা অপবাদ ত বটে। কিন্তু এই অপবাদ খণ্ডনের জন্য কোথাও কোনো প্রতিবাদ না করে পেরন নাকি ওখানকার নাম-করা সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে দেশে বিদেশে তার নিজের পছন্দমত গবেষণা চালিয়ে বেড়ায়। কীট ও ভাইরাস তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো নিজস্ব গোপন আবিষ্কার বেচে ব্যবসা করবার চেষ্টা হয়ত তার আছে বলে কানাঘুষো থাকলেও হাতেনাতে কোথাও তা এখনো প্রমাণ হয় নি।

আপাততঃ ভূপালে যে মামলার ব্যাপারে সে অমন তন্ময় হয়ে আছে সেটা বড় অদ্ভুত। মামলাটা শুধু ভারতবর্ষের আদালতের নয়, এক হিসাবে আন্তর্জাতিক বলা যায়। বিরাট এক আন্তর্জাতিক শিল্প-সাম্রাজ্যের ধনকুবেরের এক পরিচালক-মালিকের কুপুত্র প্রথমে তাদের বোর্নিওর এক কারখানা-শহরে একটা খুনের মামলায় জড়ায়। আশ্চর্যের কথা এই যে সেই মামলা চালাবার সময় বিপক্ষ মানে ওখানকার সরকারী পক্ষের যে সব সাক্ষী-সাবুদ পুলিশ কর্মচারী খুনের আসামীর বিরুদ্ধে এজাহার দেবার জন্য আদালতে হাজিরা দিত, হঠাৎ এক মহামারীতে ওই শহরের আরো কয়েকজনের সঙ্গে তারা সবাই মারা পড়ে। খুনের মামলাটা তাই সেখানে আর চালানো যায় না। ধন-কুবেরের খুনে কুপুত্রের হয়ে রটানো হয় যে 'ধর্মের কল তার হয়েই নড়ে'। এই মহামারী বাধিয়ে সে যে নির্দোষ তাই প্রমাণ করেছে।

বোর্নিওর সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কয়েকজন কিন্তু ব্যাপারটা ওইভাবে চুকিয়ে দেওয়াটা মেনে নেয় নি। আন্তর্জাতিক শিল্প-সাম্রাজ্যের অন্য কি সব গলদের খেই ধরে সেই খুনের মামলার একটা ফ্যাকড়া তারা এই ভূপালের আদালতে বিচারের জন্যে তুলতে পেরেছে।

মামলার ফলাফল কি হবে অবশ্য ঠিক নেই, কিন্তু বোর্নিওতে বিচারের সময় হঠাৎ মহামারী লাগার ওই দৈব অভিশাপ গোছের ব্যাপার ঘটার দরুণ পরচুলা-পেরন নাকি বিশেষ ভাবে এই মামলা সম্বন্ধে উৎসাহী হয়েছে। এ মামলার ওপর পুরোপুরি নজর রাখবার জন্যেই সে এই শহরে আলাদা বাসাও ভাড়া নিয়েছে ওই টি.টি নগরের কাছে। এর আগে এ মামলা প্রথমে জব্বলপুরে ওঠবার সময়েই তার তদারকীর জন্যে সে সেখানেও নাকি গোড়া থেকে হোটেল ভাড়া করে ছিল। মামাবাবু অন্য একটি কাজে সেখানে যাওয়ায় দৈবাৎ তার দেখা পেয়ে তার এই অদ্ভুত মামলার নেশার কথা জানতে পারলেন। নিজেও কিন্তু তিনি তারপর এ নেশায় কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলেন বলা যায়, নইলে মামলাটা জব্বলপুর থেকে খোদ রাজধানী ভূপালের আদালতে চলে যাবার পর তিনিও এখানে এসে থাকার ব্যবস্থা করবেন কেন?

এর পরেও একটা কথাই মামাবাবুর কাছে জানতে চেয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"আচ্ছা, পেরন সাহেবের এমন পরচুলা পরবার উদ্ভট সখ কেন বলতে পারেন?"

"সখটা উদ্ভট হলেও"—মামাবাবু হেসে জবাব দিয়েছিলেন—"তার ত কোনো মানে না থাকবারই কথা। তবে ও সখটা মাথার টাক কি বিশ্রী ঘায়ের দাগ লুকোবার জন্যও হতে পারে নাকি?"

pathagar.net

তা অবশ্য পারে বুঝেই ও বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন না তুলে চলে এসেছিলাম। কিন্তু একটা খটকা মনের ভেতরে থেকেই গেছল।

তাই চলে আসবার আগে এতদূর পর্যন্ত সব শোনার পর মামাবাবুর কাছে সেই কথাই জানতে চাইলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—"এ মামলা সম্বন্ধে ডন পেরনের এত যে আগ্রহ তা কি শুধু বোর্নিওতে যা ঘটেছিল সেই দৈব অভিশাপের রহস্যটা ভেদ করার সূত্র পাওয়ার আশায়? আপনিও কি সেইজন্যে এখানে আটকা পড়ে আছেন?"

"ওই রকমই কিছু নিশ্চয়!"—বলে মামাবাবু প্রশ্নটা এড়াতে চাইলেও তা তাঁকে দিলাম না, সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলাম,—"সত্যি করে বলুন দেখি কোনো রহস্য যথার্থই কিছু এর মধ্যে আছে, না নেহাত 'কাক উড়ল তাল পড়ল'র মত সত্যিকার সম্বন্ধহীন কাকতালীয় ব্যাপার?"

"সেটাই ত জানার আশা করছি! আর দুটো দিন অপেক্ষা করে দেখাই যাক না। হ্যাঁ, জানিস ত— মোকদ্দমার শুনানীর তারিখ পড়েছে। এখন নিজের হোটেলে গিয়ে ভালো করে ঘুম দে গে যা। কাল সকালে আমি আদালতে যাবার পথে তোকে তুলে নিয়ে যাব।"

সকালে যথাসময়ের অনেক আগে তাই তুলে নিয়ে গেলেন মামাবাবু। অটোরিক্শা নয়, কোনো বন্ধুর বাড়ীর গাড়ী মামাবাবু সারাদিন ব্যবহারের জন্যে পেয়েছেন। আদালতে যাবার পথে পরচুলা সাহেব মানে ডন পেরনকেও গাড়ীতে তুলে নিতে ভুললেন না মামাবাবু।

কিন্তু তাঁকে সঙ্গে নেওয়া যে জ্বালা তা কি তখনো জানি।

প্রথমতঃ তাঁর সঙ্গে বাংলো বাড়ীতে গিয়ে বেয়ারাকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে বসে আছি ত আছি, পেরন সাহেবের সাজগোজই আর হয় না। শেষ পর্যন্ত যখন এলেন তখন একালের নয়, কয়েক শতাব্দী আগের বিলেতের কোনো রাজসভা-টভার ছবি থেকে যেন বেরিয়ে এলেন সেই সে যুগের প্যান্টকোর্ট আর পাউডার দেওয়া পরচুলা পরে।

পেরন সাহেবের স্বভাব জানা ছিল বলে মামাবাবু গাড়ীটা অনেক আগে তাঁর বাংলোয় এনেছিলেন। আদালতে পৌঁছতে তাই দেরী হল না। কিন্তু সেখানেও পেরন সাহেব তাঁর আরেক বেয়াড়াপনায় কম জ্বালিয়ে মারলেন না।

আদালত বসবার সময় হয়ে এসেছে। খুব বেশী না হোক, শুনানীর কামরায় দুপক্ষের উকীল সাক্ষী সাবুদ ইত্যাদির সঙ্গে দর্শকদের আসন প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে। জজ সাহেব এলেই মামলা আরম্ভ হবে, কিন্তু পেরন সাহেবের তখনো বসবার নাম নেই। কামরার এক ধারে তাঁর সঙ্গে আমাদেরও দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বিনা কারণে। কিছুক্ষণ বাদে ধৈর্য হারিয়ে মামাবাবুকে ভেতরে কোথাও গিয়ে বসবার কথা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মামাবাবু আমার মনের কথা বুঝে চোখের ইসারায় সেরকম কিছু করতে কেন যে নিষেধ করলেন তা বুঝতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ বাদে জজ এসে আসন নেবার পর পেরন সাহেব ভেতরে এক জায়গায় গিয়ে বসলেন বটে, কিন্তু মনে হল কেমন যেন অসন্তুষ্ট হচ্ছেন।

pathagar.net

আমাদের ভাগ্য ভালো যে সেদিন আমাদের মামলা আসামী পক্ষেরই আবেদনে কিছুকালের জন্যে মুলতুবী বলে ঘোষিত হল। অচেনা আদালতের অস্বস্তিকর পরিবেশ আর আধা-ক্ষ্যাপা পেরন সাহেবের সঙ্গ থেকে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম।

আদালত থেকে পেরন সাহেবকে তার বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে নিজেদের আস্তানায় ফেরবাব সময় কিন্তু বেশ একটু বিরক্তির সঙ্গেই মামাবাবুকে নিজের ক্ষোভটা না জানিয়ে পারলাম না।

বললাম— "এই এক আধ-পাগলা আহাম্মকের সঙ্গে কি জন্যে এমন সেঁটে আছেন বলতে পারো! সত্যিকার কোনো রহস্যের কিছুমাত্র হদিসও দিতে পারবে বলে মনে হয়? ওই নকল পরচুলাটা ছাড়া মাথায় আর কিছু ওর আছে?"

"ঠিক বলেছিস্ ঠিক!"—রাগ না করে মামাবাবু সত্যিই যেন মজা পেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "ওর মাথায় যথাসর্বস্ব যা আছে তা ওই নকল পরচুলা। ঠিক বলেছিস্ ঠিক।"

এর পরদিন মামাবাবু কিন্তু নিজেই এমন আহাম্মুকী কাণ্ড যে করবেন তা ভাবতে পারিনি।

নিজের হোটেল ঘরে সকালের কাজটাজ সেরে মামাবাবুর কাছে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি এমন সময় মামাবাবু নিজেই সেজেগুজে এসে হাজির।

ব্যাপার কি! ব্যাপার এই যে আমায় তখনই মামাবাবুর জিম্মায় থাকা গাড়ীতে তাঁর চিঠি নিয়ে ডন পেরনের বাংলো বাড়ীতে যেতে হবে তাকে মামাবাবুর হোটেলে নিয়ে আসতে। এখানকার আদালতের মামলার একটা মোক্ষম রহস্যের হদিস, প্রমাণ আর সাক্ষী নিয়ে মামাবাবু পেরনের জন্যে তাঁর হোটেলের কামরায় অপেক্ষা করছেন। পেরন এক মুহূর্ত দেরীতে এ সুযোগ যেন নষ্ট না করে।

বেশ একটু হতভম্ব হলেও মামাবাবুর এ চিঠি নিয়ে তার জিম্মাদারী গাড়ীতে সেই মুহূর্তে পেরনের বাংলো বাড়ীতে গিয়ে চিঠি দেখিয়ে তাগাদা দিলাম। চিঠি পড়ে বেশ একটু অবাক হলেও সাজগোজ করে নিয়ে আমার সঙ্গে বার হতে পেরন দেরী করলেন না।

কিন্তু মামাবাবুর হোটেলে গিয়ে আমারা একেবারে তাজ্জব! কোথায় মামাবাবু? তিনি হোটেলের ম্যানেজারের কাছে আমাদের জন্যে একটা চিঠি রেখে অনেক আগেই হোটেল' ছেড়ে পেরনের বাংলো বাড়ীতেই চলে গিয়েছেন। এখন সেই বাংলো বাড়ীতে ফিরে গেলেই নাকি সব কিছু সঠিকভাবে জানা যাবে।

জানা গেলও তাই। অ্যাটম বোমার মত ফাটো-ফাটো রাগে অগ্নিশর্মা পেরনকে নিয়ে তার বাংলো বাড়ীতে গিয়ে হাট করে খোলা বাইরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি ভেতরের বারান্দায় একটা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে মামাবাবু তন্ময় হয়ে কি একটা মোটা বাঁধান বই পড়ছেন।

আমাদের পায়ের শব্দে মুখ তুলে চেয়ে পেরনের দিকেই একটা হাত তুলে বললেন—"আরে, আরে ঠান্ডা হও, ঠান্ডা হও। তোমার ব্লাড প্রেসার যা বেশী তাতে এখনি

স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে। মিছিমিছি সেটা হতে দিয়ে লাভ কি। তার চেয়ে মাথায় তোমার সত্যি যা কিছু ঘিলু আছে তা সত্যি খরচ করে চমকদার একটা আবিষ্কার কি উদ্ভাবন তুমি করে ফেলতে পার। তবে এনটোমোলজিস্ট কি ভাইরোলজিস্ট হয়ে। ইতিহাস পড়লে তা হবে কি! তোমার এটা দেখছি ইতিহাসের বই, ইংল্যান্ডের ইতিহাস, তাও এখনকার নয়, সেই চতুর্দশ শতাব্দীর। তুমি চতুর্দশ শতাব্দীর একটু ভক্ত বোঝা যাচ্ছে। তোমার মাথায় যেটা আছে সেটা চতুর্দশ শতাব্দীর ইংরেজ ভদ্রলোকদেরই উইগ বা পরচুলা। তুমি মাথায় যেটা পরে আছ সেটা কিন্তু তোমার আসল নয়, আসল পরচুলাটা তুমি সযত্নে যাকে বলে জীইয়ে রেখেছ বলা যায়।"

একটু থেমে নিজের সোফার ধার থেকে একটা বড় প্যাকেট বার করে মামাবাবু সেটা তুলে ধরে বললেন—"সে পরচুলাটা এখন এই প্যাকেটের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, খানিক বাদে এটা জ্বলন্ত চুল্লীতে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু তা হবার কথা ছিল না। এটার মধ্যে জীয়ানো আছে পিল পিল করা উকুনের ঝাঁক। সেগুলো ধীরে ধীরে বাড়ছে! কিন্তু সে উকুনের ঝাঁকের এক দারুণ ভূমিকা তুমি ঠিক করে রেখেছিলে। এ পরচুলায় যেমন বাড়ছে উকুনের গুষ্টি, আর কাঁচের জারে তেমনি বাড়ছে আরেক যমের দূত! তুমি এনটোমোলজিস্ট যেমন তেমনি ভাইরোলজিস্ট। মানে তুমি পোকামাকড়ের যেমন বিশেষজ্ঞ তেমনি ভাইরাস জাতীয় জীবাণুরও। তোমার এই কাঁচের জারে বাড়ছে টাইফাস জাতের ভাইরাস বংশ। সময় বুঝে তুমি এই উকুনের ঝাঁকের মধ্যে সেই ভাইরাস চালান করে দেবে। আর ঠিক সুবিধে বুঝে আদালতের মাঝখানে তোমার পরচুলার সাহায্যে সে সব চালান করে দিতে, ঠিক যাদের যাদের মধ্যে চাও তাদের চুলের ভেতর।

"ইতিহাস পড়ে তুমি জেনেছ চতুর্দশ শতাব্দীর বিলেতে এই রকম একটি ধর্মীয় আদালতের বিচারের সময় রোগজীবাণু-ভরা উকুন পরচুলার ভেতর থেকে একদিকে ছড়িয়ে পড়ে সেদিকের লোকজনকে প্রথমে রোগাক্রান্ত করে সারা দেশে মহামারী ছড়িয়ে দেয়। ইতিহাসের সেই ঘটনার কথা জেনেই তোমায় যারা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকায় ভাড়া করেছে তাদের হয়ে বোর্নিওর রাজধানীর আদালতে এই উপায়েই সফল হতে চেয়েছিলে। পুরো সফল কিন্তু যে হওনি এই আমাদের সকলের ভাগ্য। তবে ওই মহামারীর আতঙ্কে সেখানকার মামালাটা ভেঙ্গে যায় শেষ পর্যন্ত।

"এখানে সেই মামলাই আবার দেখা দেবার পর তুমি আবার এই মহামারীকে অস্ত্ররূপে ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছিলে। কিন্তু সে ফন্দী আর খাটল না। আমি উকুনের পরচুলাটা যেমন ছিল তেমনি রেখে দিলেও টাইফাস-এর জীবাণু ভরা কাচের সব পাত্র একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছি। তুমি নিজে এ রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ভ্যাকসিন টীকে নিয়ে রেখেছ আমি জানি। অবস্থা এখন যা হয়েছে তাতে এ রোগ আর ছড়াবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তবু সাবধানের মার নেই বলে আমি তোমার বেয়ারা চাপরাসীদের উপযুক্ত টীকে দেওয়াবার ব্যবস্থা করেছি, আমি আর আমার ভাগনেও তাই নিয়ে নেব। এই সমস্ত কথা

জানিয়ে এখন আমরা তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি এইটুকু শুধু জানিয়ে যে কাল সকালে তোমাকে শুধু ভূপালেই নয়, এই ভারতের কোথাও দেখা গেলে দেশের পুলিশ বিভাগ যা করবার তা করবে। তোমার এদেশ এখনি ছাড়বার সুবিধার জন্যে প্লেনের এই টিকিট তোমার জন্যে করিয়ে এনে দিয়ে যাচ্ছি। এ টিকিটে তুমি এখান থেকে আজ রাত্রেই বোম্বাই হয়ে মিশরের কায়রো যেতে পার। সেখান থেকে তুমি কোথায় যাবে সে তোমার নিজের ঠিক করবার। তবে এর পর নিজের দেশের যে একজন মহান নেতার নাম তুমি নিয়েছ তারই স্মৃতির সম্মানে তোমার একটা সত্যিকার মহৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণার খবর পৃথিবী পাবে বলে আশা করে থাকব।

"আচ্ছা, তোমার ভালো হোক্, বিদায়।"

ডন পেরনকে ওইভাবেই বিদায় জানিয়ে তার পরচুলার বন্ধ প্যাকেটটা নিয়ে আমরা বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ভূপাল ছেড়েছিলাম সেই রাত্রেই।

এখনো ডন পেরনের কোনো সুসংবাদ না পেলেও আশা করে আছি।

---

pathagar.net